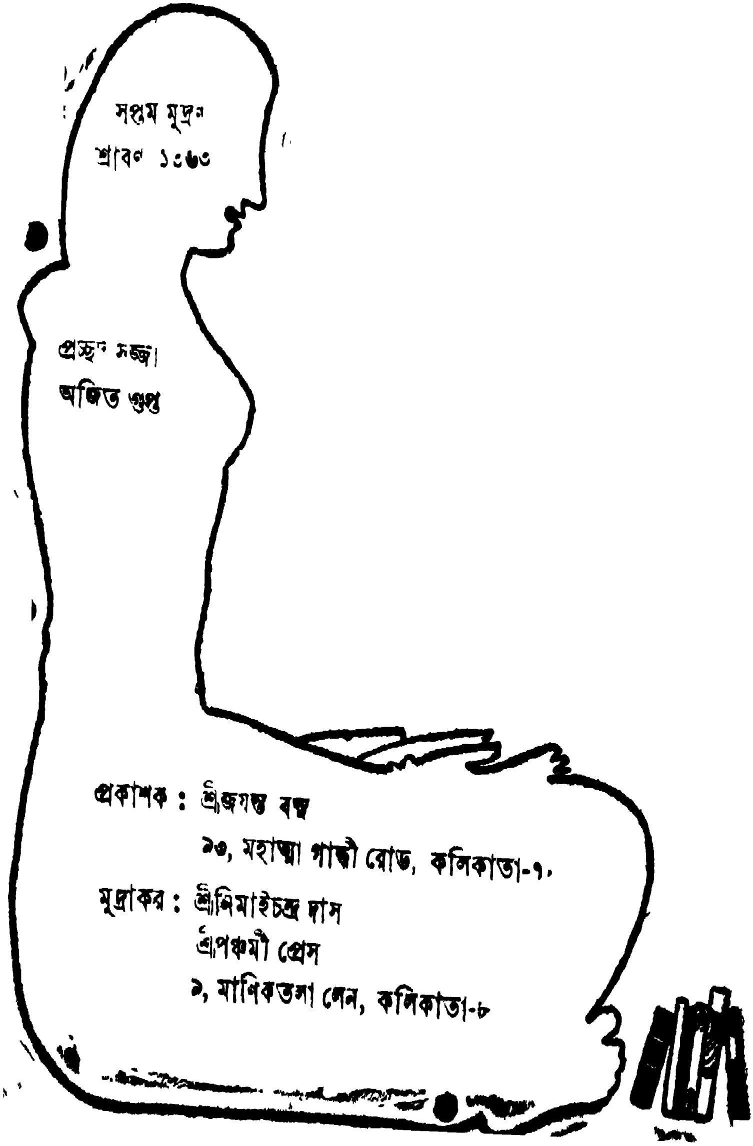
রক্তরাগ

দেবেশ দাশ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[প্রতিষ্ঠিত ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



সপ্তম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রচ্ছদ সজ্জা
অজিত গুপ্ত

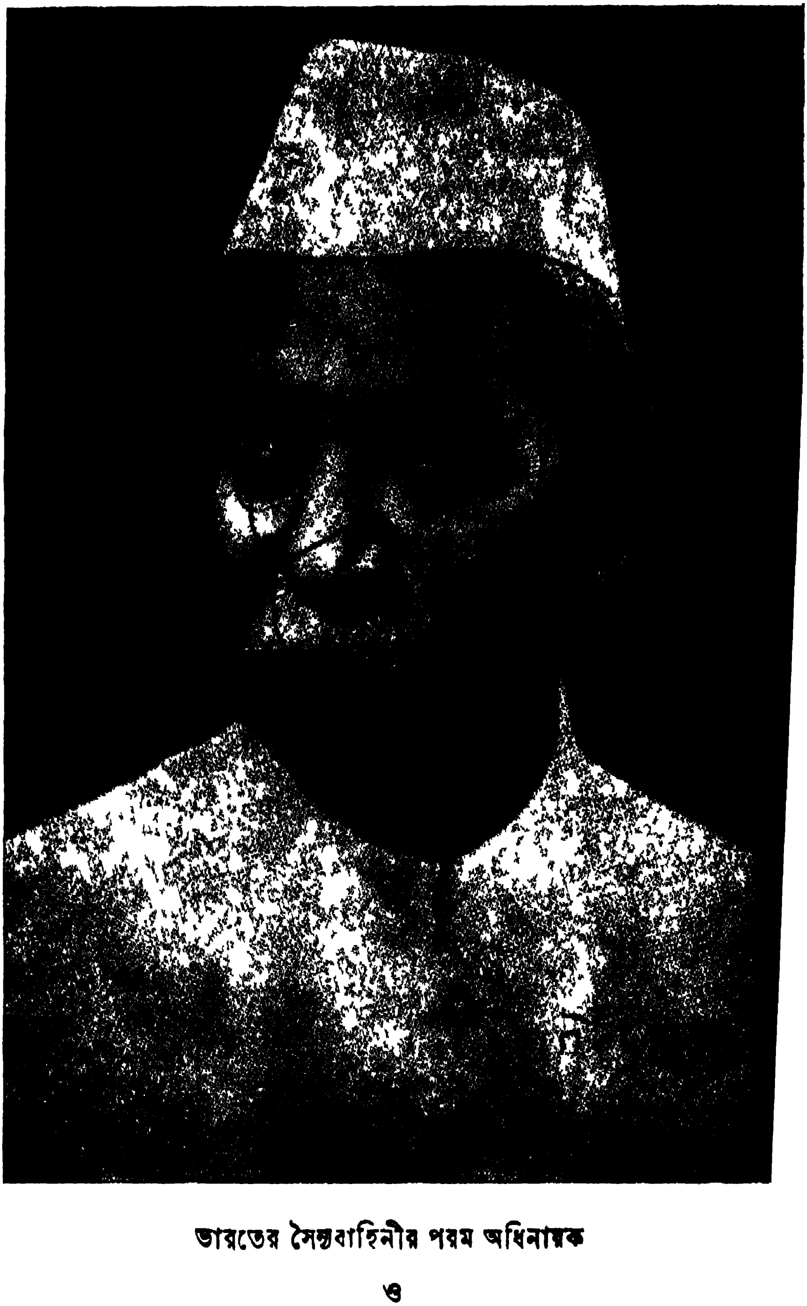
প্রকাশক : শ্রীজগন্ত বসু
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭.

মুদ্রাকর : শ্রীনিমাইচন্দ্র দাস
শ্রীপঞ্চমী প্রেস
৯, মানিকতলা লেন, কলিকাতা-৮

উৎসর্গ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু



ভারতের সৈন্যবাহিনীর পরম অধিনায়ক

ও

রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ

RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬

শ্রীদেবেশ দাশ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চ পদাধিকারী। নিজের উচ্চ পদের কর্তব্যগুলি পূর্ণভাবে করেও ইনি বাংলা সাহিত্যের রস গ্রহণ করেন ও তার সমৃদ্ধির জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেন এবং এইভাবে স্বনামধন্য বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জি, রমেশ চন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের ঐতিহ্য ইনি এই যুগে অব্যাহত রেখেছেন।

'রক্তরাগ' মূল বই বাংলাতে লেখা হয়েছিল। এর হিন্দী সংস্করণও সম সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে এটা আনন্দের কথা। রাষ্ট্রভাষার প্রতি এঁর এই প্রেম প্রশংসনীয়।

RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI.

এই বই সামরিক পটভূমিকায় উপন্যাসের রূপে লেখা হয়েছে। সামরিক জীবন সর্বসাধারণের কাছে এক রকম রহস্য হয়ে আছে। সেই জীবনের উপর এই বই আলোক পাত করছে। আমি আশা করি যে এতে দেশ এবং বিশেষ করে আমাদের সৈনিকরা কিছু দিক্‌দর্শন পাবেন আর খাঁটি সৈনিকের আদর্শ তাদের সামনে প্রতিভাত হবে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ

এই বইয়ের কথা

"বিশ্ব পুস্তক প্রদর্শনীতে ভারতীয় সাহিত্যিক সম্মানিত" এই শিরোনামা দিয়ে পি. টি. আই. সংবাদ পরিবেশন করেছেন যে রক্তরাগ ভারতীয় সাহিত্যিকের রচিত একমাত্র উপন্যাস যা জার্মান অনুবাদে এই বিশ্ব প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও বিপুল ভাবে সম্মানিত হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশেও রক্তরাগ প্রচুর প্রশস্তি লাভ করেছে।

সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যা পরিচয় তা সেকেলে ইংরেজী ক্ল্যাসিক্যাল উপন্যাসের মারফত। আধুনিক strategyর কিছুই জানি না। নেতাজী পরিচালিত সৈন্যদলের, বিশেষত যারা বাঙালী তাদের বিবরণ জানবার জন্য খুব কৌতূহল ছিল; রক্তরাগে তার vivid জীবন্ত চিত্র দেখে আনন্দিত হয়েছি, বিস্মিতও হয়েছি—এই বই সম্বন্ধে একথা লিখেছেন সাহিত্যগুরু শ্রীরাজশেখর বসু। বর্তমান রণনীতির নবীনতম স্বরূপ বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থই প্রথম দেখিয়েছে এবং নব্য শিক্ষিত বাঙালীর সামরিক গৌরবকে কল্পনার তুলিতে রঙ ফলিয়ে চিত্রিত করে লেখক তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে প্রমাণ করেছেন এই লিখে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার।

বাঙালীর পক্ষে সুদুর্লভ সামরিক পরিবেশের কঠোর আসনে বসে জোর তপস্যা করেছেন লেখক। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় সেই জোর তপস্যার ফলে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে একটি অনন্যসাধারণ সম্পদ, আর সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য পেয়েছে এই প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পরিবেশে লেখা উপন্যাস,—কথা-সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে একটি সার্থক দিক্‌চিহ্ন (গল্পভারতী)। আর সেই দিক্‌-চিহ্নকে বলিষ্ঠ মূল্যস্বীকৃতি দিয়েছেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি লিখেছেন যে—এই বইয়ে দেশ এবং বিশেষ করে আমাদের সৈনিকরা কিছু দিক্‌-দর্শন পাবেন আর খাঁটি সৈনিকের আদর্শ তাঁদের সামনে প্রতিভাত হবে। ভারতের প্রায় সব

ভাষায় অনূদিত রক্তরাগ সেই উদ্দেশ্যে সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের পাঠ করা বাঞ্ছনীয় বলে একটি ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডার প্রকাশিত হয়েছে এবং ভারতের বিভিন্ন সেনা-ছাউনীতে এই বই রাখা হয়েছে।

রহস্য উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর (প্রবাসী) এই বই পড়ার ফলে তুষারাবৃত কাশ্মীর সীমান্তে সেনাশিবিরে উষ্ণ অনুপ্রেরণার স্রোত বয়ে গেছে একথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় সামরিক এবং অসামরিক এই দুই জীবনেই রক্তরাগ এই প্রথম একটি নতুন জগতে নিবিড়ভাবে নিয়ে যায় আর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা এনে দেয় (হিন্দুস্থান-স্ট্যাণ্ডার্ড)। জাতির বৃহত্তম আকাঙ্ক্ষা, মহত্তর প্রচেষ্টা, জীবন ও কর্মে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যা ইয়োরোপীয় সাহিত্যকে বরণীয় করেছে তার রূপ এখনো আসেইনি আমাদের সাহিত্যে···কিন্তু রক্তরাগ তার প্রথম সূচনা করল···আমাদের মনের বন্ধ্যা মাটিকে উর্বর করে তুলেছে (যুগান্তর)। এই অসামান্য উপন্যাস বাঙালী অসামরিক এই বদনাম দূর করবে (অমৃত-বাজার পত্রিকা) এবং বাংলা সাহিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করবে (আনন্দবাজার)। বিশ্বসাহিত্যে রেমার্কের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে (দেশ—শ্রীপ্রমথ বিশী)।

স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজী সম্পর্কিত এক অপূর্ব অধ্যায়ের গল্প বলেই নয়, শাশ্বত মানবমনের চিরন্তন আকৃতি ও বেদনাও এতে পরিস্ফুট (ভারতবর্ষ) হয়ে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে এবং লেখকের সুনিপুণ কৃতিত্বেরই ঘোষণা করেছে (বসুমতী)। নিখিল ভারতীয় বেতারে সাহিত্য আলোচনায় বলা হয়েছে যে লেখক একটি জাতীয় কর্তব্য করার জন্য ধন্যবাদার্হ।

নিখিল ভারতের বহু সাহিত্য পত্রিকা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদকে উচ্ছ্বসিত স্বাগত জানিয়েছেন। রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস', হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ার-ওয়েল টু আর্মস,' প্রভৃতি ক্ল্যাসিক উপন্যাসের বিশ্বজনীন সামরিক আস্বাদ এই বই ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম এনে দিয়েছে বলে অভিনন্দন করেছেন। বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষায় রক্তরাগের অনুবাদ সেই সার্থকতাকে স্বীকৃতি-চিহ্ন দিচ্ছে।

একজন ইংরেজ জেনারেলের মুখ হঠাৎ দরজা খুলে উঁকি মারল। ঠুক ঠুক। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা জেনারেল ঘরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে ভয় আর মুখে চুরুট। ইউনিফর্মের কড়া ইস্ত্রি আর গলার নরম সুরে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। বুঝলাম ব্যাপার গুরুতর। টেবিলের ওপাশে সামনের চেয়ারখানা নীরবে দেখিয়ে দিলাম।

অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করুন। ততক্ষণে হাতের ফাইলটা সেরে নিই।

কিন্তু সেটুকু সময় জেনারেল সাহেবের পক্ষে বসে থাকা শক্ত। টুপীটা মাথায় ঠিক কায়দামাফিক খাঁচে রাখতে ভুলে গেছেন। গেছেন ভুলে ইয়া ছুঁচোলো গোঁফে স্নেহভরে তা দিতে। অতএব জিজ্ঞেস করলাম,—হোয়াট্‌স্ আপ ? অর্থাৎ ব্যাপারখানা কি ?

ঠোঁট কামড়িয়ে তিনি খুব ছোট্ট করে বললেন,—অল্‌স্ আপ। অর্থাৎ সব কুছ খতম।

ডানকার্কের সমুদ্রতীরে সব সৈন্য আর সাজসরঞ্জামসুদ্ধ বেধড়ক হেরেও ওরা হার মানেনি। লণ্ডন বোমায় তছনছ হয়ে গেলেও ওদের থুতনি উঁচু করে রেখেছিল। জার্মানিতে পাল্টা হামলা দিতে শুরু করেছে এখন। তবু বলে সব কুছ খতম। তা হলে অন্তত দু'কাপ গরম কফি আনান যাক।

ঘণ্টা টেপার সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল উঠে গিয়ে অফিস কামরার দরজাটা নিজে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। অর্থাৎ কফি নয়, শুধু কাজ। শুধু গোপন শলাপরামর্শ।

ফিসফিস করে জেনারেল বললেন,—'পন ইয়োর গড। আপনার ভগবানের দোহাই। এখন আপনাকে আমরা যে গোপন খবরটা বিশ্বাস করে বলছি তা একেবারে গোপন রাখতে হবে। কাল সকালে দেখবেন খবরের কাগজে বেরোবে একটা আজব খবর। জাপানীরা মণিপুরী নাগা পাহাড়ে হানা দিয়েছে। কিন্তু দেশসুদ্ধ সবাই শুধু এইটুকুই জানবে। লড়াইয়ের এলাকার বাইরে ও পিছনে শুধু আপনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি জানবেন—

বলেই জেনারেল একটু থামলেন। একটু কেশে আমার মুখের দিকে তাকালেন। হেসে বললাম,—এত বছর হোম-ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে আর স্টীল-ফ্রেমের (ইস্পাতের কাঠামোর) সভ্য হয়ে পেটটা ব্যাংক অব ইংলণ্ডের ভল্টের (গর্ভগৃহের) মত নিরাপদ হয়ে গেছে। স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন !

মাপ চাইতে চাইতে উনি বললেন,—জি. এইচ. কিউ. থেকে সে-সব খবরাখবর নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। কাগজে পত্রে অবশ্য কোন চিহ্ন রাখা হয় নি। ব্যাপারটা খুলেই বলেছি অকপটে।

চুরুটটা ততক্ষণে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু আমার মনে ধরে গেল আগুন।

শুধু জাপানী নয়, এসেছে সঙ্গে আই. এন. এ.। আপনাদের সুভাষ বোসের তৈরি, তারই নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত সৈন্যদল। সেই খবর আমরা কোন ভারতীয়কেই জানতে দিতে চাই না। কারণ অবশ্য বুঝতে পারছেন।

—কিন্তু কতদিন চেপে রাখতে পারবেন ? লড়াইয়ে আহত লোকেরা ত অ্যাম্বুলেন্সে করে ফ্রণ্টের পিছনে ফিরে আসবে।

—না, তারা আসবে না। তাদের আনা হবে না। তা ছাড়া মণিপুর-ডিমাপুর রাস্তা বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

—তবে ?

কিন্তু প্লেনে করে আই. এন. এ.-র ছড়ানো ইস্তাহার ছবি এসব দিল্লীতে পাঠান হচ্ছে। ওদের কি বক্তব্য, ওরা লোকের কাছে কি বলে আবেদন করছে সেসব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানা দরকার। যেসব লোক সরকারী কাজে এসব ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাদের এখন এসব দিতে চাই না আমরা। তা ছাড়া আমরা সঙ্গে সঙ্গেই মুখে মুখে সব জানতে চাই। লাল ফিতের গতানুগতিক ধারায় গেলে যা সময় লাগবে তা আমাদের হাতে নেই। দি স্যাণ্ডস্ অব টাইম আর রানিং আউট। তিলে তিলে সময় ফুরিয়ে আসছে।

তার পোর্টফোলিও থেকে ভাল ভাল ছবি, ইস্তাহার, আবেদনপত্র, বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী নানা ভাষায় বের হতে লাগল। সেই দুঃসহ আগুনের তাপে ভরা দিনটার স্মৃতি কি শুধু স্বপ্ন, না সত্য ?

তার আগে তিন-চার বছর ধরে সারা ভারতে অন্তরীণ "অ্যাকসিস" ইন্টারনী অর্থাৎ জার্মান জাপানী ইটালিয়ান বন্দী শিবিরগুলির অধিকর্ত্তা হিসাবে তাদের ক্যাম্প-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিবিড় পরিচয় হয়েছে। তাদের বন্দী-জীবনের ছোটখাট খুঁটিনাটি পর্যন্ত তদারক করাই ত শুধু নয়। ধরা পড়বার আগের ঘটনা. কাহিনী. পলায়নের চেষ্টা ও আবার দূর-দূরান্তরে ধরা পড়া কত কিছুরই অসীম বৈচিত্র্য, মানবতা, অমানুষিকতা সবই জেনেছি। আসাম-বর্মার সীমান্তে যুদ্ধের ছাপ বয়ে রয়েছে যে সব এলাকা সেখানে আমারো পায়ের ছাপ পড়েছে, পড়েছে মনের দাগ।

আর…আর….১৯৪২ সন থেকে আজাদ হিন্দের অস্তিত্বের শেষ সময় পর্যন্ত কখনো না কখনো নিষিদ্ধ বেতারে নেতাজীর আহ্বান ও আজাদ হিন্দ সরকারের সংবাদ লুকিয়ে শোনেননি এমন লোক আমাদের মধ্যে কাউকে খুজে পাবেন না।

সবার চেয়ে দামী মালমশলা জড়ো করা আছে যুদ্ধ-দপ্তরের গোপন কাগজ-পত্রে। কিন্তু তারো কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে ছাপানো বইয়ে। বিলেতে প্রকাশিত ইংরেজী বই বা ঘটনাপঞ্জীতে আই. এন. এ.-এর প্রায় সব খবরই পাওয়া যাবে। লাল কেল্লার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিচারের সময় বেরিয়েছে অনেক খবর। তারা আলোর মুখ দেখেছে আরো অন্যান্য সূত্রে।

তার চেয়ে বড় কথা—সামরিক জীবনের সঙ্গে কাঁধ-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলা আর যুদ্ধের নিয়মকানুন আমায় জুগিয়েছে অনেক কল্পনা, অনেক তথ্য। আর মেলে ধরেছে অনেক তথ্যের চেয়ে বড় সত্য অর্থাৎ মানবতার দৃষ্টিতে দেখা মানুষের কথা।

আর স্বপ্ন দেখেছি যে বীরোত্তম বাঙালী নেতাজীর প্রেরণায় ভীতু আর ভেতো বাঙালীর যৌবন সামরিক জীবনে অমৃত রসায়নের স্বাদ গ্রহণ করবে।

এই কাহিনী পুরোপুরি ভাবেই উপন্যাস। এই চরিত্রগুলিও সবাই কাল্পনিক। যাঁরা ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন তাঁদের কথাতে অবশ্য একটুকুও কল্পনা মেশানো হয়নি। ঘটনাগুলি, এমন কি খণ্ডযুদ্ধগুলি পর্যন্ত সত্য। সাহিত্যের ময়ানে রূপান্তরিত সত্য।

দেবেশ দাস

এক

মিলিটারী মেসে বিদায় উৎসব। কাল ভোরে ওদের সবাইকে যুদ্ধের জন্য চলে যেতে হবে। কোথায়, কেউ এখনো জানে না।

তোমার গিন্নী ঠিকঠাক আছে ত লেফটেনান্ট সিন্‌হা ?

হঠাৎ যদি হলঘরে বাজ পড়ত, আনকোরা নতুন মিলিটারী অফিসার সিন্‌হা এতটা বোধ হয় চমকাত না। তাড়াতাড়ি সে বুকটা চিতিয়ে ঘাড় উঁচু করে স্যালুট করে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন খোদ ব্রিগেডিয়ার। গুরুগম্ভীর স্বরে হাঁকছেন,—তোমার গিন্নী ঠিকঠাক আছে ত লেফটেনান্ট সিন্‌হা ?

গিন্নী ? স্যার, নো স্যার, গিন্নী ?—হঠাৎ বলে ফেলল দেবল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আই মিন ইয়োর হাজিফ্।

স্যার, আ-আ-আমি যে বিয়ে করি নি।

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সাড়ে ছ ফুট লম্বা বেতের মত দেহটা একটু যেন সহানুভূতিতে কুঁজো হয়ে এল। খাস ইংরেজ চেহারা। পাতলা ছিপ-ছিপে ঢ্যাঙা শরীরের উপর বেশ মানিয়েছে লম্বাটে সুঠাম মুখ। মুখে খুব আয়েশে লালিত-পালিত একজোড়া গোঁফ। তাদের পাশ দিয়ে যা খেলে যাচ্ছে তাকে দুষ্টামি-ভরা হাসি বলা যায়। তিন তিনখানা জবরদস্ত নামকরা ব্যাটালিয়নের মোটমাট তিন হাজার জোয়ান আর অফিসার ওই হাসিকে খুব ভাল করেই চেনে। তিন তিনজন লেফটেনান্ট কর্ণেল ওই হাসির ঠ্যালায় প্রাণান্ত।

হাসিটা আরো একটু তেরছা হয়ে নেমে এল প্রায় আধ ফুট নীচে লেফটেনান্ট সিন্‌হার উপর। ব্রিগেডিয়ার বললেন,—নেভার মাইণ্ড ওল্ড বয় (কিছু ভেবো না, বুড়ো খোকা), বিয়ে তুমি কর আর না-ই কর, গিন্নী তোমায় রাখতেই হবে।

বেচারী দেবল সিংহ! আরো ঘাবড়িয়ে মাথাটা হেঁট করে রইল। কিন্তু উত্তর তাকে দিতে হবে।

একটা গোটা ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট সাব-এরিয়ার সর্বেসর্বা কম্যাণ্ডার হচ্ছেন

ব্রিগেডিয়ার। তিনি যদি বলেন তুমি বিয়ে কর আর না-ই কর, গিন্নী তোমায় রাখতেই হবে, ব্যাপারটা বড় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই সব মারাত্মক ঠেলার চোটেই সম্ভবত ভদ্র গেরস্ত ঘরের বাঙালীরা মিলিটারীতে আসত না। বাবা:, সব সইতে রাজী আছি, মায় 'নো ভেকান্সি' নোটিশ লটকান সাহেবের ঘরের সামনে ধর্ণা। তা বলে শেষকালটা কিনা চরিত্র নিয়ে টানাটানি।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ারের গলা আবার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে দিল। তিনি হুকুম দিলেন—যাও, শীগ্‌গির গিন্নীর বন্দোবস্ত কর। কোয়ার্টার-মাস্টারকে এখন পাবে না; কাজেই সব সন্ধান ক্যানটিনের ম্যানেজারের কাছেই পাবে। তোমার ব্যাটল-ড্রেসের বোতামের দিকেও একটু খেয়াল রেখো।

স্যালুট করে সিন্‌হা হলঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য অফিসাররা। প্রায় সবাই ইংরেজ। নেহাত এই মহামারী লড়াইয়ের কল্যাণে আর্মিতে অনেক দেশী অফিসার নিতে হচ্ছে। গুটি তিনেক পাঞ্জাবী। আর একজন হিন্দুস্থানী আছে। নামটি তার রবীন্দ্র মিশ্র। ইংরেজেরা ডাকে তাকে পেয়ারের বুলবুলি রবীন পাখী বলে।

এহেন সংকটে পড়ে দেবল কারো মুখের দিকে তাকাতে পারল না। গুটি গুটি মেস-হাউসের বাইরে বেরিয়ে আসছে এমন সময় ব্রিগেডিয়ারের গলা আবার শোনা গেল,—তুমি ম্যানেজারকে বলবে আজই যেন তোমায় একটি হাজিফ্‌ প্রকিউর (গিন্নী যোগাড়) করে দেয়।

অনেক লোকের চাপা হাসি আর চোরা চাহনি পিছু নিয়েছে মনে হল দেবলের। যদি রাতের অন্ধকারের দয়াটুকু না থাকত সবাই দেখত যে বেচারার কান দুটি বিলিতী বেগুনের রঙের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

কি করবে দেবল এখন? কাল ভোরে কোথায় না জানি ফ্রন্টের দিকে তাদের ব্রিগেডকে চলে যেতে হবে। তাই আজ রাতে বিদায় ভোজ হচ্ছে। এখন ত বোকা, না হয় বেয়াদব সাজা যায় না। সবাই বদনাম দেবে যে চিরকেলে ভেতো বাঙালী এখনো, সৈন্যদলে ঢুকেও, সেই ভীরু তার্কিক,

না হয় কাপুরুষ রয়ে গেছে। সাফারিং ফ্রম কোল্ড ফিট—ভয়ে পা হিম হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সবাই বলবে এ কথা।

ঠিক সেইজন্যই পালানও যায় না। ভেগে গেলে ডেজার্টার বলে তাকে নিয়ে টানাটানি পডবেই। পালাবে কোথায় ?

কিন্তু চারিদিকে এত সেপাই, এত অফিসার। কই, তাদের মধ্যে খুব বেশী লোককে ত এমন কিছু খারাপ রীতি চরিত্রের মানুষ বলেও মনে হয় না। বিশেষ করে ওই যে ওরই মতন সবে মিলিটারীতে ঢুকেছে ব্রিটিশ সৈন্য আর অফিসাররা—ওরা ত সবাই "ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্ট" আইন মেনে যে যার কাজ ছেড়ে এ লাইনে এসেছে। ওদের বেশীর ভাগেরই ত ঘরে ছেলে-বৌ আছে। মিলিটারীতে এসেছে বলে ওরা যে গোপনে জঙ্গী রক্ষিতা রেখেছে তা ত মনে হয় না।

আর ব্রিগেডিয়ার সাহেবই বা কেমন লোক যে খোলাখুলি সবার সামনে যাকে কিনা বলা যায় রক্ষিতা তার কথা শুধিয়ে বসলেন ? এদিক সেদিক কয়েকজন মহিলা নিমন্ত্রিতাও ত এরি মধ্যে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁরা একথা শুনে কি ভাবছেন ? ব্যাপারটা কেমন যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

বাঁ হাতের মণিবন্ধে রিস্টওয়াচটা চেপে ধরল দেবল। এই ঘড়িটার নীচের ঢাকনার ভিতর আছে একটি ছোট্ট ছবি। যদি কিছু কেলেঙ্কারি হয় এই ছবিই তাকে দেবে সান্ত্বনা, করবে সাহায্য। সে ত একা নয়।

আজ মেস-নাইট হবে খুব জাঁকাল। কাল ভোরেই যাকে বলে কিনা স্ট্রাইক দি টেণ্টস্। অর্থাৎ তাঁবু গোটাও। এতদিন ত হল মিলিটারী ট্রেনিং আর ডিভিজন তৈরী। বার চৌদ্দ হাজার সৈনিক নানা ঘাঁটি থেকে এক এলাকায় হাজির হয়ে কোথায় যে যাবে তার খবর কেউ জানে না। শুধু রওনা হবার অর্ডার এসে গেছে।

শুধু কোন একটা দেশে গিয়ে মারবার আর মরবার জন্য তৈরী হবার অর্ডার। সামরিক জীবনে সে খবরটুকুই যথেষ্ট।

সেজন্য ভাবেনি দেবল। ভাবেনি ঘড়ির ঢাকনার নীচের ছবির মানুষটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গী জীবনে গিন্নীর আবির্ভাবের জন্য ওরা কেউ তৈরী ছিল না। অফ-ডিউটির সময়ে কেউ কেউ নটবর ধাঁচে টুপী বা হেলমেট

বাঁকিয়ে শিষ দিতে দিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন রামিয়া যে এখানকার একটি গেরস্ত পরিবারে সীতা খুঁজে পেয়েছে এ কথা গোপনে হলফ করে সে স্বীকার করেছে। কিন্তু লেফটেনাণ্ট সিন্‌হার উপর কিনা সবার সামনে হুকুম হল গিন্নী যোগাড় করে নেবার।

ক্যান্টিনের দরজা খোলাই ছিল। আজ খুব ভারী মেস-নাইট। এই ব্রিগেড এখান থেকে চলে গেলেও এইসব ব্যারাকে আবার নতুন দল আসবে ট্রেনিং নিতে। নতুন খদ্দেরদের জন্য ক্যান্টিন ভাল করে সাজান হচ্ছে। ইংরেজ ব্যবসাদারের মন্ত্রই হচ্ছে কাষ্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট। সে আমাদের দেশী দোকানদারের মত দয়া করে জিনিস বিক্রী করে না। কাজেই মিলিটারী ক্যান্টিনের ম্যানেজারও ইংরেজী কায়দা শিখে নিয়েছে।

সে লেফটেনাণ্ট সাহেবকে রাতে আসতে দেখে খুব নীচু গলায় অভ্যর্থনা করল। যেন কত গোপন কথাই না আছে। দেবল তাতে আরো ঘাবড়িয়ে গেল। বলে ফেলবে নাকি কথাটা? ম্যানেজার আবার ব্রিগেডিয়ার সাহেবের গোঁফের স্টাইলের সঙ্গে মিলিয়ে ছেঁটে রেখেছে নিজের গোঁফ। কে জানে চৌধুরী সিং হয়ত ওর সঙ্গে এক যোগসাজসেই আছে।

অনেকটা আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলতেই হল। ব্রিগেডিয়ার সাহেব চান যে আজ রাতেই একটি হাজিফ্ যোগাড় করতে হবে। ছি ছি, কি ঘেন্নার কথা! শেষ পর্যন্ত চরিত্রবান, কলেজে-পড়া দেবলকে কিনা মিলিটারীতে ঢুকে....?

কথাটা শেষ করতে হল না দেবলকে। চৌধুরী সিংহের গোঁফজোড়া আর ভুঁড়িখানাকে অট্টহাসি এমনভাবে দোলা দিতে লাগল যে সে একেবারে হতভম্ব। হাসির রোল ঢেউএর পর ঢেউ মেরে দেবলের পায়ের তলার মাটি ধ্বসিয়ে দিতে লাগল।

হাজিফ্? হাজিফ্ যোগাড় করতে বলেছেন ব্রিগেডিয়ার সাহেব? তাতে তোমার চরিত্র নষ্ট হবে? ইউ, ইউ এডুকেটেড ফুল, আপনার ইউনিভারসিটির নাম ত ডোবালেনই, আপনি এমার্জেন্সী কমিশনেরও নাম ডোবালেন। ছ্যাঃ, ওই সব হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া লালমুখোগুলো আজ আমাদের হিন্দুস্থানীদের নিয়ে কি হাসাহাসিই না করবে?

কেন, ব্রিগেডিয়ার ত হাজিফের কথাই বলেছেন? আহত হয়ে বলল দেবল।

আলবৎ বলবেন, পাঁচশো বার বলবেন। আর্মিতে এসেছেন আর ভুলে গেছেন হাজিফ্ কাকে বলে?

সত্যিই ত। ছি, ছি, লজ্জার কথা। এতক্ষণে দেবলের মনে পড়ল যে সবাই ইউনিফর্ম দুরস্ত করবার সময় হাজিফের কথা তোলে। ছুঁচ সুতো বোতাম এসব যে টুকরীতে রাখা হয় তাকে বলে হাজিফ্। বানানটা একই, কিন্তু গিন্নী নয়, হাউস-ওয়াইফ নয় মোটেই।

এত বড় একটা ভুল সে কেমন করে করল? এ কি শুধু বিস্মৃতি? না, দেশ ছেড়ে যাওয়ার, মৃত্যুর সঙ্গে অভিসারে বেরিয়ে পড়ার আগের বিভ্রম? না দিশেহারা করে তোলার মত অন্য কিছু?

অতগুলি অফিসারের সামনে খোলাখুলি ঠাট্টা, অতজনের মুচকি হাসি, ব্রিগেডিয়ারের ইউনিফর্মের বোতাম সামলানোর জন্য ইঙ্গিত সব কিছুরই সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হবে এখন। সৈনিক জীবনে অন্যমনে ভুল পা-ফেলার ক্ষমা নেই।

তৈরী মন নিয়ে সে মেসের হলঘরে ফিরে এল। পার্টি তখন খুব জমে উঠেছে।

কিন্তু তার দিকে আর নজর নেই কারো। ওরা ভুলে গেছে একজন ভারতীয়ের অস্পূর্ণ ইংরেজী জ্ঞানের জন্য হাসি-তামাসা। ভুলে গেছে তার চরিত্র হারাবার ভয়ে আঁৎকে ওঠার দৃশ্য। এখন চলেছে অন্য একটা হাসির কিছু।

মুহূর্তে যাদের জীবনটা দিয়ে ফেলতে হতে পারে, তাদের অনেকক্ষণ ধরে একটা ব্যাপার টেনে ধরে রাখলে চলে না। কাল সকাল থেকে শুরু হবে ওদের অজানা পথে যাত্রা। মরণের অভিসারে, জীবনের অভিশাপে ছড়ানো দয়াহীন ক্ষমাহীন যে পথ, সে পথে যাত্রা।

দেবলও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কয়েকজন বড় মিলিটারী অফিসারের স্ত্রীও এসেছেন। তাঁদের পক্ষে আজ বিদায় রাত্রি। এর পরে ওঁরা এখান থেকে কোন বড় জায়গায়

মিলিটারী স্ত্রীদের মেসে, না হয় আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যাবেন। সঙ্গে যাবে প্রতিদিন কোন নাম-ধাম না দেওয়া মিলিটারী পোষ্ট থেকে হঠাৎ কোন চিঠি পাওয়ার আশায় দিন গোনা। কিন্তু কোন দিন হয়ত একজনের হাতে লেখা খাম না-ও আসতে পারে—আসতে পারে একটা সরকারী টেলিগ্রাম। কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন……।

কি জানাচ্ছেন তা আর জানার দরকার হবে না তখন।

তাই বিদায় রাতটাকে একটু সহজ করে নেবার জন্য আজ শুধু মিলিটারী স্ত্রীরাই আসেন নি। কয়েকজন স্থানীয় বেসামরিক অফিসার ও তাঁদের স্ত্রীরাও এসেছেন। সবার সঙ্গে মিশে মনকে রাখতে হবে তাজা, রাখতে হবে ভুলিয়ে। তাই বুঝি ক্যান্টিনের ম্যানেজার আজ অত রঙীন কাগজের ফিতে আর বেলুন দিয়ে ঘরখানাকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

কথায় বলে খানাপিনা। কিন্তু এক্ষেত্রে পিনাটা-ই আগে হয়েছে। তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে চুটকী খাবার জিনিস কত কি—ক্যাশু বাদাম আর আলুর চিপ্‌স ত সামান্য কথা। দেওয়া হয়েছে ককটেল সসেজ, মশলা মাখান ফ্যান্সি ডিজাইন করে কাটা সিদ্ধ ডিমের টুকরো, চীজ ষ্ট্র অর্থাৎ পনীরে ভাজা ময়দার তৈরী লম্বা কাঠি, চৌকো চীজের উপর বসানো স্প্যানিশ পেঁয়াজ, ঘিয়ে ভাজা টোস্টের ছোট টুকরোর উপর সাজানো সার্ডিন মাছ। আনুষঙ্গিকই যদি এত, বারুণী দেবীর ডালা না জানি সাজানো হবে কত নৈবেদ্য দিয়ে। জিন আর হুইস্কি, রাম আর ব্রাণ্ডি, শেরী আর পোর্ট এসবের নাম ত আগে থেকেই জানা ছিল।

কিন্তু জখম্-ইর দিল্ বস্তুটা কি?

ক্যাপ্টেন জো বড় হাসিখুশী দিলদরিয়া লোক। তাঁর কাঁধে তিনটে তারা আর দেবলের মোটে দুটো। তাতে বাধল না একটুও। জো ঠাট্টা করে বলল, দেব হচ্ছে আজকের পার্টিতে দেবুতাঁত। ওর অনারে (সম্মানের জন্য) এস সবাই আমরা খাই জখম্-ইর্ দিল্।

বিলেতে মেয়েদের যখন প্রথম সমাজে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বের করা হয় তাদের বলে দেবুতাঁত। ঠাট্টাটাতে দেবলের কান লাল হয়ে উঠল। কিন্তু

আরো গাঢ় লালরঙের ছিল ওই পাঁচমিশেলী নতুন তৈরী মদ। ইংরেজীতে ওটাকে ওরা নাম দিয়েছে ব্লিডিং হার্ট। রক্তঝরা হিয়া।

আজ কি দেবল রক্তঝরা হিয়া নিয়ে তার মিলিটারী নাম লেখানর আগের কথা ভাবতে বসবে ? বি. এ. পাস করে ড্যালহাউসী স্কোয়ার অঞ্চলে মিছে ঘোরাঘুরির কথা ? পেনশন পাওয়া বাপের টানাটানির সংসারের কথা ? আর···আর ···থাক সেসব পিছনে ফেলে আসা কথা।

তার চেয়ে মজে যাওয়া যাক এই রাশিয়ান স্ক্যাণ্ডাল খেলাটাতে।

স্ক্যাণ্ডাল নামটাতে দেবল সামরিক জীবনের প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল বটে। কিন্তু সে এমন কিছু নয়। নেহাত নিরেমিষ একটা তাসের খেলা। সবাইকে তাস বাঁটা হল। সেখানকার কমিশনারের স্ত্রীও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সবচেয়ে সিনিয়র লেডি। ফৌজী জীবনে সিনিয়র জুনিয়র মেনে চালাটা রাইট, লেফ্‌ট, অ্যাবাউট টার্ণের মতই কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলতে হয়। অতএব কমিশনার সাহেবের গিন্নীই তাঁর বিরাট দেহ জাঁকিয়ে সবার মাঝখানে বসে তাস বাঁটলেন।

তারপর আর এক প্যাকেট তাস তুলে নিয়ে 'শাফল' করে প্রথমেই তুলে ধরলেন হরতনের রাজা। বাকি তাস উলটিয়ে রাখলেন।

এবার বাঁটা তাসের মধ্যে যে হরতনের রাজা পেয়েছে তাকে সে-কথা স্বীকার করতে হল। যে পেয়েছে তার অধিকার হবে একটা প্রশ্ন করবার। সে জিজ্ঞাসা করল—কে এখানে ভাল নাচতে পারে ?

কমিশনার-গিন্নী হাতের প্যাকেটের সবার উপরের তাসটি সোজা করে ধরলেন। বের হল চিঁড়ের দহলা। সে বেচারা আর নাচবে কি ? নেহাত গোবেচারা দহলা। সবাই চেঁচামেচি করে ফুঁকে দিচ্ছে দহলাকে, এমন সময় গোঁফের দু কোণায় পাক দিতে দিতে সাড়ে ছ ফুট ব্রিগেডিয়ার হেঁকে উঠলেন যে আর কেউ নয়, তিনি হচ্ছেন সেই দহলা। তবে নিশ্চয়ই কমিশনার-গিন্নী রগড় দেখবার জন্য তাঁর হাতে একটা দহলা আছে জেনে নিয়ে নিজের হাতের দহলা তুলে ধরেছেন। নিশ্চয়ই শ্রীমতী ম্যাজিক জানেন। না হলে তিনি যে কত ভাল নাচিয়ে তা তাসের মধ্যেও কি করে প্রমাণিত হল ?

অবশ্য ব্রিগেডিয়ারের নাচা আর তাঁর সঙ্গিনীর পায়ের বুড়ো আঙুল খেঁতলান যে প্রায় একই জিনিস তা ভুলবার চেষ্টা করে সাবাই খুব জোরে হাততালি দিয়ে নিল।

এবার তারই প্রশ্ন করার পালা। তিনি হাঁকলেন, আমা হেন ওস্তাদ নাচিয়ের সঙ্গে কে নাচতে রাজী আছে?

বরাত ভাল ব্রিগেডিয়ারের। সবাই এ ওর দিকে তাকাচ্ছিল পাছে কোন হোঁৎকা মিনসের হাতে এবার কমিশনার-গিন্নীর তাসটা পাওয়া যায়। কিন্তু যে তাসটা তিনি এবার তুললেন তা পাওয়া গেল একটি অল্পবয়সী ওয়াক-আইএর হাতে। দুজনেই মহা খুশী। সবার চটাপট হাততালি এই মনের মত ফলকে সমর্থন করল।

সবার সামনেই ঠোঁটের সিন্দুর আর একটু ভাল করে ঘষে নিয়ে কুমারী ওয়াক-আই মিহি সুরে হাঁকলেন,—কে আমায় আজ গুডনাইট কিস্‌ দেবে।

তার প্রশ্নে ছিল না লজ্জা, অথবা স্বরে জড়তা। দেশের জন্য যারা প্রাণ দিতে এসেছে তাদের খোস মেজাজ রাখতে গিয়ে একটুখানি গুডনাইট কিস্‌, একটুখানি মধুর স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করা—এতে এমন আর আঁৎকে উঠবার মত কি আছে?

সব পুরুষ অফিসারই ঘাড় উঁচু করে উসখুস করতে লাগল। কার কপালে নাচছে সেই ভাগ্যবন্ত তাসখানা যা এখন কমিশনার-গিন্নীর হাতে উঠবে? ক্যাপ্টেন জো ত দাঁড়িয়ে উঠল। একটা জোর রকমের দীর্ঘশ্বাস ফোঁস করে ছেড়ে গেয়েই উঠল বিং ক্রস্‌বির গান—দি ডে ইউ কেম অ্যালঙ: যে দিন তুমি উদয় হলে হেথা।

কিন্তু তাসটা উঠল দেবলের কপালে। বেচারী না পারে স্বীকার করতে, না পারে চেপে রাখতে। কারো না কারো হাতে সে তাস আছেই। লুকোবার উপায় নেই। চট করে সেটা হাত সাফাই করে চালান করে দিল লেফটেনাণ্ট উরায়ম সিংয়ের হাতে। কৃতজ্ঞতার চোরা চাউনি হেনে নটবর ভঙ্গিতে উরায়ম সিং উঠল দাঁড়িয়ে, বলল,—ভুলো না, ভুলো না এই তাসটিকে। সকলে সাক্ষী থাকুন বৃন্দাবনে। থুড়ি, সাব-এরিয়াতে। মিলিটারী ব্যাণ্ডের ব্যাজনাট্টা ত অন্তত সাক্ষী রইল।

রাত অনেক হল। কালকেই ঘাঁটি ছেড়ে যেতে হবে অন্য কোথাও। এবার ওরা একটি শেষ খেলা খেলে নেবে। নাম তার ফরফিট অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত হওয়া। প্রত্যেককেই কিছু-না-কিছু জমা দিতে হল। বদলে মিলল একটি করে চিরকুট আর কালো বোর্ডে নাম লিখে ভাগ্যপরীক্ষা। যে বেচারী এই ভাগ্যের জুয়ায় শেষ পর্যন্ত হারবে সে জমা জিনিষ ফেরত পাবে না। অবশ্য পেতে পারে, যদি তার জুটি মহিলার পায়ের জুতার ফিতে খুলে আবার পরিয়ে দেয়।

জুটি জোটানর কারবারটা মন্দ নয়। একটা টুপিতে ছোট ছোট চিরকুটে পৃথিবীর সব নামকরা মহিলাদের নাম লিখে রাখা হল। সে টুপি থেকে সব মেয়েরাই একটা করে চিরকুট তুলে নিলেন। কার নাম হল কুইন নিশ্চিনা, কেউ বা মেরি পিকফোর্ড বা নর্মা শিয়ারার বা মারী আঁতোয়ানেৎ। অন্য একটা টুপিতে চিরকুটে লেখা রইল তাদের স্বামী বা প্রণয়ীদের নাম। সব পুরুষকেই তুলে নিতে হল একটা করে নাম।

তারপর যে যার সঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নাও। তার সঙ্গে বসে পড়। হাসিগল্পে ঠাট্টায় মারি অ্যাঁতোয়ানেৎকে খোস মেজাজে অবশ্যই রাখবেন ফরাসী-সম্রাট লুই। তা না হলে আজ রাতে তার বদনাম হয়ে যাবে। তাছাড়া যদি খেলায় হেরে গচ্ছিত ধনটি ফেরত নেবার সময় সঙ্গিনীর জুতোর ফিতে খুলে দিতে হয়?

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই হল ভরসন্ধ্যা। লেফটেনাণ্ট দেবলের ভাগ্যে সঙ্গিনী জুটল একটি আনকোরা বিলিতী তরুণী। ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে বিলেত থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা সৈন্যদের দেখাশোনা করবে। যুদ্ধের ফ্রণ্টে সৈন্যদের দরকারে লাগার মত জিনিস বানিয়ে দেবে। প্রত্যেক ইউনিটে বা হেড-কোয়ার্টার্সে স্টাফ অফিসারের কাজ করবে যাতে পুরুষরা ছাড়া পেয়ে লড়াইয়ে বা বেশী পুরুষালী কোন কাজে যেতে পারে!

মেয়েদের মধ্যে যারা বেশী চালাক বা দুঃসাহসী তারা সাত সাগর পার হয়ে একেবারে এই দূর দেশ ইণ্ডিয়ায় চলে আসছে। সুবিধা কত। নেই র‍্যাশন, নেই বোমার হামলা। নেই ছেলে স্বামী বা ভাই যুদ্ধে মারা গেছে এ খবর হঠাৎ পাওয়ার ভয়ে ঠোঁট চেপে প্রাণপণে কাজ করে যাওয়া।

এ-হেন একটি স্ট্রীমলাইন করা তরুণী রোমান্টিক ডাকাত রবিনহুডের প্রণয়িনী ম্যারিয়ান হয়ে দেবলের পাশে এসে বসল। মিষ্টি হেসে শুধালো —হ্যালো জর্জ, তোমার কোন্ ধনটি আজ ফরফিট করবে?

হ'ত যদি সে পুরুষানুক্রমে সামরিক বংশের ছেলে, নিদেন পক্ষে বেণী পাকাইয়া শিরে পাঠানদের তরুণ, মুখে কি তার আটকাত জবাব? কাল সকালেই রওনা হতে হবে বলে আজ অবশ্য নাচ নেই, কিন্তু মন যে রুম্বা নাচের কদম চালে নেচে উঠত।

কিন্তু দেবলের মুখে কথা যোগাল না। মাত্র ক'মাসের মিলিটারী জীবন। সত্যি কথা বলতে কি, মুখে এখনো রয়েছে সিভিল ছাপ। একটু সলজ্জ হাসি হাসল।

তরুণী ছাড়বার পাত্রী নয়। চট করে সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার সদ্য বিলেত থেকে আসা মনে দেবলেব দেশী গায়ের রঙ এখনো কোন বাধা সৃষ্টি করে নি। নিজেই হাত থেকে দেবলের ঘড়িটা খুলে নিল। এই রইল তোমার হাত-ঘড়ি আমার কাছে গচ্ছিত। যদি আমার রবিনহুড হেরে যায় —হয় পায়ের জুতোর ফিতে খুলে দিতে হবে, না হয় হল ঘড়ি বাজেয়াপ্ত।

দেবল শুধু একবার ঘড়ির নীচের ডালাটার দিকে তাকাল। তার বেশী কিছু ভাববার বা করবার সাহস নেই। জীবনের খেলায়, মরণ নিয়ে খেলায় হার-জিত সবই ত আছে। তা বলে ওই ঘড়িতে গচ্ছিত স্মৃতিটুকুও কি হয়ে যাবে বাজেয়াপ্ত? কে জানে!

এ দিকে কমিশনার আর ব্রিগেডিয়ারের মেমসাহেবরা ঠিক করলেন যে আজ যখন শুধু স্ট্যাগ-পার্টি (তরুণ হরিণ অর্থাৎ শুধু পুরুষদের পার্টি) নয় আর কাল ভোরেই ব্রিগেডকে চলে যেতে হবে, আজকের পার্টি তাড়াতাড়ি শেষ করা উচিত। পরস্পরের কাছে বিদায় নিতেও ত সময় লাগবে কিছু। অথচ সবচেয়ে প্রবীণা মহিলা সভা ভঙ্গ করার ইঙ্গিত না দিলে কেউ ত উঠবার নামটি করতে পারবে না।

উঠলেন তিনি। সসম্মানে সবাই তাঁর দেখান পথ নিল। হলের মধ্যে গোল করে দাঁড়িয়ে, হাত-ধরাধরি করে সবাই গাইল "ফর হি ইজ এ জলি গুড ফেলো"। সত্যিই তো খুব প্রিয় খুব ভাল মনে হচ্ছে আজ প্রত্যেককে।

চারিদিকের নিরাপদ বেসামরিক সংসারের মাঝখানে এদের যে আজই শেষ রাত। সবাই ভাবছে এর পর কি হবে। এগিয়ে ত চলছে সবাই। কিন্তু ফিরবে ক'জনা ?

আজ আর তোমার গচ্ছিত ধনটি খোয়া গেল না আমার হাতে, জর্জ। খুব আদর করে ঘনিষ্ঠতার সুরে বলল ম্যারিয়ান তার ক্ষণেকের রবিনহুডকে। টিল উই মিট এগেন। আবার যতদিন না দেখা হয় ততদিন শুধু জানিয়ে যাচ্ছি আউফ হি দর্‌শেহেন। বিদায় ভারতীয় বন্ধু !

অচেনা ভারতীয়কে যখন ওরা বন্ধু মনে করে তখন তাকে ডাকে জর্জ। ভাব যখন গভীর হয়ে আসে তখন সাদামাটা ইংরেজী গুড-বাইয়ে আর কুলোয় না। জার্মান ভাষায় বেরিয়ে আসে সেই রোমান্সের গন্ধভরা বিদায়বাণী—আউফ হি দর্‌শেহেন !

মেস থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ঝোপের পাশ দিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল দেবল। ওপাশে গা-ঢাকা দিয়ে কারা কথা কইছে। তাদের পথে কাঁটা হয়ো না দেবল—মনে মনে সে নিজেকে সমঝাল।

ব্যাকুল স্বরে পাগলের মত বলে যাচ্ছে উরায়ম সিং—না না, তাসের খেলাটাকে শুধু তাসের খেলা বলে উড়িয়ে দিয়ো না, ডার্লিং। আচ্ছা, দাও শুধু একটি বিদায় চুম্বন। শুধু একটি। গোপনে তোমায় জানাচ্ছি—আমাদের যেতে হচ্ছে 'সিয়াক' (সাউথ-ইষ্ট এশিয়া কম্যাণ্ডে)। জাপানীর হাতে যে কোন দিন হয়ে যাব শুধু 'ডেড মাটন'। তার আগে শুধু একটি··· ।

দুই

বিয়ের মত, বন্ধুত্বের মত লড়াইও করা উচিত কেবল সমানে সমানে।

কিন্তু হায় ঘোর কলিকাল ! জাপানীরা মোটেই সামনা-সামনি লড়তে আসছে না। এমন কি লড়ছে না পর্যন্ত। তবু জিতে যাচ্ছে।

তাই ১৭নং ইণ্ডিয়ান লাইট ডিভিসনের অপারেশন অর্ডারটা একটু অন্তরকম ভাবে তৈরী করা হয়েছে। মিলিটারীদের ছাঁটকাট ভাষায় অপারেশন অর্ডারকে বলা হয় শুধু 'ও, ও'।

এতে আলাদা আলাদা করে লড়াইয়ের বর্তমান হাল, এখন কি উদ্দেশ্য নিয়ে লড়তে হবে, কেমন করে কি করতে হবে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা থাকে। প্রত্যেক ব্রিগেড আর আর্টিলারী ডিভিসনের জন্য আলদা করে নির্দেশ থাকে। কিন্তু প্রত্যেক ব্রিগেডেরই অনেক কোম্পানী, অনেক ইউনিট এরই মধ্যে খরচের খাতায় পুরোপুরি উঠে গেছে। জাপুর সঙ্গে লড়তে এগিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে একেবারে যাকে বলে সেই অগস্ত্য-যাত্রা।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব এ-হেন অবস্থায় এখন কি করবেন? জার্মান-সিলভারের ট্যাংকার্ড অর্থাৎ লম্বা ইয়া বড় জাগে করে আরামসে বিয়ার খেয়ে দিন কাটাবার পথ নেই। এমন কি স্কিটল্‌স্ অর্থাৎ ডাণ্ডাগুটির বিলিতী সংস্করণ খেলা করবারও ফুরসত নেই। এই রবারের জঙ্গলে ব্রিগেড নিয়ে ঢোকা ইস্তক বেচারার বড়ই সময় খারাপ চলেছে।

তিনি স্বেচ্ছায় অনেক আরামের জিনিস নিজে থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। আরামের জন্য দরকারী সব জিনিসপত্র এখনো সঙ্গেই আছে। কিন্তু দলের "মর‍্যাল" অর্থাৎ মনের জোর বজায় রাখবার জন্য তিনি সবার অসুবিধা একসঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন।

খুব যত্নে বাঁচিয়ে রাখা একটি পাইপ আর তামাক তিনি বের করলেন। ভাবতে লাগলেন যে গোটা কয়েক দিন আগেও তাঁর অপারেশন বেজ অর্থাৎ লড়াইয়ের এলাকায় হেড-অফিসের অবস্থা খুব জমজমাট ছিল। প্রত্যেক অফিসারের ছিল একটি করে ছোট্ট এক কামরার কুটীর। বর্ষাতির মত মোটা গ্রাউণ্ড-শীট বাঁশের কাঠামোতে বেঁধে প্রত্যেকের আলাদা বাথরুম পর্যন্ত ছিল। বাঁশের কঞ্চির তৈরী ঝিলমিলির আড়াল দিয়ে তৈরী হল একটুকরো বারান্দা। তাতে বাঁশের টেবিল চেয়ার মায় চারপাই পর্যন্ত সাজানো।

আহা, তাঁর সাধের সাজানো গোছানো ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্সটা মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ ভুঁয়ে দাঁড় করানো। কিন্তু জাপানী ত নয়, যেন যম! আঁতুড়েই সাবাড় করে দিল। একটুও তর সইল না।

মায় মেসটা পর্যন্ত।

ক্যাম্পের চেয়ে তার মেসের পায়া ভারী বেশী।

ব্রিগেডিয়ার সেই অল্প বয়সেই স্তাণ্ডহার্স্টে মিলিটারী ট্রেনিং নেবার সময়

প্রথম ভাগে পড়েছিলেন যে – দি আর্মি মার্চেস অন ইট্স ষ্টম্যাক। অর্থাৎ সৈন্যরা মার্চ করে পেটে ভর ক'রে, পায়ে নয়।

সে শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে তিনি মেনে এসেছেন এতদিন। তাই যে জঙ্গলে তাঁর হেড-কোয়ার্টার্স ছাউনি গেড়েছিলেন তাতে একটা ছোট্ট খালের পারে টিলার উপর মেস বসান হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা খাবার হলঘর। তার সামনে চওড়া বারান্দা চাটাইয়ের ঘেরা। সেখানে পাতা হয়েছিল 'বার' অর্থাৎ মদের ভাঁড়ার আর বৈঠক। বাঁশের চেয়ারের উপর প্যারাসুট সিল্কের কুশন তাকিয়া কিছুরই অভাব ছিল না।

একদিন রয়াল এয়ারফোর্স তাদের জন্য হরেক রকম খাবার আর লড়াইয়ের সবঞ্জাম পোঁটলায় বেঁধে বেঁধে আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছিল। সেই পোঁটলার নীচের প্যাডগুলি পর্যন্ত চেয়ারের পায়ের নীচে বসিয়ে নিয়েছিলেন। যেন একেবারে স্প্রিং চেয়ারের আরাম আমদানি হয়ে গেল। তাঁর সব অফিসাররাই স্যালুট ঠুকে গেলাস উঁচু করে বলেছিল,– স্যার, এই মেসটাই আপনার মাষ্টারপীস। সেরা কীর্তি।

আহা, এত সাধের হেডকোয়ার্টার্সটা যে নস্যির মত উবে গেল জাপানী হামলায়!

খানাপিনা, আরাম করনা সব কিছুরই পাকা বন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন কিন্তু বর্বর দুশমন সামান্য একমুঠো চাল চিঁড়ে ন্যাকড়ার ফালিতে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বন-বাদাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেয়। তার সঙ্গে এইসব সভ্য সিপাইরা পারবে কি করে? কাজেই ব্রিগেডিয়ার সাহেবের মনে জাপানীদের বিরুদ্ধে নালিশের অন্ত ছিল না।

জাপানীরা মোটেই স্পোর্ট নয়। তারা কেবলই ব্রিটিশ সৈন্যদের "বাইপাস" করে অর্থাৎ পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে বড় বড় শহরগুলি দখল করে নিচ্ছে। তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কিছু সৈন্য শত্রুর পিছন থেকে হামলা করে। বাকী সবাই আরো দক্ষিণে মালয়ের রাজধানী কুয়ালা-লামপুরের দিকে পিঁপড়ের মত পিল পিল করে ধেয়ে যায়।

শত্রুরা পিছন থেকে রসদ বা গোলাবারুদ আমদানির পথ কেটে

দিয়েছে। হঠাৎ কোন আর্মি-সাপ্লাই কোর (জঙ্গী রসদ্-সরবরাহের দল) একটা চল্‌তা ক্যান্টিন বা ফিল্ড-কিচেন নিয়ে যে হাজির হবে সে পথ বন্ধ।

অথচ অপারেশন অর্ডারের চৌদ্দ নম্বর দফায় লেখা আছে যে, এখন যে জায়গাটা দখলে আছে শেষ সিপাই আর শেষ গুলীটি থাকাতক তা কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।

ভাবতে ভাবতে পাইপটা টানতে ভুলেই গিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার। ওটাতে তাঁর দাঁতের ব্যায়াম শুরু হয়েছে।

এমন সময় তাঁর তিন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পুরো স্যালুট করে টান হয়ে সামনে দাঁড়াল। অপারেশন অর্ডার এসে গেছে। হয়ত এখুনি কোন নতুন ভাবে দল তৈরী করে দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু যে চার-চারটে সেকশনকে টহলদারী করতে পাঠান হয়েছিল তারা সবাই গত তিনদিন ধরে নিখোঁজ, না-পাত্তা।

এমন কি তাদের সঙ্গে যে বেতার যন্ত্রপাতি ছিল তা থেকেও কোন সাড়া-শব্দ আসেনি। জন ছয় লোক করে টহলদারী দল তৈরী করলেই চলত। কিন্তু জাপানীরা দলে ভারী আর লড়াইয়ে মজবুত বলে এগার জন লোক করে এক-একটা গোটা সেকশনকেই টহলদারীতে বের করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। বিপদ সঙ্গীন বলে এই চারটে সেকশনের খবরদারী করে যোগা-যোগ বজায় রাখবার জন্য গিয়েছে স্বয়ং ক্যাপ্টেন জো। বিলেতে ষ্টাফ কলেজে টহলদারী কাজের বাহাদুরীতে ছাত্র হিসাবে জো খুব নাম করেছিল।

*　　*　　*

ঘোর জঙ্গলে বসে ক্যাপ্টেন জো-ও দাঁতের ব্যায়ামই করছিল। তবে সিগারের উপর নয়, এমন কি দুশমনের উপর রাগের চোটেও নয়। নেহাত নিরীহ গুটিকয় মিলিটারী বিস্কুটের ওপর।

চিবোতে চিবোতে জো হয়রান হয়ে বলল,—সিনহা, গেল ক'বছর ধরে আমি যে দাঁতের ডাক্তারের বিল দিয়ে এসেছি তা নেহাত মাঠে মারা যায়নি।

ঠাট্টাটা হঠাৎ বুঝতে না পেরে কেবল শুধু একটুখানি দাঁত দেখালো। কি জানি বেশী দেখালে যদি আবার বেয়াদবী হয়ে যায়।

জো আবার বলল, --না, সিন্‌হা, ফ্যাসাদে পড়লে তোমাদের রসকষ একেবারে শুকিয়ে যায়। তা ছাড়া তোমাদের ইণ্ডিয়ানদেব দাঁত ভালই থাকে। তোমাদের বোধ হয় আর্মি-বিস্কুট খাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না।

উরায়ম সিং মাথা নেড়ে বললে,—মোকা পেলে দুয়েকটা বুনো মুবগী বা পাখী-টাখী আমরা শিকাব কবি, ক্যাপ্টেন। শুধু 'সি' র‍্যাশনে চালাবাব মত লোক আমি নই। আমাব সেকশন প্রথম দুদিন অবশ্য তাতেই চালিয়েছিল। তা প্রথম যেদিন আমবা খেয়েছিলাম জিনিসটা নেহাত খাবাপ মনে হয় নি। ইয়া বড বড় মোটা চাপাটির বদলে টিন কেটে খাওয়ার বেশ একটা নূতনত্ব ছিল। বোজ তিন বেলাই টিনেব খানা। তোফা মজা। কাউকে জঙ্গলের লাকড়ী কুড়িয়ে চুলো জ্বালাতে হয় না। দুশমন আবার ধোঁয়া দেখলেই হানাদাবী প্লেন থেকে বোমা ঝেড়ে দেয়।

তোমার 'সি' ব্যাশন কেমন লাগছে রবিন—রবিনের মনমরা ভাব লক্ষ্য করে জো প্রশ্ন করল।

স্যার, এক এক বেলার খানা যে দুটো টিন দেওয়া হয তার দ্বিতীয়টা নেহাত মন্দ নয়। মাংস পেঁয়াজ, সব্‌জি মিশিয়ে যে 'পটাজ' দেয সেটা টকটকে লালরঙের রসে মাখান থাকে। সম্ভবত ওই বস্তুটি টম্যাটো সস হবে। কিন্তু সোয়াদটা তার আলুকাবলীর খাট্টা থেকে মাদ্রাজী রসম্ পর্যন্ত সবেরেই সঙ্গে মিলে যায়। তবে প্রথম টিনটাই মোক্ষম। তাতে কফি, না হয় কোকোর পাউডার থাকে; জলে ভিজিয়ে নিলেই হল। মিষ্টিমুখ করবার জন্যে গুনে-গেঁথে তিনখানা টফি বা লজেঞ্চুস। তাও সয়ে যাই। কিন্তু যখন ওই পাঁচ-পাঁচটা গোল বিস্কুটের চাকতি দেখি তখনি মায়ের হাতের তৈরী হালুয়ার কথা মনে পড়ে।

হালুয়া? পদার্থটা কি বটে? ব্যাপারটা রসাল হবে মনে করে জে গা ঝাড়া দিয়ে ভাল করে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল।

ওই আপনার র‍্যাশনের 'ডেন্টিস চিউইং-গামের' মত নয় মোটেই। হ্যাঁ, সাপ্লাই কোর আমাদের এক ঢিলে দু পাখী মারতে শেখাচ্ছে বটে। সকাল বেলার প্যা[illegible] চিউইং-গাম। [illegible] পেয়ে থাকে ,গাম

চিবিয়ে মুখের লালায় গলা ভেজাও দু-ঘণ্টা। যদি জাপানী হানায় টুথ-ব্রাশ হারিয়ে থাক তাহলে দাঁত মাজার কাজও ওতে হবে।

কেন? তোমার ডেণ্টোনা স্টীক ব্যবহার করলেই পার?—হেসে দু-পাটি দাঁত বের করে বলল উরায়ম সিং।

অর্থাৎ নিমের দাঁতন? যা জোয়ানদের ব্যবহারের জন্য এসেছিল?

হ্যাঁ। ঠিক তাই। হেসে বলল উরায়ম।

তারপর একটু কেশে আরো বলল,—জানেন স্যার, কলকাতায় সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে আমার এক 'কাজিন' আছে। সে বলে যে নিমের দাঁতনকে এই নতুন বিলিতী নামে চালু করার ফলে এটা জাতে উঠে গেছে। সুবিধে তাতে সবারই। কারণ সঙ্গে সঙ্গে এর দাম পয়সায় তিনটের জায়গায় দাঁড়িয়েছে দু আনায় একখানা। যে বেচছে আর যে কিনছে দুজনেরই বেশ মোটা লাভ। আর আমাদের জোয়ানরাও দেশী দাঁতনের বিলিতী নামটা সুখেই চিবোচ্ছে।

জো একটু ম্লান হাসি হাসল। ভাবল—দুনিয়াটাই চিড়িয়াখানা। আজব চিড়িয়াখানা। না হলে সে কত সুখে কত স্বপ্ন দিয়ে ঘর বাঁধবে বলে সব ঠিক হয়েছিল। বেচারী জয়-এরও ত এক মাসেরও তর সইছিল না। কি হবে বিয়ের পোশাক 'ট্রুসো' প্রভৃতি তৈরীর জন্য সময় নষ্ট করে? জীবনে পরম লগন করো না হেলা। করো না হেলা।

এ-হেন সময় হঠাৎ এল যুদ্ধ।

বিয়ে? হাঁ বিয়ে ত তখনো সে করে আসতে পারত। অনেকেই ত সৈন্যদলে নাম লেখাবার আগে বিয়ে সেরে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আবার বিলেত ছেড়ে বিদেশে আসার আগে এ-কথাও জেনে এসেছে যে বংশে বাতি দেবার জন্য একজন দুয়োরে হাজির হচ্ছে। অতএব নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে চলে যাও। স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য যে জাত যুঝছে সে জাত কখনো 'ওয়ার ব্রাইড' আর 'ওয়ার বেবী'দের কথা ভুলবে না।

কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য যে স্বামী বা প্রণয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাকে বধূই যদি ভুলে যায়?

তা যদি ভুলে যায়, তেমন লোকের স্মৃতিতে থেকেও কোন লাভ নেই। তাই জো বিদায়ের আগে বিয়ে সেরে নিতে রাজী হয়নি। বেচারী তরুণী জয়-কে খুব আদর করে সান্ত্বনা দিতে দিতে এককালে অক্সফোর্ডের ছাত্র আর বোট-রেসের 'ব্লু' অর্থাৎ দাঁড় টানাতে সেরা খেলোয়াড় জো ভারী গলায় বলেছিল,—আমি ত চলেছি অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু বিয়ে কবাটা নিশ্চিত ব্যাপার। এ দুটোতে মিল খাওয়াতে চেষ্টা করা ঠিক হবে না, জয়। তোমার বন্ধনহীন ভালবাসাই থাক আমার সব কষ্টে সব পরীক্ষায় 'আনব্রোকেন জয়', অবিরাম আনন্দ। তোমায় বিয়েতে বেঁধে রেখে গেলে অত আনন্দ ত পাব না।

ম্লানমুখে জয় বলেছিল, বন্ধনের কথা বলো না। বন্ধন ত হয়েই আছে।

কথাটাকে হাল্কা করে নেবার জন্য জো বলেছিল—এই এনগেজমেণ্ট রিঙটা এত পাতলা যে এটাকে বন্ধন বলে মনেই করো না। এটা রোজ তোমার নজরেও আসবে না।

বাঁধা-ধরার বাইরের বাঁধনের কথা জো সেদিন প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চয়েছিল। খেলোয়াড় সে। বাচ খেলায় জলের উপর দিয়ে তরতর করে ভসে যাওয়ার মত জীবনেব খেলাতেও সে অমন হেলায় ভেসেই যেতে পারবে না কেন? সে যে জাত ব্রিটিশ স্পোর্টসম্যান।

এদিকে ইংরেজরা মনে করে যে জার্মানরা অতি শয়তান। যাকে বলে কামর-বন্ধের নীচে ঘুষি মারতে ওস্তাদ। ফ্রণ্টে অর্থাৎ লড়াইয়ের সামনের এলাকায় যারা গিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে ওরা প্রায়ই জমাট রসিকতা করে রেডিয়োতে বলে,—বাঃ, তোমরা যে বড় ফ্রণ্টে এসে জান দিতে লেগেছ। ওদিকে তোমাদের ঘরে, তোমাদের শোবার ঘরে তোমাদের মিতা ক্যানেডিয়ান অস্ট্রেলিয়ান এরা যে জাঁকিয়ে বসে আছে সে খবর বুঝি পাও না?

জার্মান প্রচার-দপ্তরের কাজ এত পাকা যে ওরা মাঝে মাঝে আলগোছে কয়েকটা খুব আটপৌরে চালু ইংরেজ নাম আর তার ঠিকানা রেডিয়োতে ছাড়ে দেয়। হ্যাম্পস্টেড পাড়াতে হয়ত গোটা বিশেক জো স্মিথ আছে।

তাদের মধ্যে এক-আধজন কি আর ফ্রন্টে বসে তার স্ত্রী বা বাগ্‌দত্তা বধূর স্মৃতি মনে পুষে বন্দুক সাফ করছে না ?

অথচ সেই জো স্মিথের পক্ষের কয়েকজন লোক নিজের দেশে, নিজের সংসারে নিরাপদে নির্ভাবনায় বসে আছে। জো স্মিথের গায়ের রক্ত দিয়ে বাঁচান রাজ্যে বসে জোচ্চুরি করে ডেণ্টোনা স্টিক বলে নিমের দাঁতন চালিয়ে দু-পয়সা বাঁ হাতে করে পকেটেও তুলছে।

ক্যাপ্টেন যদি ভাবতে বসে তা হলে এই ঘোর জঙ্গলে চারদিকে দুশমনের হামলার বেড়াজালের মাঝখানে এই সেকশনগুলির অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে। চারদিকে জাপানী 'স্নাইপার'। আচমকা 'স্নাইপ' করে দেয়, হঠাৎ একটি বন্দুক বা রাইফেল বা গ্রিনেড যেন চোরা-গোপ্তার মত ছুটে আসে আর দু'একজন ঘায়েল হয়ে যায়। টহলদারদের নিজেদেরই চারদিকে জাপানী জাল গুটিয়ে আসছে। সে-কথা ওরা ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টারে রেডিয়োতে পর্যন্ত জানাতে পারেনি।

যেই রেডিয়ো খোলে, খবরের পাসওয়ার্ড সংকেতের কথাটি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী যন্ত্রে তাদের লুকিয়ে থাকার ঠাঁইয়ের হদিস ধরা পড়ে। জাপানীরা দেখতে না দেখতে দূর-পাল্লার কামান দাগতে আরম্ভ করে।

তাই কি করা ঠিক হবে তা বুঝে-সুঝে দেখবার জন্য সব ক'জন সেকশন কম্যাণ্ডার এখানে জড়ো হবার কথা। কিন্তু লেফটেনাণ্ট ও'শীয়া এখনো পৌঁছায় নি। এদিকে ক্যাপ্টেন ডুবেছে তার ভাবনায়। ঢুকে গেছে কচ্ছপের খোলার মধ্যে।

তাই উরায়ম সিং আবহাওয়াটা একটু সহজ করে আনার জন্য ওর গত রাতের একটা কাহিনী বলল।

জানেন স্যার, গেল রাতে কি ভীষণ ব্যাপার হল। আমার সেকশনে ত মোটে পাঁচজন জোয়ান বাকী আছে। আমায় তাই সিন্‌হার সেকশন থেকে আপনি থাপাকে ধার দিলেন। কাল শেষ রাতে যখন থাপার সিনট্রি-ডিউটি পড়ল তখন আমরা একটু নিশ্চিন্ত। গুর্খার মত এত সজাগ ও ধারালো পাহারাদার আর নেই। "কীন অ্যাজ ব্রিটিশ মাসটার্ড।" বিলিতী

রাইসর্ষের মত ঝাঁজে ভরা। এই জঙ্গলে দিনের বেলাই দশ হাতের বেশী দূরে কিছু দেখা যায় না। আর রাতের বেলা ত কথাই নেই। থাপা ইতি-উতি তার ফালি চোখ টান টান করে চেয়ে দেখে। কারণ শেষ রাতের দিকেই জাপুরা হানা দেয়। একরত্তি অস্বাভাবিক নড়াচড়া দেখলেই বুঝতে হবে দুশমন। যে আওয়াজের জন্য সে তৈরী হয়ে আছে সেটা হঠাৎ কানে এল। ঘন ঝোপে একটু মড়মড় শব্দ, হয়ত একটা চোরা পায়ের চাপ। থাপা উবু হয়ে ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরী হল। আঁধারে একটি আকৃতি যেন ফুটে উঠল। ব্যস, আর যায় কোথা? জয় শম্ভু বলে এক হাঁক দিয়েই সে সাপটিয়ে ধরল। একটা কাতর আওয়াজ; একটা ঝটাপটি। তারপরেই সে দিল সটকান। থাপা যখন দুশমন পালাল বলে শোক করছে তখন আমরা টর্চের আলো ফেলে দেখলাম যে মানুষের নয়, বাঘের থাবার ছাপ সেখানকার মাটিতে। থাপার ব্যাটল-ড্রেস থাবার আঁচড়ে ফালি ফালি করে ছেঁড়া।

দেবল আঁতকে উঠল। বলল,—থাপার কপাল খুব ভাল। বড্ড বেঁচে গেছে।

জো এতক্ষণে হেসে কুটি-কুটি। দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—আমি সে-সম্বন্ধে অতটা একমত নই। অবশ্য বেঁচে গেছে। কিন্তু সে থাপা নয়, বাঘ।

কিন্তু শীতই হোক আর বাঘই হোক, কেউ এক মাঘে পালায় না।

বাঘ কাছেই ছিল। একেবারে ওঁত পেতে।

হঠাৎ অনেক লালরঙের ট্রেসার বল বাঁশঝাড়গুলির মাঝখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উপরের দিকে ফাটতে শুরু করল। উপরে উঠে নেমে আসবার সময় এই হাউইগুলি চারদিক আলোয় আলো করে দিতে লাগল। সে এক আগুনমুখো প্রেতের নৃত্য। তার দাঁতের কিড়িমিড়িতে জো আর তার দলের সবারই লুকানো আস্তানা ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু এই হঠাৎ হামলাটা ওদের ওপর নয়। জো'র অধীন চতুর্থ সেকশনের উপর। ওরাও কাছাকাছিই ছিল বোঝা গেল। কারণ ওদের মর্টার-ব্যাটারী ফাট ফাট করে গজরাতে শুরু করল। হঠাৎ একটা দারুণ

আওয়াজ—ফাট্‌ ; তার পরেই গোলা বের হবার শব্দ ; একটুখানি বুকচাপা নীরবতা। তার পরই দড়াম করে গোলা ফেটে পড়ার আওয়াজ।

অনেক দূরে কয়েকটা পায়ের ভারী আওয়াজ হতে লাগল। এরা সবাই লম্বা হয়ে সটান শুয়ে চারদিক দেখছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দুশমন আসলে কোন্ জায়গায় আছে তার ঠিকমত হদিস না করেই এলোপাতাড়ি গুলী চালালে শুধু নিজেদেরই লুকানো আস্তানার খোঁজ ফাঁস করে দেওয়া হয়।

জো সকলকে হুকুম দিল গ্রিনেডের পিন খুলে তৈরী থাকতে। তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটু অপেক্ষা করে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল ঠিক তার পিছনে একটা বোমা ছুঁড়ল।

এক মুহূর্ত,....দুই....তিন...চার। সে জায়গাটা আলোয় আলোময় হয়ে গেল। মিলস্ বোমা আর গ্রিনেড ফাটতে শুরু করল।

ও-দিকে ততক্ষণে খণ্ডযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আবার সব চুপচাপ।

খানিক পরেই খুব চাপা শব্দে সাংকেতিক কথাটা শোনা গেল এরা সবাই নিশ্চিন্ত হল যে নিজেদের দলের লোকেরাই এবার আসছে।

তারা এল। কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। দলের কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট ও'শীয়া আসছে জংলী ডালপালা দিয়ে তৈরী ফিল্ড স্ট্রেচারে করে। তার ডান পা'টা থেঁতলিয়ে প্রায় আলাদা হয়ে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু আইরিশ রক্ত সহজে ঠাণ্ডা হয় না।

হালে প্রমোশন পাওয়া বি. ও. আর. (ব্রিটিশ আদার র‍্যাঙ্ক অর্থাৎ অফিসারের নীচের পদের সিপাই) ও'শীয়ার বয়স অল্প, কিন্তু সইবার ক্ষমতা বেশী। এত যে ভারী লড়াই, এতখানি জখম, তার জন্য সে চিন্তিত নয়। আইরিশ চোখ নাকি সর্বদাই হাসি-হাসি থাকে। যেদিকটা কালো, যে দিকে দুঃখ-বেদনা—সেদিকে নজর দেয় না। আলোর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

জো ছুটে এল ও'শীয়ার কাছে। ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট সঙ্গে নেই, কিন্তু ফার্স্ট-এইড ত আছে। সে সব কাজ সারবার পরে জো খুব দরদ ভরা গলায় শুধাল,—তোমার পায়ের বেদনাটা কি এখন একটু কমেছে?

ও'শীয়া কোন রকমে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়িয়ে বলল,—মরীন খুব

ভাল মেয়ে। খুব সুন্দর, অ্যাণ্ড অল দ্যাট (এবং আরো কত কি)। কিন্তু স্যার, আমিই তার প্রথম পুরুষ-বন্ধু। অন্য কোন ছোকরার সঙ্গেই সে ঘোরাফেরা করবে না। আমার মাও চিঠিতে জানিয়েছে যে আমি এই দূর বিদেশে লড়াইয়ে এসেছি বলে মরীন কারো সঙ্গেই বেরোচ্ছে না। এমন কি পয়সাওলা আমেরিকানদের সঙ্গে পর্যন্ত না।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল,—কিন্তু এই পা'টা যদি আমার দেহ থেকে এখন কেটে বাদ দিতে হয় তা হলে কি আর ওর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত হবে? একটা পা নেই। এক যুগ পরেও ছেলেছোকরারা সহানুভূতি দেখাবে। শুধু মরীনকে তার একটি কথার জোরে সারাটা জীবন বেঁধে রাখব? ও বেচারার একটা ভাল ঘর-সংসার হওয়া উচিত। কিন্তু আমার পা'টা যদি খোয়া যায়?

হায়! ক্ষতস্থানে এনাস্থেটিক দিয়ে বেদনা-বোধ চেপে রাখা যায়। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষতের জায়গায় ইনজেকশান দেবে কোন্ এনাস্থেটিক, লাগাবে কোন্ ঘুম-পাড়ানী ওষুধ।

একটু চুপ করে থেকে ও'শীয়া আবার বলল,—তার চেয়ে ওকে চিঠি লিখে দিই। এখনি সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। আপনি কি বলেন, স্যার?

জো ছাড়া ওর নিজের দেশের, নিজের জাতের লোক এই মালয়ের জঙ্গলে আর যে নেই কেউ।

দেবল, রবীন, উরায়ম চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে টইলদারেরা আরো বেশী হুঁশিয়ার হয়ে পাহারা দিচ্ছে। কে জানে জাপানীরা আবার ট্রেসার বল ছুটিয়ে ওদের খুঁজতে শুরু করবে। হয়ত বা এরোপ্লেন পাঠিয়ে সবটা জঙ্গল বোমায় তছনছ করে দেবে। শুধু দেবল দেখল যে তার মণিবন্ধে বাঁধা হাতঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

একটু হাসবার চেষ্টা করে জো বলল,—এত ভাবছ কেন, ও'শীয়া? তোমাকে আমরা এখন ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখান থেকে কুয়ালালামপুরে। জান ত, মালয়ের রাজধানী। রুপোর মত চক্‌চকে টিন আর রবার দেশটাকে রুপোয় মুড়ে দিয়েছে। সেখানকার মিলিটারী

হাসপাতালে নার্সগুলির সবারই সোনালী চুল। তোফা আরামসে তুমি স্প্রিং দেওয়া খাটে শুয়ে থাকবে আর সোনালী নার্সদের নরম হাতের সেবায় চট্ করে সেরে উঠবে।

চক্‌চক্ করে উঠল আইরিশ চোখ।

কিন্তু তার গলা যেন সে চোখের জল-জমানো বরফে ঠাসা। বলল,—আমারও মনে হয় আমি সেরে উঠব।

ঘণ্টাখানেক সবাই চুপ করে বসে রইল। করবেই বা কি?

—এখন তোমার কেমন লাগছে ও'শীয়া?

জো'র এই প্রশ্নে বেচারী এবার ভেঙে পড়ল। বলল, আমি জানি না। সবটাই যেন কেমন অদ্ভুত। কখনো ভাবিনি আমায় অঙ্গহীন হয়ে যেতে হবে। আবার মনে হচ্ছে যেন সারা জীবনই আমি এমন ছিলাম। ইন্‌জেকশান-দেওয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা'টা যেন আমার কোনদিনও ছিল না। মরীন, মরীন এক-পেয়ে আমাকেই যেন সর্বদা দেখে এসেছে। এই ডালপালা দিয়ে তৈরী স্ট্রেচারেই আমি শুয়েছি, ঘুমিয়েছি—আমার দেশে।

একটু থেমে আবার বলল,—আচ্ছা আমাদের চিঠিপত্র সব বোধ হয় ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টার্সেই এসে জমা হয়ে আছে। অনেক দিন আমরা ছিটকে পড়ে আলাদা হয়ে রয়েছি। আর. এ. এফ.-এর মধ্যে নিশ্চয়ই চিঠি এরোপ্লেনে করে এয়ার ড্রপ করে গিয়েছে। ওর একটি চিঠি পেলে কেমন ভাল হত।

জো কোন রকমে বলল—নিশ্চয়ই চিঠি এসে গেছে। আমরা ব্রিগেডের ঘাঁটিতে পৌঁছে গেলেই চিঠি পাব।

আচ্ছা, ওকে ত ওয়ার অফিস থেকে জানান হবে না যে আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যেতে পারে? ওরা ত শুধু মরে গেলেই খবরটা পাঠিয়ে দেয়, তাই, না?……ভাবছি, আমার একটা পা গেছে জানলে ও কি ভাববে। চাষী হিসাবে ত আমার কোন দামই আর থাকবে না।

তুমি মিছেমিছি কু-ডাক ডাকছ, ও'শীয়া। তোমার পা একেবারেই ঠিক ভাবে সেরে যাবে। যদি না-ও যায়, আজকাল ডাক্তাররা এমন চমৎকার ভাবে পা লাগিয়ে দেয়, যে অন্য লোকে টেরও পায় না।

এ-কথা সহ্য করতে পারল না ও'শীয়া। এই প্রথম সে ধৈর্য হারাল। এই প্রথম চটে উঠল। এত বড় জখম, এত রক্তপাতে যা হয় নি। বলল—কিন্তু ও-ও কি টের পাবে না, বলতে চান? ওকেও কি ঠকাব? আমার নিজের ঘরের লোক যে হতে যাবে তাকেও?

বলতে বলতে এইটুকু রাগ দেখানর জন্য তার নিজেরই লজ্জা হল। জো'র হাত ধরে বলল—সরি ক্যাপ্টেন, কিন্তু ভেবে দেখ যদি কাঠের পা লাগিয়ে দেয় তা হলে ত কাদা মাটি ঠেলে চাষ করতে পারব না। নিজেই-বা খাব কি?

দেবল তার বন্ধ-হয়ে-যাওয়া হাতঘড়িটা আবার চালাবার জন্যই যেন মনোযোগ দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সবাই অন্যদিকে মনোযোগ দিয়ে রেখেছে। যেন কিছুই হয় নি। জো তার ঠোঁটটা প্রাণপণে দাঁত দিয়ে চেপে রাখল।

ঠিক অমন ভাবেই প্রাণপণে ঠোঁট চেপে বসে ছিলেন তখন ব্রিগেডিয়ার সাহেব। তাঁর হাতে সেন্সার অফিস থেকে পাঠান একখানা খোলা চিঠি। জো'র চিঠি। জয় লিখেছে।

আমার প্রিয় জো,

আজ শেষ রাতে জেরী'রা* ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন পাঠিয়েছিল। [redacted] আমাদের বাড়ীর মাটির নীচের তলার অর্ধেকটা এবাব উড়ে গেছে। অ্যাক অ্যাক (অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট) কামানের পাল্লা ছাড়িয়ে, আকাশে ভর্তি বেলুন-ব্যারাজের জাল এড়িয়ে কেমন করে যে লুফ্‌টবাফা (জার্মান বিমান-বাহিনী) এই অঞ্চলটাতে শেষ রাতে হানা দিয়ে গেল তা ওরাই জানে। কিন্তু তুমি কিছু ভেবো না। আমি ভালই আছি আর বেশ ঠিকমতই কাজ করে যাচ্ছি। 'ব্যাটল ফর ব্রিটেনে' আমরা নিশ্চয়ই জিতব।

তোমার শেষ চিঠিতে সিন্‌হা বলে যে ভারতীয় অফিসারটির কথা লিখেছ তাতে বেশ মজা পেলাম। তোমার আগের চিঠিতেই বুঝেছিলাম যে সে হচ্ছে একটি 'ফানি বয়'। মন তার কাঁচা। আর তাকে নাচানও যায়। যদি অবশ্য নাচিয়ে তুমি কোন মজা পাও। সে যে তার রিস্টওয়াচের দিকে প্রায়ই আড়চোখে তাকায় তা জেনেই আমি বুঝেছিলাম যে ওর পিছনে কোন রহস্য আছে। আর যে সোজাসুজি না তাকিয়ে আড়চোখে তাকায় সে ওই চোরা চাহনির গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে। কাজেই তুমি ভেতরের কথাটা যে শীগ্‌গির জানতে পারবে তা আমি আন্দাজ করছি।

বেচারা বড় গোবেচারা। নিজের দেশে সুইটহার্টকে রেখে একা যুদ্ধে বিদেশে চলে যাওয়া নিশ্চয়ই খুব শক্ত। যে যায় আর যে পিছনে থেকে যায় দুজনেই সেটা বোঝে। তবু কি জান? যে এগিয়ে যায় তার কষ্ট কম, চিন্তা কম। লড়াই ত একটা নেশা। নিজের দেশকে বাঁচাচ্ছি, নিজের প্রিয় পরিজনের জন্য যুদ্ধ করছি সেটা খুব বড় সান্ত্বনা। নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে হয় নিজের জন্য, রেজিমেণ্টের জন্য, দুশমনের জন্য। তোমাদের

---

* জেরী, বশ, হুন এসব নামে জার্মানদের ইংরেজিতে যুদ্ধের সময় ডাকা হত।

[redacted] এগুলি সামরিক সেন্সারের মুছে দেওয়ার চিহ্ন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেক চিঠি সেন্সার হয়।

সিন্‌হা তাই শুধু ঘড়ির দিকে তাকিয়েই শান্তি পাচ্ছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা অলস বিলাস। তার বেশী কিছু নয়। অবশ্য তোমার পক্ষে ভাবনা আরো অনেকখানি। সে সব কথা লিখলে এই চিঠি সেন্সারের হাত দিয়ে তোমার কাছে আর পৌঁছাবে না।

আজ আমি তোমায় একটা বিশেষ খবর দেব। তুমি বোধ হয় বলবে যে আগে কেন দিইনি।

কিন্তু সে প্রশ্ন এখন করার কোন মানে নেই। তার আগে তোমাদের সিন্‌হার হাত-ঘড়ির ডালার নীচে রাখা ছবির অধিকারিণীর সঙ্গে আমার অবস্থার একটা তুলনা করে দেখো। শুধু আমার কেন, আমাদের দেশের হাজার হাজার মেয়ের।

রাতে ঘুম হচ্ছিল না দুটো ভয়ে। তুমি গেছ 'সিয়াকে'। মালয়ে জাপানীরা ঝড়ের মত এগোচ্ছে আর আমাদের সৈন্যরা প্রায় বিনা যুদ্ধেই বন্দী হয়ে ওদের হাতে পড়ছে। সে খবর রোজ রেডিয়োতে দিচ্ছে। আজ তুমি না জানি কোথায়। তোমার ঠিকানা ত হচ্ছে জায়গার নামধাম ছাড়া শুধু একটা ব্রিগেডের নম্বর।

কিন্তু সে কথা আমায় ভাবতে কি দেবে ওই 'জেরী'র হাওয়াই হামলা? তুমি কোথায় সেটুকু চিন্তা করাও একটা বিলাস। পিলে-চমকান সাইরেন বাজছে অনেকক্ষণ ধরে। সার্চলাইটগুলি আকাশের বুকে ছোরা চালাচ্ছে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে মাথার উপর বাড়ীঘর। প্রথম বোমার ঘায়েই ত দোতালাটা যেন উলটিয়ে পড়ে গেল।

তার পর একটার পর একটা ঢেউয়ের মত আসতে লাগল ওদের দূরপাল্লার প্লেন। আমাদের একতালাটাও চুর-চুর হয়ে গেল। [redacted] অস্ত্র বানাবার কারখানা এত কাছে থাকার জন্যই এতখানি চোট এই পাড়াটার উপর। আমাদের ড্রয়িং-রুমের ম্যাণ্টল-পীস থেকে ছিটকিয়ে তোমার ছবিটি ভাঙা মেঝের ফাঁক দিয়ে নীচে আমারই কাছে উড়ে এল। কিন্তু তার ফ্রেমের কাঁচটা চুরমার হয়ে ছবিটাকে একেবারে জখম করে দিয়েছে।

রান্না করার ছোট টেবিলটার তলায় হামাগুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে ছিলাম।

হাত বাড়িয়ে কোন রকমে ছবিটাকে টেনে এনে এপ্রনে (কোমরে বাঁধা ফিটফাট গামছাতে) জড়িয়ে রাখলাম। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে!

এক একটা বোমা বাতাসের বুক চিরে নীচে নেমে আসছে আর মনে হচ্ছে যেন মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে কোন রকমে মাথা গুঁজে ছিলাম। একা, ভীষণ একা। জীবনে কখনো এত বিপদে এত একা কেউ থাকে কি? চোখ হঠাৎ মেলে দেখলাম মিস্টার মে টলতে টলতে আধভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে নেমে আসছেন। কিন্তু আর একটা বোমার ধাক্কায় সিঁড়িটা চিড় খেয়ে ফাঁক হয়ে গেল আর মিঃ মে কোন রকমে লাফিয়ে মেঝেতে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

মিস্টার মে'র কথা তোমায় আগে লেখা হয়নি। সময়ও ছিল না। [redacted] থেকে ওকে আনানো হয়েছে নতুন রকমের [redacted] বানাবার জন্য। আমাদেরই [redacted] কারখানাতে উনি [redacted] নিয়ে গবেষণা করছেন। রোজ সন্ধ্যায় ব্ল্যাকআউট হয়ে যাবার পর আমবা একসঙ্গে পথ হাতড়িয়ে কারখানা থেকে বাড়ী ফিরি। একই বাড়ীতে আমরা থাকি।

জান ত গত ক'মাস থেকে আমায় এই কারখানাতে কাজ করার জন্য নিজেদের বাড়ী থেকে চলে আসতে হয়েছে। মার জন্য মন খুব কেমন করে। কিন্তু মাকে আর আমাকে আলাদা শহরে আলাদা ধরনের কাজ করতে হচ্ছে।

বোমার হামলার আর একটা ঢেউ শুরু হল। এবার আরো সাংঘাতিক। বোধ হয় আমাদেরই 'অ্যাক অ্যাক' কামানের গোলা আমাদের চারদিকে দুমদাম করে পড়তে লাগল। একটা বোমা ফাটার ঝড়ে মাথার উপর থেকে রান্নাঘরের টেবিলটা স্রেফ উড়ে গেল। মাথার উপর শুধু অন্ধকার। শুধু অন্ধকার আকাশ। সে অন্ধকার ফুঁড়ে বাজ-পড়ার মত বোমা ফাটছে, বিদ্যুৎ চমকানোর মত বারুদ ফুটছে আর—উঃ, আর লিখতেও পারছি না।

আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। মাথায় একটা বোমা ফাটার ধাক্কা লেগেছিল সম্ভবত। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি যে মে আমায় জড়িয়ে ধরে হাওয়াই হামলা থেকে বাঁচাবার জন্য যে খাদ ছিল সেই খাদে শুইয়ে রেখে নিজের গা দিয়ে আমায় ঢেকে রেখেছে।

ওঃ, একটা জীয়ন্ত মানুষের গরম ছোঁয়া! সে যে কি শান্তি, কি ভরসা তা তোমরা যারা পুরুষমানুষ, যারা মানুষ মারতে পার, মারতে বাধ্য হও দেশের মুখ চেয়ে, সেই তোমরা বুঝতে পারবে না।

তার পর সাতদিন আমায় ইনফার্মারিতে (দুর্বল লোককে সারিয়ে তোলার বাড়ীতে) রেখেছিল। চারদিকে আমার মত বোমার হামলায় দুর্বল মেয়েরা সারি দিয়ে শুয়ে আছে। প্রত্যেকেরই আত্মীয়-স্বজন বা পুরুষ-বন্ধু কেউ না কেউ দেখা করতে আসে। এক টুকরো ফল, একটু দুধ বা চকোলেট নিজের র‍্যাশন থেকে কোনমতে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়। ফুল তো আর পাওয়াই যায় না। সব ফুলের বাগানেই আজকাল আলু বা অন্য কোন সব্জির চাষ হচ্ছে।

রাতের পর রাত বোমার অত্যাচারের সময়ও কখনো এত একা লাগে নি। চারদিকে সবারই চেনা বা আপন জন দেখে দেখে নিজেকে এত একা লাগতে লাগল। সেই সেদিন এ. আর. পি. ট্রেঞ্চে প্রথম অনুভব করলাম বিপদের মধ্যে একজনের বাহুর বাঁধনের উত্তাপে কতখানি ভরসা কতখানি সাহস পাওয়া যায়।

হায়, একটুখানি সোনা দিয়ে গড়া একরত্তি আংটি কি কোন জীবন্ত মানুষের উত্তাপ এনে দিতে পারে? দিতে পারে সঙ্গ? কইতে পারে কথা কানে কানে? টেনে নিয়ে আসতে পারে বিপদের মুখ থেকে?

সে না থাকলে আমি ইনফার্মারি থেকে সুস্থ স্নায়ু নিয়ে ফিরে আসতে পারতাম না। আবার সে আছে বলেই তোমাকে এ চিঠি আজ লিখতে হচ্ছে। আমার অবস্থা সমস্তটা বিবেচনা করে তুমি আমায় ক্ষমা করো।

তোমাদের ওই সিন্‌হার বান্ধবীর জীবনে এমন একটা অঘটন ঘটবে না নিশ্চয়ই। নিজের বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনের মাঝখানে সে আছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিরাপদে সে তার বীরের স্বপ্ন দেখবে। তার কথা ভেবে বেশী উৎসাহে পশমের মোজা বুনবে। নিশ্চিন্ত মনে র‍্যাশন-কার্ড ছাড়াই বাজার থেকে খুঁজে খুঁজে জিনিস কিনবে। শৌখীন কাগজে প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি লিখবে। ইণ্ডিয়াতে ব্লাকআউট যদি বা চালু হয়ে থাকে, চাঁদ আর তারার আলো নাকি সে দেশে যথেষ্ট আলো ছড়ায় শুক্লপক্ষের রাতগুলিতে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি খুব কষ্ট পাবে এ চিঠি পড়তে পড়তে। আমি এ-ও জানি যে জখম হওয়া, অঙ্গহীন হওয়া, এমন কি মরে যাওয়া—এ সবই যুদ্ধ করতে গেলে মানুষের ভাগ্যে থাকে। কিন্তু নিজের মনের দিক থেকে দুঃখ পাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে না। দেহে আহত হওয়ার চেয়ে মনে আঘাত পাওয়া অনেক বেশী দুঃখের।

জানি যে চারদিকে যখন গোলা চলতে থাকে তখন তুমি ঘাবড়াও না। কিন্তু একা নিরালায় যখন ঘুমোতে যাও তখন তুমি অশান্তি পাও। গরম ট্রপিক্যাল দেশে তোমার খাটিয়ার চারদিকে কাদা, নোংরা, জোঁক আর কেরোসিনের কুপীর আলো। সে সবের মাঝখানে যখন তোমার শরীর আর চলে না, চোখ জড়িয়ে আসে কেবল তখনি তুমি ঘুমাতে যাও।

তুমি লিখেছিলে যে তবু তোমার ঘুম ভেঙে যায় - জাপানী "জিরো" ফাইটার প্লেনের আওয়াজে নয়—দেশে ফিরে এসেছ এই স্বপ্ন দেখে। তারপর ঠাণ্ডা ঘামে তোমার সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করে আর তা সত্ত্বেও জেগে জেগে তুমি স্বপ্ন দেখ যে ডোভার কি প্লিমাথ বন্দরে জাহাজ থেকে তুমি নামছ। ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে প্রাণপণে হাত নাড়ছি তোমার নজরে পড়বার জন্যে।

তুমি লিখেছিলে যে ঘামে তখন তোমার সারা দেহ হিম হয়ে যায়। মরণের ভয়ে নয়। মরে গেলে যে আর আমার কাছে ফিরতে পারবে না সেই ভয়ে। আর আমার সঙ্গে বাহুতে বাহু মিলিয়ে অক্সফোর্ডের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ডাকতে পারবে না। কর্নওয়ালের সমুদ্রপারে জেটিতে হাওয়া খেতে খেতে স্লট-মেশিনে এক পেনি ঢুকিয়ে কপালের গুণে এক পাউণ্ড ফেরত পাবার জুয়ো খেলবে না। সবুজ মাঠের উপর সাদা বেঞ্চিতে বসে ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে আমার কানে কানে কইতে পারবে না দুয়েকটা ফিসফাস কথা।

তোমার শেষ চিঠিটা আমি বার বার করে পড়েছি। তোমার চারদিকে অনেক তরুণ, অনেক যুবক শুধু কোন রকমে শত্রু মারবার চেষ্টা করতে করতে নিজেরা মরছে। প্রত্যেক দিন তারা মরছে। প্রত্যেক দিন শত শত আশা আর স্বপ্নকে চুরমার করে দিচ্ছে সীসার গুলী, লোহার গোলা। আর এদিকে বি. বি. সি. থেকে সে সময় আকাশ ফাটিয়ে অকেজো লোকের

দল গলায় গিটকিরি দিয়ে গাইছে "ওই কোণাতে উঠেছে রামধনু" বা "হাম্পটি ডাম্পটি হার্ট" বা "বেবি মাইন (প্রেয়সী আমার)"।

তুমি খুব চটে-মটে লিখেছিলে যে—কই? রামধনু উঠল কার আকাশে? দিশেহারা দুর্দশার মধ্যে আমাদের কলিজাখানা যে কেমনভাবে খাঁচার মধ্যে ছটফট করছে তার খবর কে রাখে? "বেবি মাইন" হয়ত কোন "এলাই" (মিত্রপক্ষের) সৈন্যের বাহুর বন্ধনে সান্ত্বনা পাচ্ছে। তুমি রেগে লিখেছিলে যে যারা গলায় টাই বেঁধে চক্‌চকে বোলার হ্যাটে মাথা ঢেকে মটর থেকে নেমে আমাদের লড়ে মরবার জন্য গরম-গরম বক্তৃতা দেয় তাদের বীরত্ব ওই বক্তৃতা পর্যন্তই। বাকী সব কথা সেন্সারে কেটে দিয়েছিল। কিন্তু মানে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি।

তুমি তখন জানতে না যে তার পরের চিঠিখানাতেই আমি এ সব কথা লিখব। কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি বীর। বোলার হ্যাট পরা ক্যানেডিয়ান যে তোমার তুলনায় বীরত্বে কিছুই নয়। সে ত তোমার মত মরণ খুব নিশ্চিত জেনে ফ্রন্টে যায় নি। তাকে হয়ত তার বিজ্ঞানের বিদ্যার দৌলতে কোনদিন 'এনলিস্ট' করতে (সৈন্যদলে নাম লেখাতে) হবে না। তার উপর সে আমায় বিয়ে করলেই তার দেশ ক্যানাডায় আমায় আগেভাগে পাঠিয়ে দিতে পারবে। সেখানে জেরীর হামলা নেই, নেই দেশ আক্রমণের ভয়, র‍্যাশনের জন্য কিউ। নেই রাতে বুক ধুক-ধুক-ক'রে অন্ধকারে পথ হাতড়ানো।

আমাকে তুমি বাঁচতে দাও। তুমি নিজে বেঁচে ফিরো এসো। ভগবান জানেন তার চেয়ে বেশী আনন্দ আমি আর কিছুতে পাব না।

তোমায় খুব কষ্ট দিচ্ছি আমি। যে দেশের জন্য, রাজার জন্য যুদ্ধ করতে গেছে তাকে এরকম কষ্ট দেওয়া পাপ। কিন্তু তাকে ঠকানো আরো পাপ। তাকে যদি বিনা সন্দেহে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমার স্বপ্ন দেখতে দিতাম আর ততদিনে সেই আমি হয় পাগল না হয় অন্যের হয়ে যেতাম, তা হলে আরও পাপ হত। তাই এখনি তোমায় সব জানালাম।

তুমি বেঁচে সুস্থভাবে ফিরে এসো। কিন্তু আমাকেও বাঁচতে দাও।

তোমার আঙটি আমি খুলে রেখেছি। তোমার চিঠি পেলেই সে আঙটি তোমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

শেষবারের মত তোমার জয়

* * *

কিন্তু চিঠি নিয়ে মন ভাবী করবার সময় কোথায়? প্রেম? সে ত শুধু অলস বিলাস। দেশ? সে ত শুধু পলিটিশিয়ানের বাঁধা বুলি! বেঁচে থাকা, শুধু বেঁচে থাকাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। সবচেয়ে বড় কথা।

জয়, তুমি ঠিকই লিখেছ।

এটুকু জয়কে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু উপায় নেই। একটা প্লেনে করে কিছু 'সি' র‍্যাশন আর ডাক প্যারাসুট দিয়ে ফেলে গিয়েছিল এই জঙ্গলে। কিন্তু নিজেরা ব্রিগেড় হেড-কোয়াটার্সে না ফিরে যেতে পারা পর্যন্ত চিঠি লেখা সম্ভব নয়। সেখানে ফিরতে পারবে কিনা তারও ত কোন ঠিক নেই।

কিন্তু জয় এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। জয়ের চিঠিতে দেবলের কথা লেখা আছে, দেবলের বান্ধবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেইজন্যই দেবলকে আজ আরো বেশী কাছে, বেশী আপনার জন মনে হচ্ছে। তবু দেবলও এখন বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এই শিখ জোয়ান, যাকে আজ ভোরে পেট্রলরা জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

জো তাকে জিজ্ঞাসা করল,—যখন তুমি অন্ধকারে জখম হলে, কেন সাহায্যের জন্য চেঁচালে না? তা হলে ত তোমায় আমরা তুলে আনতে পারতাম।

ব্রাণ্ডিতে একটু গলা ভেজাবার পর জোয়ান খুব নীচু গলায় বলল,—না স্যার, আমি চেঁচালে আমার বন্ধুরাই আমাকে তুলে নিয়ে যেতে ছুটে আসত। তখন জাপানী গুলী তাদের মারত। অন্তত তাদের লুকানো জায়গাটা জানাজানি হয়ে যেত। তাই চুপ করে সারা রাত শুয়ে রইলাম। ভোরে ভাঙা হাঁটু দুটো নিয়ে গড়াতে গড়াতে আরো বেশী জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

শত্রু তা হলে হয়ত দেখতে পাবে না। আর আমাদের দলের লোক যদি খুঁজে বের করতে না পারে তা হলে আস্তে আস্তে মরে যাব।

জো তাড়াতাড়ি তার পচে-ওঠা জখম জায়গাটা পরিষ্কার করবার বন্দোবস্ত করল। কিন্তু তার এখন আব ধৈর্য রইল না। সে চেঁচাতে লাগল,—শীগ্‌গির আমায় গোস্ত রুটি বা যা হোক কিছু খেতে দাও। আমি খিদেয় মবে যাচ্ছি।

তাকে খেতে দেওয়া হল। হাঁটু দুটো ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হল। দেওয়া হল আবো ব্রাণ্ডি। কিন্তু এতক্ষণ উপোসী থাকাব পব এতটা ব্রাণ্ডি বোধ হয় সেপটিক ঘায়েব জ্বরেব ধাড়সে সহ্য হল না। বে বিড়বিড় কবে বকতে লাগল।

আমি লড়াই ফেবত সিপাই, মেমসাহের। লড়াই ফেরত সিপাই। আমার বুকে মিলিটাবী ক্রসের রিবন দেখে লাহোবে ফ্যালেট্টি হোটেলের ম্যানেজার দারোয়ানেব কাজ দিয়েছে। মনে করেছে আমার প্রতি কর্তব্য ওতেই শেষ হয়ে গেছে। সেলাম মেমসাহেব। বকশিশ মেমসাহেব। ট্যাক্সি এই যে সামনে হাজির মেমসাহেব। সেলাম।

একটুখানি তন্দ্রার মত আচ্ছন্ন থেকে সে আবাব শুরু করল—সিমলার জঙ্গী দপ্তর তার পাঠিয়েছে গুজরানওয়ালাতে। আমার বাবা গাঁয়ের চৌধুরীকে কাঁপতে কাঁপতে বলছে—দেখ ত কি লেখা আছে? তার এল কেন?…জঙ্গী দপ্তর লিখেছে- তারা ভয়ানক আপসোস করে জানাচ্ছে যে তোমার ছেলে…।

জীবন নিয়ে খেলা চলছে। মরণ নিয়ে কারবার। এর মধ্যে জয়ের চিঠির ঠাঁই কোথায়? জো নিজের মনকে শক্ত করে নিল। ভবিষ্যতে একদিন মানুষকে আর লড়তে হবে না! রবট অর্থাৎ কলের মানুষই লড়ে যাবে। জো আজ সেই রবটেরই একটা আগাম নমুনা। চিঠিটা ব্যাটল-ড্রেসের হাঁটুর পকেটে গুঁজে রাখল।

তারপর ঠিক কি হল জো তা জানে না। এখনো জানে না। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দল ছেড়ে সে অনেকটা দূরে ছিটকিয়ে পড়ল। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন সময় নিজের দল থেকে দূরে থাকা খুব

বিপদের কথা। পকেট থেকে কম্পাস বের করে কোন্ দিক যাবে তা খুঁজে বেড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ আঁতকিয়ে উঠল।

একটা লম্বা গাছের গুঁড়িতে প্রকাণ্ড একটা গর্ত। তার চার পাশে আগাছা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেওয়ার সুন্দর একটা বন্দোবস্ত। যাকে ইংরেজীতে বলে "ফক্স হোল" অর্থাৎ শিয়ালের গর্ত। জাপানীরা "ও. পি." অর্থাৎ অবজার্ভেশন পোস্ট বানিয়েছে। শত্রুর গতিবিধি নজর করবার জন্য।

অতএব আর উদ্ধারের আশা নেই।

নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে চোখে ফিল্ড-গ্লাস লাগিয়ে জো দেখল দূরে জন ছয় জাপানী টহলদার এগিয়ে আসছে। মাঝখানে মাত্র শ' তিন গজ জংলা জমি আর ধানক্ষেত। জো প্রাণপণে ছুটতে লাগল। জঙ্গলের কিনারা ধরে গাছের পর গাছের আড়ালে ছুটতে লাগল। শেষে জঙ্গলে আর কুলাল না, তাই খোলা ধানক্ষেতে নেমে পড়তে হল। এদিকে জাপানীরা চেঁচাতে শুরু করেছে 'বানজাই' জয়, জয়।

জো বুঝতেই পারল না কেন জাপানীরা এখনো গুলী ছুঁড়তে শুরু করেনি। দৌড়ে বেঁটে-খাটো শত্রুর দল লম্বা জো'র সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু গুলী ত করতে পারে? জোর হাতে মাত্র একটা টমিগান। তাই দিয়ে ছ'জনা দুশমনকে ত আর রুখতে পারবে না। নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু ওই 'বানজাই' করে স্ফূর্তিতে চেঁচানো ওদের কাল হল। জো'র দলের কিছু টহলদার একটা নালার মধ্যে লুকিয়ে শুয়ে ছিল। এই আওয়াজে ওদের মাথার টুপীর ওপরের হলদে গোল গোল ফুলগুলি একটু দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার নীচে নেমে গেল। জো'র নজর এড়ায়নি কিছুই। কারণ সে দৌড়াচ্ছে প্রাণভয়ে। আর জাপানীরা দেখেনি কিছুই। তারা যে দৌড়াচ্ছে ছ'জনে মিলে একটা মুফৎ শিকারের মোকা পেয়ে।

নির্ঘাত মরণের হাত থেকে বাঁচার পথ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জো'র মাথায় একটি বুদ্ধি গজাল। সে যদি এখন সোজা নিজের দলের লোকদের দিকে দৌড়ায় তা হলে এক ঢিলে দুটো পাখী মারা যায়। এক নম্বর—তারা

চাঁদমারীতে ষাঁড়ের চোখ (বুলস্ আই) তাক করে গুলী ছোঁড়া অভ্যাস করতে একটা সুযোগ পাবে। তার চেয়ে বড় কথা—সেই সঙ্গে নিজের গর্দানটা বাঁচবে। অতএব জো সোজা নালার দিকে ছুটতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ জো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দলের লোকদের বন্দুকের নলগুলি দেখা যাচ্ছে। যে গুলী দুশমন ঘায়েলের জন্য ছুটবে তা যে জো'র গায়েও ছিটকে এসে পড়তে পারে সে কথা তার এতক্ষণে মনে হল। এই যুদ্ধে শত্রুর নজরকে ধোঁকা দেবার জন্য পোশাকগুলো করা হয়েছে মেটে সবুজ জলপাই রঙের। তাতে যে কত অসুবিধাও হতে পারে তাও জো বুঝতে পারল।

তাই শুয়ে পড়েও ভাবনা। জাপানীরা যদি ওকে আর দেখতে না পেয়ে সামনে এগোবার বদলে পেছিয়ে যায়। এত বড় একটা মোকা হাতছাড়া হয়ে যাবে ? তার চেয়ে নিজেকে একটু বিপদের মুখে তুলে ধরে আবার দাঁড়াবে নাকি ?

কিন্তু তার দরকার হল না। যারা সূর্য থেকে নেমে আসা সম্রাটের জন্য লড়ছে তারা একটাও সাদা শত্রুকে পালিয়ে ফিরে যেতে দেবে না। তারা আরো বেশী সামনে এগিয়ে এল।

অমনি শুরু হল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী-বৃষ্টি। শুধু ব্রেন-গানের গুলী নয়। একগাদা বোমাও আকাশের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ল জাপানীদের উপর। মাত্র সাত সেকেণ্ডের 'ফিউজ' তার লাগানো সেগুলিতে। তিনজন জাপানী সাত সেকেণ্ড পরে বোমা ফাটছে দেখে বুদ্ধি করে পরের বোমাগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে সেগুলি তুলে নিল। মতলব ছিল সাত সেকেণ্ডের মধ্যেই সেগুলি ইংরেজ দলের উপরেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু সে সময়টুকুও তারা পেল না। নিজেদের হাতেই এই দ্বিতীয় কিস্তির বোমাগুলি ফেটে পড়ল। আগে থেকেই মতলব মাফিক এগুলোতে তিন সেকেণ্ডের ফিউজ তার লাগান ছিল, সাত সেকেণ্ডের নয়।

এর পরে নালা থেকে উঠে জোয়ানরা সব শত্রুই পুরোপুরি মরেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তারপর তাদের পকেট থেকে সব কাগজপত্র আর ম্যাপ বের করে আনল ; ইউনিফর্ম থেকে খুলে নিতে লাগল অস্ত্র-শস্ত্র,

নানারকম স্মৃতি-চিহ্ন। একজন সেকেণ্ড লেফটেনাণ্টের দেহ থেকে খুলে নেওয়া হল তার তরোয়াল।

ওদের সঙ্গে এই একজন মাত্র অফিসার ছিল। কাজেই জো তার কাগজপত্র খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। জাপানী সিপাইরা সুবিধা পেলেই এমনভাবে কৌশল করে যাতে অন্তত একজন শত্রু তাদের অফিসারের সামনে পড়ে যায়। তা হলে সেই শত্রু অফিসারের তরোয়ালের খোঁচায় মরবার সম্মান পাবে। কিন্তু হায়! আজকাল লড়াইয়ের ধরন বদলে গিয়েছে। তরোয়ালটা শুধু পাশে ঝোলানই থাকে।

তবুও এই ভারী লম্বাটে জবড়জং নকশার কাজ করা তরোয়ালের সম্মান খুব বেশী। হয়ত বংশের পুরানো পবিত্র তরোয়ালখানাই সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট সাকুরা কোমরে ঝুলিয়ে জাপান থেকে রওনা হয়েছিল। তাতে কত নাম, মন্ত্র আর সম্রাটের রাজ-চিহ্ন খুব দেখন-সই ভাবে খোদাই করা আছে। পাঁচ ফুট জাপানীর চার ফুট লম্বা তরোয়ালের হাতলটা হাতীর দাঁতের। জাপানী ফুলের রাজা ক্রাইসানথিমাম আঁকা রয়েছে তাতে। খাপটা বাঁশের তৈরী। কিন্তু কালো এনামেল করা। রঙীন ফিতে আর মেয়েদের খোঁপা বাঁধার ট্যাসেলে জড়ান সেই হাতলটাতে জো হাত বুলাতে লাগল।

নজর পড়ল সাকুরার কোমরবন্ধের উপর। সাদা রেশমের লম্বা বেল্ট। একে বলা হয় হাজার সেলাইয়ের বেল্ট। শুধু বান্ধবীরাই ছোট ছোট গিঁঠি সেলাই করে এই বেল্ট তৈরী করে দিতে পারে। হরেক রকমের মন্ত্র আর মাদুলী সুতো দিয়ে তাতে বেঁধে দেওয়া আছে। কয়েকটা জাপানী লতাপাতাও আঁকা আছে।

ভালো থেকো, ভাল থেকো; লড়াইয়ের আঁচড়টি যেন তোমার গায়ে না লাগে। ওগো, ভাল থেকে, সুস্থ থেকে বেঁচে ফিরে এসো তুমি!

বুকপকেট থেকে কাগজপত্র বের করে নিল জো। ইউনিফর্ম পরা নিজের ছবি, বুড়ী মায়ের ছবি, ছোট ছোট ভাইবোনের গ্রুপ ফটো।

আর……আর শেষ ছবিটি যে কার তা জো'কে বলে দিতে হবে না। সে মুখের হাসি, সে চোখের ইশারা, সে ঘাড়-দোলানির ভঙ্গী—সে যে

পৃথিবীময় একই। সে ঠোঁটের নীরব ভাষা, কাতর মিনতি, তা কি জো পড়তে পারবে না আজ ?

চুপ করে রইল জো। আস্তে আস্তে কাগজপত্রগুলি সাকুরার ইউনিফার্মের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে রাখল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল অন্য দিকে।

ততক্ষণে সে নিজেরই অজানতে হাঁটুর পকেটে হাতের মুঠির মধ্যে শক্ত করে ধরে রেখেছে জয়-এর চিঠি।

ওগো, ভাল থেকে, সুস্থ থেকে, বেঁচে ফিরে এস তুমি !

আস্তে আস্তে মুঠি খুলে হাতটা বের করে আনল জো।

চার

রাতে ফ্যান্সী ড্রেস বল নাচ হবে।

ষ্টীমারের লাউঞ্জ অর্থাৎ বৈঠকখানায় নোটিশ টানানো হয়েছে। কিন্তু দেবলের মন সেদিকে নেই। তার মনে জেগে আছে শুধু প্রিয় বান্ধবীর, প্রিয়ার প্রার্থনা।

ভালো থেকো! ওগো, ভাল থেকে ফিরে এসো তুমি। প্রিয়া ত দূরে, লড়াইয়ের বিপদ থেকে অনেক দূরে নিরাপদে বসে প্রার্থনা করছে। কিন্তু যার জন্য প্রার্থনা করছে সে বেচারী কী প্রার্থনা করবে? তার যে মানুষ মারতে মারতে মরবারও সময় না হতে পারে।

দেবল তার হাতের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল। আজ তার নিজের হাতের দিকে পর্যন্ত সোজাসুজি তাকাতে সাহস হচ্ছে না।

বাঙালীর ছেলে। এই হাতে কবিতার বইয়ের পাতা উলটিয়েছে। মিতার থরো থরো কাঁপা হাত মুঠি করে ধরে রেখেছে। মিলিটারী মেসের বিদায়-ভোজের পর মিলিটারী স্পেশাল ট্রেনে নানা জায়গা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষে কলিকাতার ঘাটে ছোট্ট ষ্টীমলঞ্চে উঠে পড়তে হল একদিন শেষ রাতে। ঠিক কোন্‌খানে গিয়ে ট্রান্সপোর্ট জাহাজে উঠতে হবে তা কাউকে জানান হয়নি।

তারা শুধু জানত যে এর পরে সবই অজানা। নিশুতি রাতে লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজ মিতার বুকের ধুকধুকানিকে একেবারে চেপে দিয়েছিল। কিন্তু দেবল হাতের মধ্যে তার হাতের কাঁপুনিকে থামাতে পারেনি।

সেই হাত এর পরে দেবল কি করে স্পর্শ করবে দেশে ফিরে গিয়ে? এ যে মানুষ-মারা হাত। খুনীর হাত।

যখন সে যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই জানত যে মানুষ মারতে হবে। কিন্তু জানা এক, আর সত্যি সত্যি মারা আর এক জিনিস। তা ছাড়া দলের মধ্যে যুদ্ধের নেশায় মারাকে সৈন্যরা মারা বলেই ধরে না। এতদিন মালয়ের জঙ্গলে সে আর তার দল অনেক লড়াই করছে। শত্রুও মেরেছে কত। কিন্তু সে ত পাইকিরি হিসাবে দলের সবাই মিলে একসঙ্গে

বন্দুক ছোড়া, রাইফেল চালান, গ্রিনেড ফাটান। কার কোন্‌টাতে কে মবল তার না ছিল হিসাব, না হিসাবের সময়। শুধু এক নাগাড়ে চালিয়ে চল এই ছিল মন্ত্র।

কিন্তু এত দিনে সে নিজের হাতে চোখের সামনে হিসাব করে একজন শত্রুকে গুলী করেছে। যখন করেছে তখন জানত না যে সে কাউকে প্রাণে মেরে ফেলছে। মারা যে কি জিনিস সে কথা ভাববার সময়ও ছিল না। মার, না হয় মর। অতএব সে মেরেছে।

ওদের টহলদারী দল চারটেই পথ হারিয়ে ব্রিগেড থেকে ছিটকিয়ে পড়েছিল। চারিদিকে জাপানী দল। সবাই ছুটেছে দক্ষিণে। মালয়ের রাজধানীর দিকে। পিছনে কোথায় ইংরেজ পক্ষের কোন ছোট ছোট সৈন্যদল পড়ে রইল তার জন্য ওরা ব্যস্ত নয়। তারা ত এমনিতেই জালে আটকিয়ে পড়বে।

কাজেই জো ঠিক করেছিল যে এখন একমাত্র পথ হচ্ছে কোন রকমে কাছাকাছি কোন লোকালয়ে গিয়ে নিজের চারটি দলকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া। সেখান থেকে কোন বড় সৈন্যঘাঁটিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে। ম্যাপ দেখে আর কম্পাস দিয়ে ঠিক করে ওরা সমুদ্রের পারে ছোট একটা শহরে এসে পৌঁছাল। শহরটার চারপাশে অনেক রবারের বাগান। অনেক ইংরেজের বসতি।

জো'র হিসাবে ভুল হয় নি। বাগানের ইংরেজেরা জায়গাটা ছেড়ে সিঙ্গাপুরে পালাবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। জাপানীরা এত হঠাৎ যুদ্ধে নেমে পড়ল আর মালয়ে হানা দিল যে ওরা আগে থেকে সরে পড়তে পারে নি। তবু কোন রকমে ওরা একটা বন্দোবস্ত করেছে।

সমুদ্রের পারে পারে শহরগুলিতে যাতায়াতের "কোস্টাল স্টীমার সার্ভিস" ছিল তারই একটা স্টীমার ওরা ভাড়া করে নিয়েছে। সব ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ ছেলেপুলে ওটিতে করে "ইভ্যাকুয়েট" করে যাবে অর্থাৎ সটকিয়ে যাবে।

এ-হেন সময় জো'র দল সেখানে এসে হাজির। দু' পক্ষই মহা খুশি। এক পক্ষ জানে বাঁচবে। আর এক পক্ষ দরকার হলে একটু লড়ে বাঁচাতে

পারবে। অন্তত পক্ষে কয়েকটা সঙ্গীন-চড়ানো বন্দুকধারী সঙ্গে থাকলে ডাকাতির ভয়টা থাকবে না।

কিন্তু জো খুব হুঁশিয়ার। শুধু জাহাজে চড়ে বসলেই চলবে না।

সে জাহাজের সন্ধান যেন দুশমন না পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। শহরের পুলিশদের জাপানী পক্ষের স্পাইদের খোঁজে লাগিয়ে দিল। একটা জাহাজ বোঝাই ইংরেজ চলেছে, মায় কিছু সৈন্য পর্যন্ত। এ-হেন খবরটা স্পাইরা নিশ্চয়ই জাপানীদের কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু শুধু পুলিশ দিয়ে ভরসা নেই। তাই জিরো আওয়ার অর্থাৎ যে সময়ে জাহাজ ছাড়বে তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার টহলদাবরাও শহরটা তন্ন তন্ন করে ঢুঁড়তে লাগল।

বন্দরের ঠিক বাইরে পার্কটার পিছনে কে ওই লোকটা? মালীর মত মনে হচ্ছে। না, একনজরে দেখে আসা ভাল। জাহাজে উঠবার তক্তাগুলি টেনে জাহাজে তুলে নেওয়া হচ্ছিল। সামনে দাঁড়িয়ে জো। তাকে একটু দেরি করতে বলে হনহন করে নেমে গেল দেবল।

মালী সেজে মালীর কাজ করছে বটে। কোদাল দিয়ে মাটি সরাচ্ছে। কিন্তু এই ডামাডোলের দিনে সবাই যেখানে পালাচ্ছে বা গা-ঢাকা দিচ্ছে সেখানে কর্তব্যের প্রতি এরকম অতি ভক্তি একেবারে চোরের লক্ষণ। রিভলভার তুলে দেবল হেঁকে উঠল—হ্যাণ্ডস্ আপ! হাত উপরে তুলে ধর।

নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকিয়ে উঠল দেবল। এতদিন এক কাপ চায়ের জন্য বনমালী কেবিনে হাঁক দিয়েছে। বাসার চাকরকে পাজী ইষ্টুপিড বলে গাল দিয়েছে। এমনকি মিতার উপর নিজের ইচ্ছার জারিজুরিও খাটিয়েছে। কিন্তু এ ত সে গলা নয়। সে মানুষও নয়।

যেন একটা জন্মান্তর হয়ে গেছে। হয় মার, না হয় মর। এ দুই ছাড়া তৃতীয় পথ নেই। মাটির নিচে বেতারে খবর পাঠাবার ছোট যন্ত্রটা উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

না। মারা ছাড়া পথ নেই। হাত কাঁপছে? একটা স্পাইকে মারতে হাত কাঁপছে দেবলের? কিন্তু দাঁড়িপাল্লার এক দিকে এই রেডিয়োতে খবর চালানর নিরস্ত্র লোকটা, আর অন্য দিকে এই জাহাজভর্তি লোক, তার

নিজের সৈন্যদল, সে নিজে। শুধু নিজে নয়, তার পিছন থেকে তাকিয়ে আছে তার মিতা। ওগো, ভাল থেকে, বেঁচে থেকে ফিরে এসো!

লোকটার মুখ একেবারে পাঁশুটে হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো তার ভয়ানক ভাবে কাঁপছে! কিন্তু শব্দ নেই। দেবলেরও হাত কি কাঁপছে! না কাঁপছে না। গঙ্গার পারে রাতের আঁধারে হাত শেষবারের মত কেঁপেছিল। তার পর থেকে সে আর কখনো থরথর করে শিহরিয়ে উঠবে না।

রিভলভাবের ধোঁয়া মুছতে মুছতে সে ফিরে এল।

বিকেলে স্টীমারের ডেকে নোটিশ টাঙানো হল যে ফ্যান্সী ড্রেস বল নাচ হবে। সবাই যে যেমন খুশী পোশাক পরে নাচতে এস। নাচ হবে স্টীমারের লাউঞ্জে অর্থাৎ বৈঠকখানাতে। তবে রেডিয়োর নাচের বাজনার বদলে শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো হবে।

ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় লাউঞ্জের দরজা জানালা বন্ধ থাকবে। ব্ল্যাক-আউট থাকা দরকার। কিন্তু সে আঁধার ত শুধু বাইরের জন্য, দুশমনের নজরে না পড়ার জন্য। মনের মধ্যে ত আর কেউ ব্ল্যাক-আউট করতে বলেনি।

রবিন ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল দেবলকে। বলল,—এতে অবাক হবার কিছু নেই। জান ত, ব্রিটিশদের মধ্যে কথাই আছে যে তোমার থুতনি সবদাই উঁচু করে রেখো। চোয়ালে কষিয়ে কেউ দু'ঘা লাগিয়ে দিলেও মন খারাপ করে থুঁতনিটা নামিয়ে রেখো না।

দেবল হেসে ফেলল! বলল,—কিন্তু থুঁতনিটা যে জাপানীরা ভেঙ্গে দিয়েছে।

রবিনও হাসল,—তার জন্যেও দাওয়াই আছে ওদের শাস্ত্রে। নিশ্চয়ই শুনেছ সেই রেকর্ডের গানটা—কিপ ইয়োর সানি সাইড আপ। তোমার যে দিকে রোদের আলো সেই দিকটা তুলে ধর। জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচছ ত একটু বাঁচার মত করেই বাঁচ। নেচে কুঁদে বাঁচ। ইংরেজের ব্ল্যাক-আউট—তোমার বাংলা কাগজে তাকে বলে নিষ্প্রদীপের মহড়া। কিন্তু দেখো আজ কতো মনে কতো দেওয়ালী জ্বলবে।

একটু নড়ে চড়ে বসে দেবল। বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল,—কিন্তু ভোরবেলা ত বাকী থাকবে শুধু বুক-পোড়া পিদীম আর সলতের ছাই।

না, তুমি রিভলবার ছুঁড়তে শিখেছ, কিন্তু রসকষ কিছু নেই। আরে, যার বুক আছে তার বুক পুড়বেই। সলতে অমন লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে—শুধু ছাই হবার জন্যেই। তুমি, দেবল, যতদিন আগুনের রঙ আর আলো খুঁজে না পাবে ততদিন শুধু ওর গরম দেখেই ভয় পাবে।

তার পর একটু ঝুঁকে দেবলের চোখের উপর চোখ রেখে বলল,—কিন্তু দেবল, তোমার সলতেতেও আগুন জ্বলছে। আমার কোন সন্দেহ নেই।

কে বললে তোমায় সে কথা ?

—তোমার এই পাল্টা প্রশ্নটাই বলে দিয়েছে। আমার সাক্ষী হচ্ছে তোমার চোখমুখ, তোমার হাবভাব। আর মনে হচ্ছে যে আমি যদি শার্লক হোম্‌স হতাম তা হলে একবার তোমার হাতঘড়িটাও হাতড়িয়ে দেখতাম।

হৈ হৈ করতে করতে হাজির হল উরায়ম সিং! মুখখানা আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু দাড়ির উপর সযত্নে সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আঁতকিয়ে উঠল দেবল। জিজ্ঞেস করল,—কি হল তোমার মুখে ? খুব কিছু জখম হয়নি ত ?

জখম ? আহ্লাদে চোখ নাচাতে নাচাতে উরায়ম বলল, জখম হবে আমার মুখে ? কেন ? এত বড় ছাতিখানাতে এখনও জখম হল না একটুও, আর তুমি ভাবছ যে জখম হবে আমার মুখে ? কেন, এমন যে ঢেউ-খেলানো দাড়ির বাহার দেখছ, এটা কি আমার কম গর্বের ধন ? তখ্‌ত তাউসে বসে শাজাহানও তাঁর দাড়িকে এত পেয়ার করেননি কখনো।

রবিন উরায়মের কথার তোড়ে একটু বাধা দিল। বলল, পালানে জাহাজে বসে লালকেল্লার শাজাহান বেচারাকে আর টানাটানি কেন ?

মুখের ব্যাণ্ডেজে খুব হাল্কাভাবে হাত বুলোতে বুলোতে উরায়ম বলল,—আলবৎ। জরুর করুঙ্গা। দীন দুনিয়ার মালিক শাজাহান আর উরায়ম সিংয়ে ফারাক নেই একরত্তিও। ওর চোখে মুখে দাড়িতে ছিল জিন্দগী ভোর আরামের নেশা। আমার দাড়িতে আছে এই জাহাজ-ভরা সব মেয়েদের মন জয় করবার নেশা। ওকে জয় করতে হয়নি কিছুই। না চাইতেই পেয়েছে সব। আমি না পেয়েও সব চেয়েছি। যা পাব যেটুকু

পাব সেটুকুই আমার তখ্‌ত তাউস। আমার নিজের হিম্মতের নিশানা। ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

তবু দেবল ব্যাণ্ডেজটার দিকে চেয়ে রইল।

রবিন হো হো করে হেসে ফেলল। বলল,—তা হলে দেবলকে তোমার ব্যাণ্ডেজের রহস্যটা খুলে বলি। জান, আমাব বাবা যখন সিমলাতে বদলি হলেন, পাড়াগাঁয়ের বন্ধুরা সবাই সিমলার কথা জানতে চাইল। আমি লিখলাম --খবরদার, তোমরা কেউ সিমলাতে আসতে চেয়ো না যেন। অতি বদ জায়গা। রাতে এত মারামারি হয় যে সকালবেলা দলে দলে লোক মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অফিসে যায়। ওরা মারামারিটা করে শুধু মুখের উপরেই। কিন্তু ডাক্তারবৃত্তিও এখানে নিশ্চয়ই খুব ভাল। কারণ সন্ধ্যেবেলাই কারো কোন জখম থাকে না। মুখে থাকে না কোন ব্যাণ্ডেজ।

তার মানে ?

া শ্চর্য হয়ে গেল দেবল।

দাড়ির বাঁধনকে পেয়াব করতে করতে উরায়ম জবাব দিল,—তার মানে আজ রাতে দেখতে পাবে। আমার এই দাড়ি, জানই ত, অনেক মেয়ের কানের কাছে গুনগুনিয়েছে। কিন্তু আজ দেখবে তার ঢেউ-খেলানো বাহার সাবা দিন বাঁধনেব পব সন্ধ্যেয় ছাড়া পাবে। তাব ঢেউয়ে ঢেউযে মালয়ের সব মেমকেই আজ ফ্যান্সী ড্রেস নাচে ভাসিয়ে নিয়ে যাব।

রবিন খুব খুশি। বলল,—কপাল গুণে উরায়ম আমাদের সঙ্গে আছে। ওর দাড়ি আর পাগড়ীর কল্যাণে আমাদের দেশের পতাকা আজ নাচঘরে পৎ পৎ করে উড়বে। এই মালয়ে সাহেব-মেমরা কোন দিন কালা আদমীকে পাত্তা দেয়নি। মালয়ের দেশী রাজরাজড়াদের সঙ্গে মিশেছে নেহাত দয়া করে। সেখানে আজ আমরা হিরো সেজে বসেছি। কিন্তু উরায়ম হচ্ছে বীরের সেরা বীর। একেবারে মধ্যযুগের নাইট। থ্রি চিয়ার্স ফর উরায়ম।

থ্রি চিয়ার্স ফর এ গ্লাস অব লাগার।

এক গেলাস 'লাগার' বিয়ারের জয়ধ্বনি করতে করতে উরায়ম চলে গেল। ওই সোনারবরণ পানীয়টি জাহাজের 'বারে' একটি সোনালী

চুলে ঘেরা মিষ্টি মুখ যে আজ নিজে হাতে পরিবেশন করছে সে খবর জাহাজসুদ্ধ সবাই জানত।

রবিন আবার দেবলকে নিয়ে পড়ল। বলল,—ভাই, আমি বাংলা দেশের মানুষ নই। তাই ভাবনায় নুয়ে পড়া আমার ধাতে খুব বেশী নেই। কিন্তু তুমি লড়াইয়ে এসেও কেন ওই ভারী পাথরটাকে মন থেকে নামাতে পারছ না বল ত?

দেবল চোখ নিচু করে নখ খুটতে লাগল। একটু পরে বলল—জান, আজ আমি একটা নিরস্ত্র লোককে মেরেছি। আমি খুনী।

ওঃ। ওই টিকটিকিটাকে? কিন্তু টিকটিকি ত মানুষ নয়। ওদের সব সময়েই মারা চলে। তা ছাড়া ওরা ত নিরস্ত্র হবেই। ওর হাতে যে বেতার-খবর পাঠানোর যন্ত্র ছিল সেটা কী ভীষণ অস্ত্র তা ভেবে দেখ।

তবু—তবু ওর আত্মরক্ষার কোন পথ ছিল না। আমি ওকে বিভলবার দিয়ে পোকার মত টিপে মারলাম।

সেজন্য তোমার ভিক্টোরিয়া ক্রস পাওয়া উচিত, দেবল। এই জাহাজ-বোঝাই বেসামরিক লোক, মেয়েলোক, কাচ্ছা-বাচ্ছা, জো'র অধীনের দল সবাইকে তুমি বাঁচিয়েছ। তোমার কড়া নজর আর সজাগ বুদ্ধির কল্যাণে।

করুণ হাসি হাসল দেবল। বলল,—জান রবিন, আমি যেই চেঁচালাম—হ্যাণ্ডস্ আপ, লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন ভূত দেখেছে। যেন পা দুটো মাটিতে ইস্ক্রুপ দিয়ে আঁটা। শেষে বেতারযন্ত্রটা চেপে ধরল। যেন ওটাই ওর হাতিয়ার। ঠোঁট দুটো বোবার মত কাঁপতে লাগল। শেষে তার পাৎলুনের পাছাটি আঁকড়ে ধরল। একেবারে সম্পূর্ণ অসহায়কে খুন করলাম।

না, কখ্‌খনো অসহায়কে খুন করনি। তোমার এই বীরত্বের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রস পাওয়া উচিত। স্পাইটা আর কারো নজরে পড়েনি।

ভিক্টোরিয়া ক্রস? একটু ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে কথাটা। আমরা হিঁদুরা ভিক্টোরিয়া ক্রস পেতে গেলে মরা দরকার। একেবারে জানে মরা। কারণ সাদাদের চেয়ে আমরা কালোরাই বেশী জান-প্রাণ দিয়ে লড়ছি।

যেখানে সবাই 'হিরো' সেখানে ঠিক জায়গায় ঠিক দিনক্ষণ হিসাব করে মরা দরকার। আর দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে মরা দরকার। যদি বড়কর্তারা না দেখতে পায়?

রবিন অস্বীকার করতে পারল না। ওরা সবাই তা বোঝে।

তবু বলল,—না দেবল। তুমি বড় ভারী স্বভাবের লোক। অত সিরিয়াস হলে বাঁচা ভার।

ইংরেজরাও সে কথা বোঝে খুব ভাল করেই তাই যে-ক'টা দিন জাপানীদের হাতে না পড়তে হয়, পালাবার চেষ্টা করতেই হবে। আর যতদিন পালাবে একটু রঙ্গরসে মনটা হাল্কা রাখবার চেষ্টা করবে। তা হলে আর মনে হবে না যে সংসারটা একটা বোঝা। বিপদটা বড় ভারী।

তাই হাল্কা সাজে ঝাঁকে ঝাঁকে নরনারী জমা হল জাহাজের লাউঞ্জে। মন থেকে খসিয়ে ফেলেছে ভয় আর ভার। দেহ থেকে বস্ত্র আর লজ্জা।

তিনটি তরুণী প্রথম পুরুষ আদমের প্রায় যোগ্য সঙ্গিনীর সাজে নাচতে নাচতে ঢুকল সেখানে তাদের মাথায় শুকনো ঘাসের টুপী। হাওয়ায় যেখানে আর সবাই প্রায় উড়ুউড়ু সেখানে শুধু টুপী তিনটেই একটু যেন আঁটসাট। একটাতে লাল কাগজ কাটা অক্ষরে লেখা 'দি', আরেকটাতে 'থ্রি' আর তৃতীয়টিতে 'মাস্কেটিয়ার্স'। তিনজন সঙ্গীনধারিণী যে ওরা সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

দেবল ফিসফিস করে রবিনকে বলল,—বেচারা ফরাসী সাহিত্যিক যখন ওই নামে উপন্যাসখানা লিখেছিল তখন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেনি সেই নামটার এ-হেন দুর্গতি হবে।

রবিন চটপট জবাব দিল,—তুমি দুর্গতি বলছ কেন? আমি ত দেখছি যে বইখানা লেখা সার্থক হল এতদিনে। তিন সঙ্গিনী যেন তিন-তিনখানা সঙ্গীন। চল বুক পেতে দেওয়া যাক ওদের মাস্কেটের সামনে।

উরায়মের পাগড়ীখানা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। সে যে ভাব করবার জন্য তৈরী হয়ে আছে তা বুঝতে কারো ভুল যেন না হয়।

একটি ছিমছাম তরুণী ঢুকল নাচতে নাচতে। একেবারে যাকে বলে স্ট্রীমলাইন করা রেয়নের মিহি গাউন পরা। এত মিহি যে প্রায় জলের

মত টলটলে। বুকের উপর গাউনখানা যে কেমন করে আটকিয়ে আছে তার রহস্য গাউনই জানে।

দেবল বলল,—খুব সম্ভবত গাউনখানারও লজ্জা আছে। তাই নামতে পারছে না আরো নীচে।

উরায়ম বলল,—তোমার বাংলা দেশের কবিদের দিব্যি—খবরদার এত সৌন্দর্যের এ-হেন হেনস্থা, এত অপমান আমি সইব না। দেখছ না ওর বুকে লাল রঙের একটা হার্ট (হরতন) আঁকা আছে। ওই হবে আজ রাতে কুইন-অব-হার্টস্‌। নিমন্ত্রণ করব না কি ওকে আমার সঙ্গে একখানা ওয়ালজ নাচতে?

রবিন বলল,—লেগে যাও উরায়ম। আজ তোমারই হউক জয়। আমরা পেছনে আছি।

কিন্তু লেগে যাওয়ার মত দম নেবার সময় কোথায়?

কুইন-অব-হার্টসের পিছনেই নাচতে নাচতে ঢুকল এক জোড়া নরনারী। পুরুষটির পোশাক রেড ইণ্ডিয়ান বা কোন বুনো শিকারীর মত। হাতে তীর ধনুক, কোমর থেকে ঝুলছে ফেত্তা মারা, রঙে ছোপান ধুতির মত আধখানা কাপড়। ঠিক কাপড় নয়, গোটা কয়েক স্কার্ফ সেলাই করে নেওয়া। বুকের উপর হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত কাঁচুলি। মাথায় উড়ছে জরিদার জংলা ওড়না। গাতে লেখা রয়েছে বড় বড় করে—শিকারী।

তার হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে সঙ্গিনী হরিণী সেজে। বিড়ালের মত হাল্কা নীল চোখে টেনে দিয়েছে সুরমা। হরিণনয়না হতে হবে যে। সারা গায়ে,—গাউনে ঢাকা আর আঢাকা দু জায়গাতেই,—হরিণের গায়ের মত ছোপ-ছোপ। মাথায় মুকুট পরা—দুপাশে দুটি ধড়াচূড়া হরিণের শিঙের মত। নিচে লেখা আছে 'ও ডিয়ার ডিয়ার—' ওগো, প্রিয় হরিণী। একেবারে হরিণের মত দেখতে হয়েছে। মায় গাউনের পিছনে ঝুঁটি দেওয়া হয়েছে ল্যাজের মত।

উরায়ম হার মানবার মাত্র নয়। মুচকি হেসে বলল,—দেখেছ দেখেছ, একেবারে 'ডিয়ার ডিয়ার'। ওই রকম গাউনের ঝুঁটি আমি সিনেমায় মেয়েদের পোশাকের প্যারেতে দেখেছি। একেবারে হাল ফ্যাসানের

ব্যাপার। প্যারিসের আমদানি। কিন্তু মনহরিণী যে আগে থেকেই শিকারীর হাতে ধরা পড়ে গেছে। এখন ওকে উদ্ধার করা যায় কি করে? কুছ মতলব ত বাৎলাও জি?

আঁটসাট, গোড়ালি পর্যন্ত চাপা পাৎলুন আর মধ্যযুগের ফ্রককোট পরে ম্যাণ্ডোলিন হাতে ঢুকল একজন। পুরনোকালের ফরাসী কবি সেজেছে। সে গান গেয়ে-গেযে প্রেম করে বেড়ায় নাগরীদের জানলার তলায় তলায়। এ-হেন মিঠে কাজটির নাম হচ্ছে সেরিনেড। গানের সুরে প্রেম জানিয়ে দিতে হয়।

রবিন বলল উরায়মকে, দেখ, ক্যাপ্টেন আমাদের নেহাত বেরসিক লোক। বলল কিনা যে লড়নেওয়ালাদের সম্মান দেখানোর জন্য আজকের ফ্যান্সী ড্রেস নাচ। আজ আমরা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অতিথি। তাই আমাদের আসতে হল ইউনিফর্ম পরে। কেন রে বাবা, এই ইংরেজরা এত পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে জাহাজে উঠতে পেরেছিল! তা থেকে আমাদের কি কিছু কাপড়-চোপড় ধার দিত না?

অবশ্য দিত। নাচের সঙ্গিনী ত ধার দেবেই। কিন্তু তোমার এতে লাভটা কি শুনি?

তাতে লাভ ছিল দেবলের। ওকে আমরা এই ফরাসী প্রেমিক কবি বানিয়ে ছেড়ে দিতাম এই নাচঘরে। আর তিন সঙ্গিনীদের টিপে দিতাম ওকে কিডন্যাপ করে লোপাট করে নিয়ে যেতে। তরুণীদের হাতে মিলিটারী লোপাট। আঃ, ভাবতেই মনটা আনচান করছে। ও বেচারার মনটাও একটু হাল্কা হয়ে যেত। পৃথিবীতে নতুন একটা কিছু করার বীরত্বটাও ত ওর রেকর্ডে লেখা হয়ে থাকত। মায় মিলিটারী ক্রস মেডালটা।

কিন্তু বাজনাটা বড় হাল্কা, বড় মাতাল করা হয়ে উঠল। প্রথমেই শুরু হল একটা রেকর্ড। "তুজুর লামুর"—সারা দিবস ধরে প্রেম।

ফরাসী জানে না প্রায় কেউই, কিন্তু গানটার মানে জানে অনেকে। জাপানীরা দিয়েছে হামলা। কানমলা খেয়ে ঘর ছেড়ে পালানোর অবস্থা হয়েছে। কিন্তু সারা দিন ধরে প্রেম করে নাও—যে ক'দিন চলে।

মালয়ে সাহেব-মেমেরা সে কথা মানত অক্ষরে অক্ষরে। তাই শেষ দিন পর্যন্ত ওরা আমোদ-আহ্লাদ ছাড়ে নি। এমন ভাবে তাতে গা ভাসিয়ে রেখেছিল যে ওখানকার প্রধান সেনাপতি ব্রুক পপামের লেডি বেতারে আর কাগজে খুব গভীর দুঃখে তার নিন্দা করেছিলেন।

একটি মেয়ে খুব ভাব দেখিয়ে আহ্লাদে আধখানা হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল,—হোয়াট অ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক ? একটু পানীয় নেবে না।

চট করে উরায়ম তার মাথা মায় বড়ীন পাগড়ী সামনের দিক ঝুলিয়ে দিল। দু গালের দাড়িতে নদীর দু পার বেয়ে হাসির ঢেউ খেলে গেল। বলল,—অবশ্য অবশ্য, মিস। কিন্তু কি পানীয় নেব বল। তুমি যা নিজে হাতে দেবে তাই নেব।

তরুণী রূপের ঝলক হেনে বলল,—তোমার কি পছন্দ বল আগে ?

আমার পছন্দ ? বুকের উপর হাতখানা রাখল উরায়ম। যেন ওই প্রশ্নটুকুর মধ্যে যতটা দরদ আছে তার সবটা বুকের মাঝে মনের মাঝে অনুভব করে নেওয়াই বীরপুরুষের লক্ষণ। আমার পছন্দ ? আমার পছন্দ হচ্ছে হোয়াইট লেডি।

না, চমকে উঠো না দেবল। কথাটার মানে শুধু শ্বেতাঙ্গিনী নয়। জিন মেশান এক রকম আর্মি ককটেলের নামও হচ্ছে হোয়াইট লেডি।

ইংরেজ তরুণী খিলখিল করে হেসে উঠল,—ওঃ মাই হ্যাট ! তোমার চতুরালির তুলনা নেই।

সে হাসি যেন ফুলঝুরির তারা ঝরাতে লাগল ওর মনের আকাশে। নাচঘরের বাতিগুলো কিন্তু ক্ষণেকে নিভে নিভে গিয়ে একটু পরে আবার জ্বলে উঠতে লাগল।

এই নাচটির সময় এটাই আজকাল ফ্যাসান। মনের আকাশে বাসনার তারা মিটিমিটি জ্বলে আর নেবে। আবার জ্বলে।

বন্ধ জানলার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেবল। সে নাচতে শেখেনি। শেখার ইচ্ছাও নেই।

কিন্তু রবিন হচ্ছে সাহেবদের দেশের বুলবুলি। রবিন অতি পেয়ারের পাখীর নাম। ওরা রবীন্দ্রকে নাম দিয়েছে রবিন। সেও নতুন শেখা

বিছার মহড়া দিতে লাগল। ঘুর ঘুর ঘুর। মদের চেয়ে বেশী নেশা নাচে। যৌবনের যাদুমন্ত্র আছে নাচে।

ছোট্ট জাহাজ সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে। চরণ নাচছে বাজনার তালে তালে। আর হৃদয়? সে ত পেখম মেলে বাহুসঙ্গিনীকে ধরেছে। খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে। দরিয়ার মত দিলের দরদ দিয়ে।

একটা নাচ শেষ হতে উরায়ম বড় বিরসমুখে ফিরে এল। পাগড়ীখানা নাড়তে লাগল ডাইনে বাঁয়ে।

দেবল জিজ্ঞেস করল,—ব্যাপার কি, উরায়ম? যেন কুইনিন খেয়েছ মনে হচ্ছে।

চোখে কুইনিনের তেতো স্বাদ ছড়িয়ে সে বলল, –তাতে এ শর্মা কাহিল হত না। জিন আর বিটার্স (তেতো বিয়ার গোছের মদ) দিয়ে শুরু করি রোজ দুপুরে। মদিরাই হচ্ছে মধু।

তবে বোধ হয় নতুন কোন মাল চেখেছ এখন- হেসে বলল দেবল।

নতুন নয়। ঝাঁজ মাখিয়ে বলল উরায়ম। নতুন নয়, একেবারে পৃথিবীর প্রথম কারবার। যাকে বলে চারশো বিশ।

অর্থাৎ?

ওঃ তুমি যে আবার গুড বয়। সংসারের জান না কিছুই। বলি চিটিংবাজ জান? পিনাল কোডের চারশ বিশ ধারা?

এতক্ষণে বুঝল দেবল। বলল,—তোমায় এখানে ঠকাল কে? তুমি হচ্ছ আজকের রাতে নরসিংহ-—লায়ন অ্যামং মেন। সব সুন্দরীরাই ত তোমার সঙ্গে নাচবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দেখছি।

সেই ত কাল হল। দুঃখ ফেটে পড়ল উরায়মের কথায়। তিন তিন জন মুখোশপরা সুন্দরী এসে ছেঁকে ধরল। রুস্বা নাচতে হবে ওদের সঙ্গে। আজ রাতে ছাড়া অন্য কোন রাতে মেয়েরা নিজে যেচে নাচের সঙ্গী হতে চাইত না। এমন সৌভাগ্য। হাতের লক্ষ্মী কি করে পায়ে ঠেলি? বেছে বেছে সবচেয়ে চটকদারটির সঙ্গে গেঁথে গেলাম।

কিন্তু—মাথা ঝাঁকিয়ে বলল উরায়ম,—যা কিছু ঝক্‌ঝক্ করে তার সবই সোনা নয়।

দেবল সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। তোমার নিজের বৌ বা প্রেয়সী যখন নয় তখন গিল্টিতেই বা এত আপত্তি কিসের?

উরায়মের কোন সান্ত্বনাই হল না তাতে। বলল—গিল্টি ত নয়ই, একেবারে পেতল। কিন্তু আমার নাচটা মাটি করে দিয়েছে। নাচের মাঝে যখন আলো নিভিয়ে দিল, সুন্দরী তাড়াতাড়ি তার মুখোশ খসিয়ে ফেলল।

ঠাট্টা করবার লোভ সামলান শক্ত। দেবল বলল,—তোমায় অভিনন্দন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। মুখোশের পিছনের মুখখানা—

সহ্য হল না উরায়মের। বলল,—একেবারে চরিত্র সামলাবার রক্ষাকবচ। মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে যাবার মোক্ষম প্রেরণা। এ-হেন সুন্দরীর সঙ্গে নাচার চেয়ে জাপানী গুলীতে মরা সহজ।

দেবল ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। বলল,—সুন্দরীর মুখের মেক-আপটা বোধ হয় ঠিকমত করা হয় নি।

মেক-আপ? উরায়মের দাঁত আর দাড়ির মধ্য দিয়ে চাপা গর্জন বেরিয়ে এল। মেক-আপের মির্যাকল পঞ্চাশ বছরের তরুণীদের দিয়েছে অনন্ত যৌবন। তবু ও-বিদ্যায় মুখটুকু চিরকাল চলে না।

হেসে দেবল বললে,—তুমি না হয় শুধু ওর আঁখির দিকেই তাকাতে।

চোখ হচ্ছে মনের জানলা। অনেক বিগত বসন্তের ঝড় ওই জানলার মধ্য দিয়ে আমায় ঝাপটা মেরে গেল। অনেক জাগর রাতি, অনেক প্রেমের ছাই। কত খুঁজে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া বঁধুর ইতিহাস। অনেক রঙীন নেশা আর মাতোয়ালা মন।

তাতে তোমার আপত্তিটা কি?

লাহোরের মিশনারী কলেজের ছাত্র, ইউনিভার্সিটির হকি খেলাতে ব্লু উরায়মের মনের জোয়ার দেখে দেবলের চমক লাগল। তাকে আরো খুঁচিয়ে আরো রত্ন বের করতে চাইল।

তাই সে জিজ্ঞেস করল,—তাতে তোমার আপত্তিটা কি? তুমিও সেই অফুরান মালার নতুনতম ফুল হয়ে গেঁথে যাও।

জোরে মাথা ঝাঁকাল উরায়ম। তার মনের তোলপাড় বিরাট শিখ দেহকে নাড়া দিয়ে গেছে।

সে বলল,—জান, বয়েস ওর দেহকে ছুঁতে পারেনি এখনো। ছুটোতে পারেনি মনের নেশা। যৌবন জলতরঙ্গ? তাতে ত সব গ্লানিই যায় মুছে। পাপেরও থাকে না কোন ছাপ। শুধু জানলার ভিতর থেকে দেখলাম ফুরোনো বসন্তের ঝরা পাতা।

—জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেই পারতে। ঘরের মধ্যে ত সাজানো গোছানো আছে সব কিছু।

সে জন্যেই ত শুধু চোখে না তাকিয়ে মুখের দিকে নজর দিলাম। ও যখন হাসল, প্রথমে মনে হল যেন ডাকঘরের লাল বাক্সটা খুলছে। পরে মনে হল যেন সার্জনের ছুরিতে সদ্য কাটা একটা অপারেশন। ব্যাণ্ডেজ করা হয় নি এখনো। বড় অসহায়। যৌবন চলে যাবার বেদনায় অসহায়।

—তোমার উঠতি উচ্ছ্বাসের ঢেউ বোধ হয় তার বেদনাকে বাড়িয়েই দিয়েছিল।

—জানি না। কিন্তু মনে হল যেন ওর সবই ঝুটো। খাঁটি কিছুই নেই। মায়া হল, বড় মায়া হল। কিন্তু আর নাচ জমল না। এমন কি নাচতে নাচতে তার কানে কানে দুটো মামুলি মিঠে বুলিও শুনিয়ে দিতে পারলাম না।

—তোমার কোন আশাই নেই, উরায়ম। পাঁচ মিনিটের নাচের মধ্যেও খাঁটি খুঁজে বেড়াচ্ছ। আরে, নাচটাই ত আসল। সঙ্গিনী ত শুধু মায়া।

—হুঃ। ভারী জান তুমি, সন্ন্যেসী ঠাকুর। সঙ্গিনীই ত সব। নাচটা মায়া। পার তুমি কোন হোঁৎকা মিন্‌সের সঙ্গে রুম্বা নাচের ঘূর্ণি-দোলায় মাততে?

—পারি না। কারণ পুরুষের জীবনে নারীই হচ্ছে পরম সত্য।

আবার নতুন একটা নাচে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যে তালে তালে এগিয়ে গেল উরায়ম। যেতে যেতে মুচকি হেসে মুখ ফিরাল। বলে গেল—আর, পরনারীই হচ্ছে পরমা নারী।

পাঁচ

নাচঘরের মাতাল ঝঙ্কারের ডাক এড়িয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এল দেবল। পিছনে দরজাটা খুব সাবধানে ভাল করে বন্ধ করে এল। একটু আলোর রেখাও যেন বাইরে এসে না পড়ে। উপরের ডেকে বাঁধা একটা লাইফ-বোটের আড়ালে চুপ করে বসে রইল।

জাহাজের মত ওর মনেও চলেছে ব্ল্যাক-আউট। আলো, কোথায় ওরে আলো!

আলো ত আছেই। কিন্তু মিতার দীপশিখাকে সে সযত্নে ঢেকে আড়াল করে রেখেছে! এই খুনোখুনি, প্রাণ নিয়ে টানাটানির নিষ্ঠুর আলোতে তার আকাশপ্রদীপকে সে টেনে আনবে না।

কলকাতার কাছাকাছি অজানা আঘাটায় ষ্টীমলঞ্চে উঠবার আগে মিতার সঙ্গে শেষ দেখা হয়ে গেল কেমন করে তা সে নিজেই জানে না। অবাক্ হয়ে সে জিজ্ঞেস করল,—তুমি কি করে খবর পেলে মিতা? আমি ত জানাতে পারিনি কাউকে। বারণও ছিল।

অথচ মিতা কেন, কলকাতার বহু লোকেই মুখে মুখে জেনে গিয়েছিল যে সেদিন একটা ব্রিগেড কলকাতা থেকে রওনা হবে। দেবলদের ব্রিগেড তাদের ক্যাম্প থেকে কবে রওনা হয়েছে তার দিনক্ষণ হিসাব করে মিতা ধরে নিয়েছিল যে আজই হয়ত দেবল কলকাতা হয়ে জাহাজে রওনা হবে।

তাই মিতা দেবলের প্রশ্নের উত্তর দেয় নি।

শুধু বলেছিল,—ইংরেজের মিলিটারীর গোপন খবর গোপনে রাখার এত ব্যবস্থা। তাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের না জানি কত বিপদ হবে। তোমরা কেউ কাগজে কলমে জান না কোথায় যাচ্ছ। কিন্তু ষ্ট্রাণ্ডে চৌরঙ্গীতে টিকটিকিগুলো পর্যন্ত সে খবর জানে।

—ভাগ্যিস জানে। না হলে তোমার সঙ্গে হঠাৎ ত দেখা হত না এমন করে।

—না-ই বা হত দেখা। অন্ততঃ নিশ্চিত থাকতাম যে তোমরা এত

আটঘাট বেঁধে চলাফেরা কর যে যুদ্ধের মধ্যে গুপ্ত খবর ফাঁস করে শত্রুরা তোমাদের বিপদে ফেলতে পারবে না! আজ কলকাতায় কত লোকে জানে তোমাদের যাবার কথা। আর শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা জানবে না?

—থাক এখন শত্রু আব যুদ্ধের কথা। মোটে ত একটুখানি সময়। তোমাব কাছে নির্ভাবনায একটুখানি থাকবো এখন। অনুনয় করে বলল দেবল।

কিন্তু মিতা ত সে কথায় সান্ত্বনা পাবে না। ম্লান হেসে বলল,—ওঃ তুমি বোধ হয় ভাবছ এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল। নাঃ, সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেলে তুমি। তুমি ভাল থেকে সুস্থ থেকে ফিরে এসো। তাই আমাব সব। ক্ষণকাল আর চিরকালে আমার দরকার নেই।

হাতে ক্ষণকাল সময়ও ছিল না। বাত আটটায় ট্রানজিট ক্যাম্পে জড়ো হবার ঘণ্টা পডবে। টিক-টিক্ করে হাতঘড়িতে সময় চলে যাবার নোটিশ দিয়ে যাচ্ছে।

চাবিদিক একেবারে নির্জন, নিঝুম। ঘডির আওয়াজটা একটু বেশী বলেই মনে হচ্ছে। যে হাতে মিতার হাত ধরে আছে, সেই হাতেই ঘড়িটা বাঁধা বলে দেবল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মিতা তা লক্ষ্য করল। হেসে বলল,—ঘডির টিক্-টিকে তুমি অস্থির হয়ে উঠছ? মেশিনগানের আওয়াজ তোমাব কানে নিশ্চয়ই অভ্যাস হয়ে গেছে এতদিনে।

—তা হয়েছে। তবু সব ছাপিয়ে উঠেছে ঘড়ির আওয়াজ। মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এখনি উঠে যেতে হবে। তোমায় ছেড়ে যেতে হবে।

ওর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে মিতা হাসল। বলল,—না, এই দেখ আমি এই হাতঘড়িটাকেই আমার স্মৃতিতে ভরিয়ে দিচ্ছি।

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট গ্রুপ ফটো বের করল। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আবছা আলোতে ঠাহর করে তা থেকে নিজের মুখের ছবির অংশটুকু চিনে নিল। ঘড়ির নিচের ডালাটা খুলে সেখানে ভরে দিল টুকরোটা।

বলল, এই টিক্ টিক্ করে সময় বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাও ঘড়ি

তোমায় মনে করিয়ে দেবে। এই রইল আমার চিহ্ন তোমার সঙ্গে। ঘড়ি আর কখনো তোমায় মনে করাবে না যে আজ সন্ধ্যায় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। শুধু মনে করিয়ে দেবে যে আমরা একসঙ্গে আছি।

দেবল আধো ফোটা স্বরে কি যেন বলল। মিতা ঠিকমত শুনতেই পেল না। এত আস্তে, এত ভাঙ্গা গলায় দেবল কথা বলেছিল।

দেবল একটু পরে জিজ্ঞেস করল,—কই, আমাব কথার ত জবাব দিলে না ?

কথাটা মিতা ত ধরতেই পারে নি। তবু সে-কথা প্রকাশ করে সে এখন দেবলকে ক্ষুণ্ন করবে না। কিন্তু এই সময়ে, এই মুহূর্তে আর কী কথাই বা হতে পারে ? সংসারসুদ্ধ সব মানুষের চিরকালের সেই অসহায় মিনতি—মনে রেখো, রেখো মনে।

সেই চিরচেনা মানুষটি আজ চলে যাচ্ছে দূরে। অচেনা দেশে অজানা ভবিষ্যতে। কিন্তু তার চারধারে ঘিরে থাকবে নিশ্চিত বিপদ, আরো বেশী সুনিশ্চিত ভাবনা।

একটুও না ভেবেই মিতা ঠিক ধরে নিল দেবল কি বলতে চেয়েছিল। দেবলের মুঠির মধ্যে নিজের আঙুলগুলিকে আরো বেশী আত্মসমর্পণে এলিয়ে দিল। ধীরে ধীরে বলল,—আমি তোমারই থাকবো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করব। তুমি ফিরে এসো! ভাল থেকে সুস্থ থেকে ফিরে এসো।

ম্লানভাবে দেবল বলল,—আর যদি ভাল না থাকি ? সুস্থ না থাকি ?

—নিশ্চয়ই থাকবে। ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনবেন। এমন কথা তুমি বলো না।

দেবলের মনের মধ্যে কচি কোমল ভাবটা কেমন যেন শক্ত নারকেলের খোলার আবরণে ঢাকা পড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,—আর যদি না ফিরি ?

কিন্তু অসহায় ভাবাবেগের সময় নেই মিতার। কথাটাকে সে একেবারে উপেক্ষা করল। উড়িয়ে দিল। শুধু বলল,—তুমি নিশ্চয়ই ফিরবে। তোমার কোনই বিপদ হবে না। সব সময় মনে রেখো—আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি। শুধু তোমারই জন্যে। সব সুখে দুঃখে বিপদে।

দুজনেই একটুক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু দূরে কোথায় একটা বড় ঘণ্টা ঢং ঢং করে কথা কয়ে উঠলো। দেবলকে এখনি উঠে পড়তে হবে। সময় নেই।

হায়, ওরে মানবহৃদয়!

যাবার মূহূর্তে দেবল ওর কানে শুধু বলল,—মনে রেখো, ভালবেসো।

অনন্তকাল ধরে দেবল এমন করেই বলে যেতে পারত। কিন্তু কই সে অনন্তকাল? দূরের ওই ঘড়ির ঘণ্টাই যে একমাত্র সত্য।

মিতা কিছুই বলতে পারল না। ঠোঁট জড়িয়ে গেল। মুখ বুজে গেল; চোখ গেল আবছা জলে ভরে। শুধু ফিসফিস করল—বীর আমার!

হঠাৎ কে যেন পিঠে হাত দিল। মিতা নাকি? না, সে জানে যে মিতা হতে পারে না। তবু ভাবতেও ভাল লাগে! কিন্তু ভাববার সময় নেই।

সে মুখ ফিরিয়ে দেখল ক্যাপ্টেন জো—সটান দাঁড়িয়ে উঠে স্যালুট করে বলল—ইয়েস সার। জো'ও পাল্টে স্যালুট করে সম্মান দেখালো। সভ্য সমাজে এটাই নিয়ম। তুমি যত বড়ই হও না কেন, সম্মানের বদলে সম্মান না দেখালে সেটা গ্রহণ করাই হল না।

—শোন দেবল, এখন আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি শুধু তোমার ও. সি. অফিসার কমাণ্ডিং নই। এস, এখানে একটু খোলা বাতাসে বসা যাক।

ওরা দুজনেই লাইফ-বোটের উপর কাঠের পাটাতানে মুখোমুখি হয়ে বসল।

—বল ত দেবল, তোমার মন এত ভারী হয়ে আছে কেন?—

কোন উত্তর নেই।

—বল ত, তুমি এত গম্ভীর হয়ে পড়ছ কেন? আমি ত জানি তুমি ভয় কর না কাউকে। না জাপানীকে, না জলে ডুবে মরাকে। তবে?

কোন উত্তর নেই।

—আমায় তুমি ক্ষমা করো দেবল, তোমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা

তুলছি। কিন্তু এখন আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে ভদ্রতার বেড়াজাল কেটে ফেলতে বাধা নেই। তোমার জীবনে কোন নারী আছে। তাই না?

কোন উত্তর নেই।

—আমি ভাবছি যে তোমার যদি অন্য কোন চিন্তার কারণ থাকত তা হলেও ভাল ছিল। সবচেয়ে বেশী ডুবিয়ে দেবার মত, মাতিয়ে রাখবার মত চিন্তা হচ্ছে নারী। কিন্তু মাপ কর দেবল, অনেক পুরুষের জীবনেই তা ঘটে থাকে। তাই বলে কি নিজেকে এরকম ভাবে রিক্ত করে, সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে রাখে কেউ?

এতক্ষণে দেবল উত্তর দিল। খুব নীচু স্বরে বলল,—আমি ত সব কিছুই ঠিকমত করে যাই। তাই নয় কি ক্যাপ্টেন?

—অবশ্য, অবশ্য—তাড়াতাড়ি জো তাকে আশ্বস্ত করল।

—তবে কেন আমি নিজের অবসর সময়টুকু ইচ্ছামত যা নিজের ভাল লাগে তাই নিয়ে মনে মনে আনন্দ করবো না? বেদনা পাব না? কেন ভাবনা করার অলস বিলাসটুকু থেকে পর্যন্ত নিজেকে বঞ্চিত করে রাখব?

জো হেসে ফেলল। বলল,—তুমি একটু বেশী বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা কর। সেটাই হচ্ছে বিপদ। তাই তোমার সুইট হার্ট বা যার চিন্তা কর তার কথা ভাবাটাকে অলস বিলাস বলে জিনিসটা চাপা দিতে চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। পৃথিবীটা দেখেছিও অনেক বেশী। আমার কথাটা তুমি শোন।

—কিন্তু আপনার কথা, আপনার অভিজ্ঞতা কি আমার বেলায় খাটবে? আপনাদের দেশে অনেক জিনিসই বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা। একেবারে যেন সারি-বাঁধা সেপাই। এই যে নাচঘরে এত হুল্লোড় চলছে, এত রঙ্গরস। ওরা সবাই কি নিশ্চিন্ত মনে স্ফূর্তি করছে? অনেকের মনেই হয়ত আছে কাঁটা, অনেক ব্যথা। অনেক রক্তঝরা। তবু ওরা নাচছে। কিন্তু আমরা পারি না।

—পার, চেষ্টা করলেই পার। চেষ্টা কর না উরায়ম সিংয়ের মত দিলখোলা হতে? সব কিছু ভাবনা, সব পিছুটান আজকের দিনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে হেসে নিতে?

—সবাই পারে না সব কিছু করতে।

—না পারুক। তবু মুখোশ পরে থাকে। আজকের সভ্য জগতে মুখের চেয়ে মুখোশের দাম কম নয়।

বলতে বলতে জো'র মুখোশ যেন একটু আলগা হয়ে গেল। ওর মুখের চেহারা আঁধারে ঢাকা ছিল, কিন্তু গলার স্বর যেন একটু হোঁচট খেয়ে গেল।

দেবল সেটা লক্ষ্য করল। বলল,—ক্যাপ্টেন, আপনি আমায় বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন। সেই সাহসেই বলছি যে আপনারও মনে নিশ্চয় একটা মুখোশ পরানো আছে হয়ত।

—যদি বলি 'হাঁ', তা হলে কি তুমি খুশী হও?

– না। খুশী হই না। ভারী গলায় দেবল বলে চলল, আমি খুশী হই না। আগেকার দিনে অন্ততঃ আমাদের দেশে মানুষ ছিল সহজ। ছিল স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মে গড়া। বাসনায় ঘেরা। আপনাদের পশ্চিমের ছোঁয়াচ লেগে আজ সে বাসনায় বেদনার খাদ মিশে গেছে। এ যুগে যাকে ভালবাসি সে শুধু স্ত্রী নয়, সখী। বাইরের সংসারে মন নিয়ে টানাটানির প্রতিযোগিতায় সে শুধু বৌ হবে না। তাব আগে তাকে হতে হবে বান্ধবী। তাই মনে যাকে পেয়েছি তাকে আপন ঘরে পাবার আগে কত দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

– কিন্তু তা নিয়ে তোমার দুঃখ পাবার কোন কারণ ঘটেছে নাকি? অবশ্য তুমি যদি কোন সংকোচ বোধ কর, আমরা অন্য যে কোন বিষয় নিয়ে কথা কইতে পারি। মোট কথা চাঁদের দিকে চেয়ে থেকো না।

—আপনার কথাই বলুন জো। আমি আমার নিজের মনকে এখনো খুব ভাল করে চিনি না, জানি না। তাই আপনার কথা বলুন।

—না দেবল, তোমার কথা বল। তোমার মনে এসেছে জোয়ার। যদি তুমি বাঁধ কেটে না দাও তা হলে তোমারই দুকূল ভেসে যাবে।

দেবল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

জো খুব সস্নেহে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল,—আমি সব বুঝেছি, দেবল। তোমার কিছু বলতে হবে না; ভেরি সরি, ওল্ড বয়।

এতক্ষণে দেবল বলল, না—আজ সব কথা বলতেই হবে। অন্তত

একজন ত আমার কথা জেনে রাখুক। আপনাকে তার ঠিকানাটাও জানিয়ে দেব, জো। যদি কখনো দরকার হয় আমার এই হাতঘড়িটা সেখানে পাঠিয়ে দেবেন।

—আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন আগের কথাটুকু বলে যাও।

দেবল শুরু করল,—আমি তখন এম. এ. পড়ি। ছন্নছাড়া ঝড়ো কাকের মত ঘুরে বেড়াই। কারণ সেটাই আমাদের ফ্যাসান। তা ছাড়া কিসেব জন্যই বা ভদ্রস্থ হতে যাব। চালচুলো ত নেই।

একদিন দক্ষিণ কলকাতা থেকে ট্রামে উঠছি। লেডিস সীটে বসে একটি মেয়ে। আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে। চার পাশে এলোমেলো লোকেব ভিড়। তার মাঝে এই ছিমছাম তরুণীর সামনে ট্রামের ডাণ্ডি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ছিল না কোন লজ্জা, কোন সংকোচ। কে-ই বা আমায় চিনছে?

সেইজন্যেই তার দিকে তাকিয়ে থাকা সহজ। দেখলাম যে তার নজরও আমার দিকে এসে পড়েছে। এমনিতেই। সম্পূর্ণ অকারণে চাঁদের আলো যেমন করে সব কিছুর উপর এসে পড়ে। কোন বাছ-বিচার করে না। তার চাহনির মধ্যে আমার প্রতি কোন ঔৎসুক্য বা মজা বা ঘৃণা কিছুই ছিল না। কিন্তু ভগবান জানেন, কেমন করে সে আমার দিকে তাকাল!

—খুব আশ্চর্য ত। প্রথম দর্শনেই?—জোর প্রশ্নে আশ্চর্যের চেয়ে দরদই বেশী ফুটে উঠল।

—না, না, প্রেম নয়। কি রকম একটা নিষ্কৃতির ভাব ছিল তার চোখে। যেন ওইসব লোকের মাঝখানে একমাত্র আমিই-সেই লোক যার চাহনিতে নেই কোন জড়তা, কোন নোংরামি। যেন আমার চোখে আছে শুধু সাগরপারের পরিচ্ছন্ন বালির রাশি। যেন তারা তরুণীর আঁখিতারাতে ঘুমন্ত সাগরের নীল জলটুকুকে খুঁজছে। আমার হাতের নখের কোনায় লেগে আছে কালি, পরণের শার্টের কলারে ময়লা, বুকের উপর ভাঙ্গা বোতামের টুকরো। কিন্তু অজানা আমার পরিচয়ের মধ্যে এসব খুব তুচ্ছ হয়ে দাঁড়াল। একটা গাছপাকা ফলের গায়ে যে ধুলোটুকু লেগে থাকে তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। একটি দরদী হাতের নরম আঙুল দিয়ে ঝেড়ে নিলেই চলে।

তার দৃষ্টির প্রসন্ন আলো যেন আমায় জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগল। যখন সে নেমে গেল, মনে হল যেন সে আমায় ছেড়ে চলে গেল। এই ইতর সংসারের নোংরা ভিড়ের মধ্যে একলা ছেড়ে চলে গেল। আমাকে—সদ্য ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা আমাকে।

একটা অজানা টানে আবার পরের দিন খুঁজে খুঁজে সেই ট্রামে উঠলাম। তরুণীও তাতে চলেছে। তার সামনে আবার কথাটি না কয়ে ট্রামের ডাণ্ডি ধরে দাঁড়ালাম। এবার মনে হল যে দাড়ি কামান হয়নি। কুঁচকে যাওয়া শার্টটির কলার তাড়াতাড়ি 'গলার উপব উল্‌টিয়ে তুলে দিলাম। যতটা ঢাকা যায়। একবার একটু বসবার জায়গা হল। কিন্তু বসতে সাহস হল না। কি জানি যদি তুমড়োন চপ্পলটা তার নজরে পড়ে যায়।

সে ঠিক আগের দিনের মতই তাকিয়ে রইল। সে চাহনির মধ্যে ভাষা আছে, ধ্বনি নেই। আছে আশ্বাস, তবু নেই আশা। সে যখন নেমে গেল, তার বসার সীটের মাঝখানটা চাপ পেয়ে বসে গিয়েছিল। সেই বসে-যাওয়া আসনের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম।

জো এতক্ষণে কথা কইল,—তুমি বোধ হয় রাতারাতি কলেজের ছোকরা থেকে পৃথিবীর মানুষে পরিণত হয়ে গেলে।

—না, ঠিক তা নয়। আপনি কি কখনো দেখেছেন গাছে কেমন করে আস্তে আস্তে পেয়ারায় রঙ ধরে? সে যে কী রহস্য তা কি করে বোঝাব? মাটির গহ্বরে আমি সোনার খনি খুঁড়ছি। কোদাল চালাতে চালাতে হঠাৎ দেখলাম একটা জায়গা চিকচিক করে উঠল। সোনার গুঁড়ো নয়, একেবারে নিখাদ সোনার মূর্তি একটা। সেই সোনার রঙ আমার কাঁচা পেয়ারার সবুজ রঙকে সোনায় ভরে দিতে লাগল। ওর চাহনির উত্তাপে আমার মধ্যের কলেজের ছোকরা ধীরে ধীরে যৌবনের রসে পেকে উঠল। আমি নিজের দিকে নজর দিলাম। অন্য সবারই নজরে পড়লাম। কি যেন মায়াকাঠি সে বুলিয়ে দিল আমার সারা দেহে! সারা মনে।

ট্রাম গাড়ীটা যেন আমার বৈঠকখানা হয়ে উঠল। তখন আর সেখানে উঠে বসতে লজ্জা পাই না। চপ্পলের জায়গায় শান্তিনিকেতনী স্যাণ্ডাল।

ড্রমড়োন শার্টের জায়গায় পাটভাঙা পাঞ্জাবী। চুলগুলো মাথা থেকে এলোমেলো ভাবে ঝুলে না পড়ে পেছনের দিক ঠিকমত এঁটে থাকে।

অনেকবার মনে হয়েছিল যে এবার আমি ওর সঙ্গে কথা কইবার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিয়েছি। তবু পারিনি। বারবার গলাখাঁকারি দিয়েছি। ঠোঁট কেঁপে উঠেছে। তবু পারি নি!

—রূপকথার চেয়ে বেশী আশ্চর্য ঠেকছে। কিন্তু এই ট্রামে যাওয়া-আসার শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হল জানতে ইচ্ছে করছে—মৃদু স্বরে বলল জো।

—আস্তে আস্তে পরিচয় করবার বাসনা দানা বেঁধে উঠল। তবু মনে নেই সাহস, নেই ভরসা। কি পরিচয় দেব? কলেজের ফিফ্থ ইয়ারের ছাত্র। ছ্যা:, সেটা কি একটা পরিচয়? বাড়ীতে বাবার হোটেলে পান্ত আনতে নুন ফুরোয়। সেটা কি একটা পরিচয়? সন্ত জেগে ওঠা মানুষ নিজের স্থিতি, নিজের অস্তিত্বের জন্য পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু আপনি বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকের চাকরির বাজারের খবর জানেন না, জো। কুচো চিংড়ির ভাগার দামও তার চেয়ে বেশী।

জো বলে উঠল,—আহা! শিক্ষিত লোকের অবস্থা দেখে মনে হয় কলেজগুলো উঠিয়ে দিলেই ভালো। শুধু হাতুড়ি-পিটিয়েতে ভরে থাক পৃথিবী। অবশ্য আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের অপমান এখনো এত দূরে গড়ায় নি। যাই হোক, তোমার কথা বল। তুমি শেষ পর্যন্ত কি করলে?

—দুয়োরে দুয়োরে নো ভেকান্সির নোটিস লটকানো। বাপের পয়সায় আর ক'দিন স্যাণ্ডাল আর পাঞ্জাবি চালান যায়? মরিয়া হয়ে একদিন ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম মেয়েটির পিছু পিছু। সাহেবপাড়ার বুকে একটি নতুন খোলা ক্লাবের দরজা পর্যন্ত তার পিছনে গেলাম। দেখলাম আমার শ্যামল দেশের শ্যামা মেয়েটির আদর। মহিলা-রিসেপ্‌শনিষ্টের ব্যক্তিত্বের আলো সবার চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে। তার কাছে ঝকঝকে তারা আর মুকুট মার্কা মিলিটারী অফিসাররা নিজে থেকে বিনয়ে নীচু হয়ে ভদ্রতায় গলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পথ খুলে গেল সামনে। আমিও—অমন করেই ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

—নট এ রাইস সোলজার, এহ্? তুমি তা হলে শুধু পেটের দায়ে মিলিটারীতে আস নি? —জিজ্ঞেস করল জো।

—না। মোটেই নয়। ডালহাউসী স্কোয়ারে ঠাঁই হোল না বলেই যে ফোর্ট-উইলিয়ামে গেলাম তা মোটেই নয়। জানতাম যে দলে দলে ভারতীয়রা ব্রিটিশের সৈন্যদলে নাম লেখাচ্ছে। কংগ্রেসীবা বলছে তার কারণ হচ্ছে অভাব অনটন। সে কথা অঠিক নয়।

কিন্তু আমি দেখলাম যে শুধু কলম পেশাব কারবাবে আমাব পোষাকে না। এই নতুন জেগে ওঠা ব্যক্তিত্বতে শুধু কলমের খোঁচায় প্রকাশ করতে পারব না। মনের ঘোড়া ছুটতে চায় বিশ্ববিজয়ে। তাকে কি করে ঘরের কোণায় বেঁধে রাখি কলুর ঘানিতে?

—তাই একদিন বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে চলে গেলাম রিক্রুটমেন্ট অফিসে। সেখানকার যাচাইয়ে পাস করে গেলাম সিমলায় ইণ্টাবভিউ দিতে। ভেতো, তেলে জলে মানুষ দেবলা সিংহির নতুন জন্ম হল।

জঙ্গী অফিসাবের ট্রেনিং-এর ফাঁকে ছুটি নিযে কলকাতা এলাম। বিকেল হতেই ছুটে গেলাম সেই ক্লাবে। ট্রামে নয়, ট্যাক্সিতে। বেচারী ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কত বকশিশ দিলাম জানি না। কিন্তু সে এমন করে তাকিয়ে রইল যে রিপেস্‌শনিস্টের নজব এড়াল না। ট্যাক্সিটা সরে যেতেই তার সামনা-সামনি দাঁড়ালাম আমি। সামনা-সামনি। একেবারে মুখোমুখি।

অমনি প্রশান্ত চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। অমনি লেপা পোঁছা নিরাসক্ত চাহনি।

কিন্তু আজ সে চাহনি আমাব বুকে তুড়ুং ঠুকতে লাগল। শুনতে পেলাম কানে উইনচেস্টার রিপিটার বাইফেলের অনববত গুলি ছোড়ার আওয়াজ। আমার বুকটাকে যেন কোর্ট-মার্শাল কবে দাঁড করানো হয়েছে খোলা দেওয়ালের সামনে। তার চোখ দুটি যেন বন্দুকের দুটি চোঙ্গা। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল। মাথার টুপিটা নামাতে ভুলে গেলাম।

সে-ই আমায় স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিল। কত অতিথি আসছে। এক-জনের পর একজনকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। কে কোন্ ঘরে যেতে চায়, কাকে খুঁজছে, তার তদারক করতে হবে। ক্লাবে ঢুকতেই স্বাগত করছে যে

তরুণী তার কত কাজ। তারই মধ্যে আবার ভদ্রতা করতে হবে। ছুঁড়ে দিতে হবে দু-চারটে মিঠে কথা, খুশী-করে-দেওয়া হাসি। তার সাগর-বেলায় দেবলই ত একমাত্র ঝিনুক নয়?

ঝিনুক নয়, কিন্তু শঙ্খ। এই প্রথম ক্লাবে ঢুকেছি আমি। চিনি না কাউকে। সভ্যও নই। তবু মরিয়া হয়ে চলে এসেছি। সাময়িক সভ্য হিসাবে দরখাস্তে সই করেছি। ম্যানেজার 'বার'-এ নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। নতুন সভ্যকে সবাই হৈ হৈ করে অভিনন্দন করল। সবাই তার খরচে তার কল্যাণে এক পেগ করে হুইস্কি খেল। কিন্তু আমি নিলাম শুধু নিরেমিষ লেমন বার্লি।

—ছোঃ, লেফটেনাণ্ট সিন্‌হা, তুমি তোমার ইউনিফর্মের অসম্মান করেছ এই সব্‌জি-পানি নিয়ে। 'বার'-এর কাউণ্টারে হাতের চেটো ঠুকে সবাই আপত্তি জানাল। রিসেপ্‌শনিষ্ট যেখানে থাকে সেখান থেকে 'বার'টা দেখা যাচ্ছিল।

জয়ের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে আমি চটপট জবাব দিলাম, -সবাই বলে যে হুইস্কি হচ্ছে সবার সেরা পানীয়। কিন্তু আমি কি এমন পুণ্য করেছি যে সবার সেরা পানীয়ের যোগ্য হব?

মাথার উপরে শূন্যের দিকে গ্লাস তুলে ধরে একজন বলল,—আমাদের নতুন সভ্য আমাদের এই সব দুষ্টু সভ্যদের লজ্জা দিচ্ছেন। একটুখানি নেশা না করলে উনি আমাদের রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে দেখবেন কি করে?

মাথাটা সামনের দিকে নুইয়ে 'বাও' করে হাসলাম। ডান হাতটাকে আধখানা চাঁদের মত ঢেউ খেলিয়ে উত্তর দিলাম,—আমার দুটো চোখই এখানে ঢুকে রঙীন হয়ে গেছে। বাইরের কোন জিনিসের সাহায্য নেবার দরকার হবে না একটুও।

নক্সা-কাটা কালো সার্টিনের কাট-ছাট চোলির উপরে একটি এনামেল-করা সুন্দর মুখের অনুযোগ এল এবার,—আমাদের বীরটির চোখ না হয় রঙীন হয়ে আছে, কিন্তু মনকেও ত রাঙিয়ে নিতে হবে।

আমি এবার আরো ঝুঁকে পড়লাম। মধ্যযুগের নাইট এ যুগের ব্যাটল-ড্রেসের আঁটসাট বাঁধন উপেক্ষা করে প্রায় হাঁটু গেড়ে ফেলল। বললাম,—

ওগো প্রিয়া মহিলা, সবচেয়ে বড় নেশা যে প্রেমের নেশা তাতেই আমার মন রঙীন হয়ে আছে।

চোলির পাশেই দাঁড়িয়ে টলছিল সম্ভবত: তার স্বামী। তাকে চোলি এবার পাকড়াও করল,—এই দেখ। মিলিটারী অফিসার, তবু মদ না খেয়েও কেমন অভিনয় কবছে নেশা করার। আর তুমি? হ্যাঃ!

জড়ানো স্বরে সঙ্গী জবাব দিল,— হোয়াট্ হ্যাঃ? ও ত প্রেমে পড়েছে। তাই নেশা হওয়ার অভিনয় কবছে। কিন্তু আমি অভিনয় করব কি দুঃখে? আমি করব নির্জলা নেশা।

বলেই সঙ্গী ঠক কবে গেলাসটা কাউন্টাবে ঠুকে দিল। অর্থাৎ আবার ভরে দাও।

হঠাৎ চোখ মুছতে মুছতে চোলি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি সেদিন অনেক দেরিতে ক্লাব ছেড়ে বের হলাম। খেয়াল রেখে-ছিলাম অভ্যর্থনাকারিণীব কখন ছুটি হয়। দেখে দেখে ঠিক সেই সময়ে বের হয়ে পড়লাম। নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে আমরা দুজনে যাত্রী।

কখনো একটা স্বপ্নকে হেঁটে চলতে দেখিনি। সেই প্রথম দেখলাম। সে ত শুধু পথে নয়, আমার মনেব উপব দিয়ে ফুলের পাপড়ি বিছিয়ে-বিছিয়ে হেঁটে চলেছে। কথা হয়নি এমন কিছু। আমার মন ছিল ভরে। তার মনে হয়ত এসেছিল ভীরুতা। আমার এই পরিবর্তন কেন হল, কেমন করে হল তা বুঝতে তাব একটুও বাকী ছিল না।

বোঝা কি হয় শুধু বাক্য দিয়ে?

সেই লাইনের ট্রামে আবার আমবা উঠলাম। সেই রাতে তার বাড়ীর সামনে যখন বিদায় নিয়ে এলাম, সে শুধু বলল,—বীর আমার!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দেবল অস্ফুটস্বরে বলল,—এই কথাটুকুই সে আবার শেষ বলেছিল আমাদের শেষ বিদায়ের সময়।

কিন্তু দেবলকে স্মৃতিব ভারে ভেঙ্গে পড়তে দেওয়া চলবে না।

তাই জো যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। বলল,—শীগ্‌গির ফিরে চল নাচঘরে। না হলে লোকে বলবে তুমি একটা পাঁড় নীতিবাগীশ। ছ্যাঃ, সে বড় লজ্জার কথা। নাও, তোমার মুখোশ পরে নাও।

ওরা দুজনে নাচের জলসায় ফিরে এল। তখন একটু বিরতি চলেছে। কিন্তু খুব বিবেচনা করে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নাচ চলছে না বটে, কিন্তু খেলা চলেছে। মজার খেলা—সঙ্গী-সঙ্গিনী নিয়ে। নেশা যেন না কেটে যায়।

গোল করে সারি সারি চেয়ার সাজানো হয়েছে। যারা হয়রান হয় নি বা নাচতে নামে নি তাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। এই দলে যতজন আছে তার চেয়ে একটা কম চেয়ার। পিয়ানো বাজছে টুং টাং আর সবাই লাইন বেঁধে বাজনার তালে পা ফেলে নাচের ঢঙে চেয়ার দিয়ে বানানো গোল বৃত্তের চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে। যেই হঠাৎ বিনা নোটিসে পিয়ানো থামবে অমনি যে যার কাছের চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু পুরুষরা আগে নিজের বাছাই করা সঙ্গিনীর চেয়ার পাবার বন্দোবস্ত করে তারপরে নিজেরা বসবে।

একটা কম চেয়ারের জন্য একজন অবশ্যই বাদ যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা চেয়ারও সারি থেকে ছাঁটাই করা হবে। কাজেই আবার বাজনা শুরু হয়ে নেচে চলার মাঝখানে হঠাৎ যখন থেমে যাবে তখনো চেয়ার থাকবে একটি কম। কাজেই আরো একজন পড়বে ছাঁটাই।

এমনিভাবে ছাঁটাই হতে হতে শেষ পর্যন্ত যে তার সঙ্গিনীকে বজায় রেখে শেষ যুগল হয়ে দাঁড়াতে পাবে তার নামে টোস্ট করা হবে। অর্থাৎ তার উদ্দেশে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে একটু পানীয় চেখে নেবে।

খুব নিরীহ খেলা। সবচেয়ে খুঁতখুঁতে শাস্ত্রমানা পণ্ডিতেরও আপত্তির কারণ নেই। জো দেবলকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল এই ঘুরপাকের মধ্যে,—মুখোশটিও মুখের চেয়ে কম দরকারী নয় দেবল।

মনে মনে নিজেকে সমঝিয়ে নিল দেবল।

কিন্তু ওর বরাত নেহাতই মন্দ। না হলে এত লোক থাকতে কিনা দেবলই হল সবার প্রথম। অর্থাৎ সবার শেষ। দল বেঁধে সবাই ওয়াইন গ্লাস তুলে ওর নামে টোস্ট পান করল।

বিজয়ের গর্বে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে নিল ওর সঙ্গিনী। মুখখানা যেন একটু বেশী কাছে নিয়ে এল দেবলের। আরো বেশী কাছে।

না, 'বক্সিং ডে' অর্থাৎ বড়দিনের পরের দিনের উৎসব নয়। সেদিন নাচের ঘরে মাথার উপর ঝোলানো থাকে বিলাতী মিসিল্‌টো গাছের ডালপালা। তার নিচে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে হলে চুমু দিতেই হবে। কিন্তু আজ তো সে সব নেই। চুমু খাবার অবাধ অধিকারও নেই সেজন্য।

তবু—তবু—পায়ের নিচে দুলছে সমুদ্র. কাঁপছে জাহাজ, নাচছে অর্কেস্ট্রার বাজনা। মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যে রাতটুকু বেঁচে আছে তার মাশুল যদি আদায় করে নিতে চায় তরুণী ? আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ?

ফিরাইব এই মুখখানাকে কেমনে ?

হাসিমুখে টুক করে এগিয়ে এল উবায়ম সিং। দুজনের মাঝখানে পাগড়ীখানা প্রায় গলিয়ে দিয়ে খুব মিঠে, খুব মাঝামাঝি ভাবে ভরা স্বরে বলল,—হ্যালো হনি (মধু), পরের নাচটা তুমি আমার সঙ্গে নাচবে এই আমার প্রার্থনা।

ছয়

সিঙ্গাপুরে সিংহের গুহায় ওরা এসে পড়লো শেষ পর্যন্ত। জাপানী সিংহ চারিদিকে ছেঁকে ধরেছে।

—একচক্ষু হরিণের গল্প জানেন, স্যার ?

হঠাৎ দেবল এই প্রশ্ন করে বসল। ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাণ্ডা পালাই পালাই করছে। তবে বসন্ত আসছে বলে নয়। জাপানীদের আকাশী বোমার গরমে। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন এসে দমকা বোমা ঝরিয়ে যায়। আজ থেকে আবার দ্বীপের ওপারে মালয়ের মাটি থেকে ওরা সিঙ্গাপুরে গোলা দাগছে। চারদিক বারুদের গন্ধ, কামানের ধোঁয়া আর ভয়ের ভূতে ভরা। ওদের পিছনে সিঙ্গাপুর শহরের উপর দমাদম গোলা পড়ছে। বড় বড় বাড়ীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

রাতে পাহারাদারী কাজে জো'র দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে এই সেক্টরে অর্থাৎ টুকরো জায়গাতে পাঠানো হয়েছিল। ট্রেঞ্চের গর্তে শুয়ে পাহারা দিতে হবে। আর কতদূর থেকে, কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসছে তা নজর করতে হবে। ওখান থেকেই টেলিফোনে খবরগুলি 'সিয়াক' কমাণ্ডের কাছে জানতে হবে।

এই জায়গাটা একটু বেশী রকম মারাত্মক। আগে আরো যে ক'টি দল পাঠানো হয়েছিল সবাই দূরপাল্লার গোলার ঘায়ে শেষ হয়ে গেছে। সেজন্য কেউ আসতে চায় না। অষ্ট্রেলিয়ানরা বলল যে এ পর্যন্ত শুধু তাদের মাঝ থেকেই লোক পাঠান হয়েছে। তারা নিরীহ গোবেচারার মত মরছে। কিন্তু তারা লড়াই করতে এসেছে। মরতে নয়। অতএব তারা আর এর মধ্যে নেই।

ব্রিটিশ কর্তারা মাথা নাড়লেন। সত্যিই ত। একেই অষ্ট্রেলিয়ার উপর জাপানীদের চোখ খুব বেশী। তার উপর জাতভাইরা যদি সব মরেই যায় এমন করে ? দেশটা তা হলে থাকবে কাদের জন্যে ?

আর ব্রিটিশ সৈন্যরা ? না, ওদের সবারই খুব জরুরী কাজ আছে হেড-

কোয়ার্টার্সে। যেখানে ঘাঁটির কেন্দ্র সেখানেই ত কাজ। তা ছাড়া ওই বাঁটুল দুশমনের মন এত নীচু যে ইংরেজ দেখলেই ওদের মাথায় খুন চেপে যায়।

কিন্তু চল্লিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য সিঙ্গাপুরে আছে কিসের জন্য? ওরা এত সাহসী যে নিজেদের ওরা জোয়ান বলে ডাকে। এবার তা হলে জোয়ানরাই জাপানী ঠেলা সামলাক।

তা ছাড়া হঠাৎ কয়েকটা জঙ্গী জাহাজ এখানে এসে পৌঁছাচ্ছে। যাতে সব মেমসাহেব আর তাদের ছেলেমেয়েদের গোপনে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের সঙ্গেও ত পাহারাদার হিসাবে কিছু ইংরেজ অফিসার প্রভৃতি পাঠাতে হবে।

তাই দেবল, উরায়ম, রবিনকে বেছে বেছে ডেভিল্‌স্ সেক্‌টরে পাঠানো হল। ওরা গত ক'দিন জাহাজে মজাসে আরাম করেছে। 'সিয়াক' কম্যাণ্ডের একজন স্টাফ-অফিসার ওদের খবরাখবর নিচ্ছিল। জাহাজের খবর পেয়ে তার মুখটা লাল হয়ে গেল। ওদের বদলে সে নিজে যদি জাহাজে করে পালাবার মোকা পেত কত মজাই না হত।

এ যে যমকে ফাঁকি দিয়ে জীবনের সঙ্গে অভিসার।

তায় আবার মেমসাহেবদের সঙ্গে ফ্যান্সি ড্রেস পরে নাচ? কেন, সংসারে সায়েব বীরপুরুষের কি অভাব পড়েছিল? তাই তার মুখের লাল রঙটা একটু যেন কালচে হয়ে গেল।

দাঁত চেপে বলল,—বেশ ত। ক'দিন আরাম করে নিয়েছ। এবার ডেভিল্‌স সেক্‌টরে পড়ল তোমাদের কাজ। রাজরিফ (রাজপুতনা রাইফেল্‌স্) থেকে তোমাদের সঙ্গে কিছু 'জোয়ান' দেওয়া হবে। আর জো, তোমাকে থাকতে হবে এইখানে। এই ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগা-যোগ রাখতে সুবিধা হবে তা হলে।

সেই ডেভিল্‌স্ সেক্‌টরের ট্রেঞ্চে সারা রাত উপুড় হয়ে, চিৎ হয়ে, না হয় হামাগুড়ি দিয়ে এদিক থেকে ওদিক যাওয়া-আসা করে ওরা পাহারা দিয়েছে। জো'ও শেষ পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিল। নিজেই পাহারার কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। নিজে থেকে সব বিপদে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

তাকে দেবল জিজ্ঞেস করলে, একচক্ষু হরিণের গল্প জানেন, স্যার?

জো জানতো। চারিদিকে জাপানী শেলের গোলা আর আগেকার সৈন্যদের মৃত্যুর চিহ্ন ছাড়ানো। তবু বলল,—ঠিক যেন মনে পড়ছে না। বলত খুলে।

দেবল বলল। ঈশপের গল্পের হরিণটার একটা মাত্র চোখ ছিল। সেই চোখটা দিয়ে যে ডাঙ্গার দিকে নজর রাখত। কখন কে এসে ওকে মারতে চায়। কিন্তু শিকারী এল নৌকায়, জলের উপর দিয়ে। সেদিক সম্বন্ধে হরিণের চিন্তা ছিল না, তাই কানা চোখটা সেদিকে রেখেছিল। মরণও এল সেদিক দিয়ে।

দেবল বলল,—স্যার, লণ্ডনের সামরিক কর্তারাও একচোখো হরিণ। সমুদ্রের তিনদিকে এত ঘাঁটি, এত লড়াইয়ের বন্দোবস্ত। পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা খরচ হল। কিন্তু ডাঙ্গার দিকে একটা কামানকেও ঘুরিয়ে চালানর বন্দোবস্ত নেই। সেদিকে আত্মরক্ষার কোন দরকারই মনে করেন নি কর্তারা। এমন কি যথেষ্ট খাবার জল পর্যন্ত নেই সিঙ্গাপুরে।

জো ফিসফিস করে বলল,—চুপ চুপ। আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু লড়ে যাওয়া।

—শুধু লড়ে যাওয়া? ভুল রণকৌশল, ভুল বন্দোবস্তগুলো কর্তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব না? তা হলে যে অধর্ম হবে। এত লোক মরছে। এত খরচ। স্বাধীনতা নিয়ে, দেশ নিয়ে লড়াই। তবু ভুল দেখিয়ে দেব না?

—তোমারই যে ভুল হয়নি সে কথা কি করে জানলে, দেবল? এ নিয়ে তোমার চেয়ে অনেক বেশী মাথা ঘামিয়েছে যারা তাদের হাতেই সে ভার থাকুক।

—না, কিছুতেই না। আজ ডেভিলস্ ট্রেঞ্চে মরতে তৈরী আছি। কিন্তু ভুল যে হয়েছিল সেটা বোঝান দরকার। সেটা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। সামান্য অফিসারদের যদি ভুল হয়ে থাকে সেটাও কর্তারা বুঝিয়ে দিন।

—অর্থাৎ সবার সঙ্গে তর্ক করুন?—হেসে ফেলল জো।

—তর্ক? না, তর্ক অবশ্য নয়। তবু আমাদের প্রত্যেকেরই ত চিন্তা করতে হবে।

রবিন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এখন বাধা দিল। দেবলকে মনে স্মরিয়ে দিল টেনিসনের কবিতার লাইনগুলি। রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ভুল করে একটা হুকুম দিয়েছিল ইংরেজ সেনাপতি। ভুল জেনেও সৈন্যরা এগিয়ে গেল মরতে। সবাই মরল, কিন্তু অমর হয়ে গেল।—

"কেন তা শুধাতে নাহি কোন অধিকার,
আছে দাবী শুধু মারা আর মরিবার।"

মাথার উপর দিয়ে থেকে থেকে দূরপাল্লার গোলা চলে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুরের সিংহদ্বারে শত্রুর আনাগোনা চলছে। মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা বই কি! সময় বুঝে একটা 'শেল' কাছেই ভীষণ শব্দ করে ফেটে পড়ল। তার ঘায়ের চোটে একরাশ ধুলো-বালি ওদের ঢেকে দিল।

দেবল ক্ষেপে গিয়ে বলল,—সেটা খুব ভুল। ওসব 'চার্জ অব দি লাইটব্রিগেড'-এর বীরত্ব নিয়ে কবিতা চলে, যুদ্ধ চলে না। আমরা আজ সিঙ্গাপুরে ইঁদুরের মত মরছি কেবল ইংরেজ ওয়ার-অফিসের কর্তাদের বোকামির জন্য।

জো বলে,—আমি ত কোন দিন মনে করি নি যে আমাদের দেবল মরতে ভয় পায়।

দেবল ভারী গলায় উত্তর দিল,—না, দেবল বাঙালী। সে মরতে ভয় পায় না। আমাদের ছেলেরা ভুঁইপটকার মত কাঁচা বোমা নিয়েই ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে যায়। আমরা তার বদলে পরেছি মিলিটারী ইউনিফর্ম, পেয়েছি হালের সেরা হাতিয়ার। মরতে ডরাই না আমরা। কিন্তু বোকার মত মরতে রাজী নই।

রবিন দেবলকে বাধা দিল। বলল,—দেবল, মিছে তর্ক করো না। তোমরা বাঙালীরা বড় বেশী চিন্তা কর। তাই তর্কও কর। হুকুম তামিলের আগে যাচাই করতে চাও। তাই তোমরা সৈন্য দলে নাম লেখালে বিপদ।

—কেন? ভুল হুকুম তামিল করলে যে তার চেয়ে বেশী বিপদ।

—তা হোক। হুকুম যাচাই করার দায়িত্ব তোমার নয়, হাকিমের। তুমি যখন হাকিম হবে তখন তোমার হুকুম ত সবাই বিনা বিচারে মেনে

নেবে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু লড়াই করা। ডিসিপ্লিন, মাই বয়, ডিসিপ্লিন। হিন্দুস্থানীর বদনাম করো না।

ফিল্ড-টেলিফোনের রিসিভারে হঠাৎ কথা ফুটে উঠল। ভাঙ্গা উচ্চারণে কে বলছে—ব্রিগেড-মেজরকে চাই, ব্রিগেড-মেজর।

জো চট করে বললে, · কেন? কি দরকার?

—এগিয়ে এস, চট করে সবাই বাইরে বেরিয়ে এস। তোমাদের বদলী দল এসে গেছে।

বদলী দল এসে যাওয়ার মানে আরো কিছু সময় বেঁচে থাকার পরোয়ানা। অন্ততঃ একটু বিশ্রাম। একটু খেতে পাওয়া।

ওরা চটপট নিজেদের জিনিস আর হাতিয়ার গুটোতে লাগল। উরায়ম আহ্লাদে আটখানা। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল।

রবিন বলল,—অত খুশী হয়ো না। এক লহমা ঘুমিয়ে নেবার আগেই আবার এখানে ছুটে আসবার পরোয়ানা এসে যাবে। মুখে-তোলা বিয়ারের টিনটা খতম করবার সময়ও হয়ত পাবে না।

কোনাকুনি করে কাঁধের উপর থেকে ঝোলান রয়েছে—বামুনের পৈতে নয়, ক্ষত্রিয়ের রাইফেলের গুলী রাখবার চামড়ার বেল্ট। সেটা আঁটতে আঁটতে উরায়ম বলল,—

হর, পরীকে উ বা—আশিক—ই—খুদ ইয়ার নীস্ত
তু ইয়াকীন মীদান কে হেচ্ অজ, উমর্ বর—খুরদার নীস্ত।

—তার মানে?

—তার মানের মধ্যে আছে আমার জীবনের দর্শনতত্ত্ব। প্রত্যেক পরীই নিজের প্রেমিককে পছন্দ করে না। আমার প্রেয়সীও এই বীরকে ভালবাসে না। না বাসুক। আমি জানি, জীবনকে কেউই পুরো চেখে দেখতে পারে না। তবু যেটুকু পারি সুখ করে নিই।

আঁকাবাঁকা ফালি ট্রেঞ্চ থেকে মাথা তুলবার আগে দেবল শুধু উরায়মের হাতে একটু জোরে চাপ দিল। উরায়ম তখনি সব বুঝে নিল।

মাথার উপর গোলা শোঁ শোঁ করে আকাশ চিরে শহরে গিয়ে পড়ছে। বোমারু বিমানগুলোর জুম-জুম আওয়াজে কানে তালা লেগে গেছে।

চারপাশে মেশিনগানের খেলা চলছে। এখানে মাটি ফুঁড়ে জীবনদর্শন বের করা আর যাকেই মানাক না কেন, উরায়মকে মানায় না। ওর কথা ভারী হয়ে উঠলে সবারই মন ভারী হয়ে উঠবে। মরণটাও হাল্কা মনে সেরে নেওয়া ভাল।

সে তাই চট করে বলে উঠল,—তার মানে হচ্ছে যে আমি পুরো টিন বিয়ার পাচার করে দিতে মোকা পেলাম কি না-পেলাম সে ভাবনাটাকে থাড়াই কেয়ার করি। টিনটা হাতে এসে একবার পৌঁছাক না। তার পর কি হয় তা থাকবে শুধু খোদার মালুম।

হঠাৎ কি ভেবে দেবল সবাইকে ট্রেঞ্চ থেকে উঠতে বারণ করল। উত্তেজিত হয়ে বলল,— একটু দাঁড়াও। আরেকবার টেলিফোনটা যাচাই করে দেখি।

এমন কর্তৃত্বের সুরে সে হুকুম চালাল যে কেউ কোন বাধা দিতে পারল না। জো পর্যন্ত অবাক হয়ে রইল।

—ব্রিগেড-মেজরের হয়ে কথা বলছি। আমরা উপরে উঠছি, কিন্তু একটু আলো দেখাও। আকাশে সবুজ আলোর বোমা ফাটাও দুয়েকটা। আমরা এখনি উঠে আসছি।

তারপর সবাইকে মেশিনগান সাজিয়ে রাখতে বলল। সবাই বিনা কথায় বিনা তর্কে তৈরী হয়ে পড়ল। এদিকে আকাশে সবুজ আলো (ভেরি লাইট) ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একদল জাপানীর কালো ছায়া ফুটে উঠল সে আলোর সামনে। খরর্ খরর্ করে দেবলদের মিডিয়াম মেশিনগান চলল। ওরা প্রাণে বেঁচে গেল।

এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল যে নিজেদের হেড-কোয়ার্টার্স থেকে বদলী দল এসেছে একথা বিশ্বাস করাটাই বোকামী হয়েছিল।

সবাই হুড়োমুড়ি করে দেবলকে অভিনন্দন করল। জো বলল,— সত্যি দেবল, আজ আমরা তোমার কাছে টুপী নোয়াচ্ছি। তোমার চিন্তাশক্তির জন্য ধন্যবাদ। তর্ক করা তোমারই সাজে।

খুব বিনীতভাবে দেবল বলল,—আমি মাপ চাইছি, স্যার। আর কখনো তর্ক করব না। আমি সব সময়ই নিয়ম মেনে চলব ; ডিসিপ্লিন মেনে থাকব।

এই মুহূর্তে সবাই যদি আমার কথা মেনে ট্রেঞ্চে অপেক্ষা না করত তা হলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যেতাম। আমারই মাপ চাইবার কথা।

রবিন চুপি চুপি দেবলকে বলল,—সাবাস বাঙালী সিংহ। তুমি সত্যিই সিংহ।

কিন্তু এই সব সাবাসের কথায় কান দেবার সময় ছিল না। দেবল জো'কে স্যালুট করে বলল, স্যার, এখন ওই জাপানীদের লাশ তালাশ করে দেখতে পারি কি? কিছু গোপন খবর মিলতে পারে। এখনো ভোর হয়নি। কিন্তু লাশ খুঁজে পাব। অথচ বোধহয় আমাদের শত্রুরা এখনো নজর করতে পারবে না।

জো হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেবলের হাতে জোরে ঝাঁকানী দিল। বলল,—তোমায় অভিনন্দন করছি, দেবল। এমন বিপদের মধ্যেও এত প্রশংসার মধ্যেও তোমার মাথা ঠিক রেখেছ। একটা টহলদারী দল নিয়ে তুমিই তালাশী কাজ করতে যাও।

কিন্তু সাবধানে যেয়ো। চারিদিকেই 'বুবি ট্র্যাপ' অর্থাৎ বারুদভরা ফাঁদ আছে। তাতে যেন পা দিয়ো না কেউ।

চারদিক শ্মশানের মত হয়ে আছে।

একটু পরে দেবলের দল ফিরে এল। সঙ্গে একজন বন্দী।

বন্দী? সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

জো বলে উঠল,—বন্দী? জাপানী বেঁচে আছে তবু বন্দী? বিশ্বাস করা শক্ত যে।

দেবল বলল,—হ্যাঁ, বন্দী বেঁচে আছে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

জো মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। কারণ ওদের সেনাপতির 'কম্যাণ্ড' হুকুমে লেখা থাকে—"যদি অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী হও তা হলে যখনি সুযোগ পাবে জিভটা গলার মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে দম বন্ধ করে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করো। কিন্তু তবু বেঁচে থেকো না।"

দেবল জিজ্ঞাসা করল,—ওকে এখন দোভাষীকে দিয়ে কিছু কথা বলাব কি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলাও। কিন্তু কিছুই বলবে না। হার আর জিত দুয়েরই একটি মাত্র উত্তর আছে ওঁদের। তা হচ্ছে মৃত্যু।

নিজের মনেই যেন জো বিড় বিড় করে বলতে লাগল,—কোন সাদা সৈন্য ওদের হাতে পড়লে তার নির্ঘাত মরণ। কিন্তু ওকে আমরা বাঁচিয়ে বন্দী করে রাখব। কারণ ও নিজেই মনে মনে মরতে চাইবে। মরতে চেষ্টা করবে।

বন্দী মাথা নীচু করে রইল। যেন প্রার্থনা করছে।

কেউ তখনো বোঝেনি যে হিস্টিরিযার তাডসে সে তখন পড়োপডো হয়ে রয়েছে। জো তার মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। নিজ হাতে সেটা ধরিয়ে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাই সরিয়ে নিল। দেশলাইয়ের আলো ও দুশমনের নজরে পড়তে পারে! এখনো পুরোপুরি দিনের আলো হয় নি।

তার বদলে প্রকাণ্ড মেস-টিনে এক কাপ চা দিল।

কিন্তু বন্দী চা খেল না। তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে কাঁপতে বেঁকে যেতে লাগল।

জো বলল,—ওর দিকে কেউ তাকিয়ো না এখন। ধড়ে একটু প্রাণ ফিরে আসুক।

এবার ওর মুখে চায়ের টিন তুলে ধরা হল। না খেয়ে উপায় নেই। দুয়েক চুমুক দিতে দিতে ওর চোখে আলো ফিরে এল। গোগ্রাসে চা গিলতে লাগল।

কিন্তু তার পরেই আবার আরম্ভ হল হিস্টিরিয়া। হঠাৎ সে জোরে দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরতে লাগল। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস উঠতে লাগল। শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল।

জো ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা নাকি মানুষ নয়, মেশিন। ওদের মন নেই। জাপানী সৈনিকের বর্ণনা যা সে শুনেছে তার সঙ্গে মিলছে না। বেচারীর দিকে তাকিয়ে জো'র একটু মায়া হতে লাগল।

ওর বীরমূর্তি যে মাটির কাঠামোর উপর রঙ চড়িয়ে গড়া তাও ধরা পড়ে গেছে। ওর ভিতরে আর কোন গোপনতা, কোন অজানা শক্তির উৎস

বাকী নেই। সামরিক পোশাকের খোলস গেছে খসে। এখন ও শুধু মানুষ। দুর্বল। অসহায়। একাকী।

তাচ্ছিল্য করে দোভাষী বলল,—ও ব্যাটা শুধু প্রলাপ বকছে।

কিন্তু জো শুনতে চাইল ও কি বলছে।

ও বলছে,—আমার মা আর বৌকে খবর দেওয়া হবে যে আমি লড়াইয়ে বীরের মত মরে গেছি। ইংরেজরা শিগ্‌গিরই হেরে যাবে। আমিও ছাড়া পেয়ে যাব। তবু·······

ওর পাঁশুটে মরার মত মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই ভাবল যে হো হো করে কেঁদে ফেলাও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল ছিল।

একটু পরে দম নিয়ে বন্দী আবার থরথর করে কাঁপতে লাগল। যেন বান-ডাকা নদীর জলকে পিপে দিয়ে তৈরী পণ্টুন ব্রিজের বাঁধ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এতগুলি হাতিয়ার-হাতে দুশমনের সামনে অসহায় বন্দী দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার যেন বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল।

দোভাষী বলল,—ও বলছে, বানজাই। বানজাই। জয় জয় সম্রাটের জয়। কিন্তু আমার কি হবে? আমি ছাড়া পেলেও আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। আমার মা-বৌ জানে আমি মরে গেছি। বন্দী হইনি। ওদের কাছে যে আমি ফিরে যেতে পারব না।

ফিরে যেতে পারব না। ফিরে যেতে পারব না। এই কথাটির ধাক্কা সবারই মনে এসে লাগল। সবাই আনমনা হয়ে গেল।

দেবল হঠাৎ ভোর হতে কত বাকী আছে তা দেখবার জন্য হাতঘড়িটা চোখের কাছে নিয়ে এল! কানের কাছেও বটে।

উরায়ম কিন্তু হো হো করে হেসে উঠল,—হাউ রোম্যান্টিক। আরে, ফিরে কি আমরাই যেতে পারব? তবে এত ভাবনা কেন?

জো বলল,—তোমার ঝাণ্ডা উঁচু রেখো সর্বদা। আমরা নিশ্চয়ই জিতব। শুধু তাই নয়। হয়ত সিঙ্গাপুরও আমাদের হাতছাড়া হবে না। যদিও অবশ্য এখন তার কোন আশাই দেখছি না।

রবিন বলল,—এই শেষরাতের লড়াইয়ের টুকরোটাই ত আর শেষ নয়।

এই বন্দী হয়ত প্রাণে বেঁচেও যাবে। কিন্তু ওর চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক বেশী অজানা।

উড়িয়ে দিল কথাটা উরায়ম,—সবই জানা আছে। সবই জানা। তোমার 'কোল্ড মাটন'টা যদি টিকে থাকে তা হলে বাকী সবই থাকবে জানা। আর যদি না টেকে ত জানার দরকার ফুরিয়েই গেল। ব্যস্।

দোভাষী বন্দীর পকেট থেকে একটা থলে আর কাগজ বের করে আনল। থলের মধ্যে কোন বৌদ্ধমন্দিরের ছাপমারা তাবিজ আর কবজ অনেকগুলি। তারই সঙ্গে মোড়া আছে ৩৯-ডিভিসন পদাতিক সৈন্যদের যুদ্ধের দিনের অর্ডার—"যদি তোমার হাত ভেঙ্গে যায়, পা দিয়ে যুঝে যাও। হাত পা দুই-ই ভাঙ্গে, দাঁত দিয়ে লড়। যদি দেহে প্রাণবায়ু না বাকী থাকে, তা হলে তোমার প্রেতাত্মা দিয়ে লড়াই চালাও।"

এমনিতেই চারদিকে একটা প্রেতাত্মার মত নিঃঝুম নীরবতা ঘিরে এল। যত বেলা উঠতে লাগল ততই সে নীরবতা চেপে বসল ট্রেঞ্চটার উপর। ব্যাপার কি? মাথার উপর দিয়ে গোলা ছুটছে না, আকাশে নেই বোমারু বিমান, বাতাসে নেই বারুদ-পোড়া গন্ধ! একবার যেন খবর নেওয়া দরকার। হয়ত এখন নিরাপদে বাইরে এসে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা সম্ভব হবে।

আস্তে আস্তে জো নিজেই মাথা তুলে ফিল্ড-টেলিস্কোপ চোখে লাগাল। এ কি? একি ব্যাপার? সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে উঁচু বাড়ীগুলির উপর গভর্ণরের প্রাসাদের চূড়ায় সাদা নিশান উড়ছে কেন? দূরবীন ঘুরোতে ঘুরোতে দেখল সে, যে পাহাড়টার চারিদিকে ঘাঁটি করে ইংরেজ সৈন্যরা লড়ছিল তার উপরও সাদা নিশান।

তাই চারিদিক এত নিঃসাড় হয়ে গেছে হঠাৎ।

আস্তে আস্তে ওরা সব গুটিয়ে নিল। উরায়মের কথাই ঠিক। 'কোল্ড মাটন' অর্থাৎ দেহপিঞ্জরখানা এ-যাত্রা টিকে গেল। তবে টিকে কোথায় যাবে তার খবর করতে হেড-কোয়ার্টার্সে যাওয়া দরকার।

বেশী দূর যেতে হল না।

সাদা নিশান উড়িয়ে ডেসপাচ-রাইডারের দল মোটর-সাইকেলে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। সবাইকে জানাচ্ছে যে বৃটিশরা আত্মসমর্পণ করেছে। অতএব আর লড়াই নেই সিঙ্গাপুরে। একজন ইংরেজ রাইডারের মুখে খুব খুশী-খুশী ভাব।

সে দলের সঙ্গে একজন ইংরেজকে দেখে সাইকেলের ইঞ্জিন থামাল। তাকে স্যালুট করে বলল,—স্যার আপনাকে যেতে হবে অন্য জায়গায়। চলে আসুন আমার পাশের 'পাইলট' সীটে।

—তার মানে?—জো সেলামের পাল্টা সেলাম দিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—আমরা ইংরেজ আর অস্ট্রেলিয়ানরা হলাম যুদ্ধের বন্দী। জাপানীদের কাছে আমরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছি।

—তা ত বুঝলাম। কিন্তু আমার অধীনে যে ভারতীয় অফিসার আর সৈন্য আছে তাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে কেন? তাদের আমিই ত আত্মসমর্পণের জন্য নিয়ে যাব।

একটু মুখ কাঁচুমাচু করে রাইডার বলল,—না, ঠিক তা নয়। আমরা হলাম যুদ্ধবন্দী। আমাদের জাপানীরা আন্তর্জাতিক নিয়মে বন্দী করে রাখবে। কিন্তু আমাদের মুখপাত্র কর্ণেল হাণ্ট জানিয়েছেন যে ভারতীয় সৈন্য আর অফিসারদের জাপানীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এগিয়ে এল দেবল। দৃঢ় স্বরে বলল,—তার মানে? আবার আমাদের প্রতি পৃথক ব্যবহার করা হল? আমরা যুদ্ধবন্দী হয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মের আওতায় থাকলে জাপানীরা ঠিকমত দেখাশোনা করতে বাধ্য! কিন্তু যুদ্ধ-বন্দীর বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তোমরা আমাদের বঞ্চিত করলে?

রাইডার ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলল,—এই হচ্ছে আমার প্রতি হুকুম। আমি আর কিছু জানি না।

রাগে অস্থির হয়ে এগিয়ে এল উরায়ম,—হুকুমকী বাত ছোড়ো জি। রাগে তার মুখ দিয়ে আর ইংরেজী কথা বের হল না। মুঠি বন্ধ করে ঘুষি পাকিয়ে সে বলল,—তোমরা আমাদের 'বিট্রে' করলে! চোরের মত ফাঁসিয়ে দিলে?

রাইডার চুপ করে রইল।

উরায়ম আবার হেঁকে উঠল,—ইউ কাওয়ার্ডস। এই তোমাদের স্পোর্টস্‌ম্যানশিপ? বৃটিশ জাস্টিস? লয়্যালটি?

রাইডার চুপ করে রইল।

উরায়ম আরো চড়া গলায় বলল,—না, তোমাদেব লুকিয়ে-চুরিয়ে আপোসে যদি এরকম বন্দোবস্তই হয়ে থাকে তা আমি মানব না। আমার এই ইউনিফর্মের মর্যাদা সবাইকে দিয়েই রক্ষা করিয়ে নেব। ইংরেজই হোক আর জাপানীই হোক, আমার ইউনিফর্মকে মানতেই হবে।

রাইডার এবার জবাব দিল, দুঃখিত হযো না, অফিসাব। মেজর ফুজিয়ারা ভবসা দিয়েছেন যে ভারতীয় সৈন্য আর অফিসারদেব বন্দী করা হবে না। তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা স্বাধানভাবে থাকতে পারবে।

রবিন এবার এগিয়ে এল,—অর্থাৎ আমবা গরু ভেড়ার মত চরে বেড়াব, তফাতের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা খোঁয়াড়ে ফিবে একমুঠো দানাপানিও পাব না। ইংরেজ তার দুশমনকে পর্যন্ত তার দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে দিল। আর আমাদের?

উরায়ম হেসে উঠল,—জয় বর্তানিযা, জয় নিপ্পন! সাবাস বুদ্ধির খেল্।

দেবল দৃঢ়স্বরে বলল,—না, খেল্ অত সহজে খতম হবে না, উরায়ম। আজ ইংরেজ তার কাছে দাসত্বেব খত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে দিল। এখন জাপানীর কাছে সে খত নতুন করে লেখবার কোন দায়িত্ব নেই। কি করব তা স্বাধীনভাবে বিচার করার পথ খুলে গেছে। কিন্তু তার আগে আমরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেব —জয় হিন্দুস্থান!

রাইডারের এসব কথা আর সহ্য হচ্ছিল না। সে জো'কে স্যালুট করে মোটর-সাইকেলের পাশের সীটে চড়ে বসবার জন্য আবার অনুরোধ করল।

কিন্তু জো যায় কি করে? তার ভারতীয় সাথী, এতদিন মরণপথের বন্ধু, নিজের অনুগত অফিসারদের কি করে সে ছেড়ে যাবে?

ওদের সবার দিকে তাকিয়ে সে বলল,—উরায়মের কথা ঠিক। তোমাদের ইউনিফর্মের সম্মান আমাকেই রাখতে হবে। আমি তোমাদের

সঙ্গে হেঁটেই যাব হেড-কোয়ার্টার্সে। সেখানে গিয়ে তোমাদের কথা বোঝাব। এই বন্দোবস্ত বদলাবার চেষ্টা করব।

রাইডার বাধা দিল,—মিছে চেষ্টা করবেন না স্যার। লেখাপড়া করে সব সই করা হয়ে গেছে। আমার কাছে হুকুম আছে। আপনি একা আমার সঙ্গে চলে আসুন। হুকুম আছে।

তবু জো একটুও নড়ল না।

একটু পরে ব্যাকুল হয়ে সে ওদের তিনজনেরই হাত জড়িয়ে ধরল এক সঙ্গে পাগলের মত বলে চলল,—তোমরা জান না, কিন্তু বিশ্বাস করো যে আমি জোর করে তোমাদের সঙ্গে 'ডেভিল্‌স সেক্টরে' পাহারা দিতে এসেছিলাম। শুধু একলা তোমাদের পাঠাতে হুকুম হয়েছিল। কিন্তু সে হুকুম আমি মানিনি।

দেবলই উত্তর দিল,—কিন্তু এখন আপনাকে হুকুম মানতেই হবে, স্যার। আপনার সঙ্গে আমাদের ত ভুল বোঝা হয় নি। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্য আর হিন্দুস্থানে এই ছাড়াছাড়ি শুরু হল। ধন্যবাদ দিই এই সমর্পণের শর্তকে। বৃটিশের অধীন হিসাবে সব কর্তব্য থেকে আজ আমরা মুক্ত। স্বাধীন।

সাত

জাপানীর কবলে প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল।

ঘটনায় ভরা দেড় বছর। কিন্তু দিন কাটতে চায় না। ওরা যে-সব ছাউনীতে আটক আছে সেগুলো বন্দী শিবিরেরও অধম। ভারতীয় সিপাইদের জাপানীরা না রাখল যুদ্ধবন্দী করে, না দিল সাধারণ লোকের মত বসবাস করতে। মৃত্যুই হচ্ছে ওদের একমাত্র মুক্তি।

জোয়ান মানুষ যেখানে রোগে আর খিদেতে মাছির মত মরছে, সেখানে কে আর সময়ের হিসাব রাখে? প্রথম দু-মাসের মধ্যে সাত হাজার সিপাই এক আমাশাতেই শুয়ে পড়ল। শুধু দু মুঠো চাল আর নুন এই মোটে বরাদ্দ। যেদিন ডাল জোটে সেদিন ত মোচ্ছব। কলের জল বা এ-যুগের স্যানিটারী পায়খানা কাকে বলে তা সবাই ভুলে গেল। সময় বুঝে দেখা দিল বেরিবেরি।

সৈন্যদলে ডাক্তারের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন বাঙালী। তাঁরা চাল সিদ্ধ করে গাঁজিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে শরবত বানাতে লাগলেন। নাম দিলেন খামিরা শরবত। শরবত বলে মনে হচ্ছে না? মুখে রুচছে না? আচ্ছা তা হলে খোঁজ লেবুগাছ। দাও দু ফোঁটা পাতিলেবুর রস আর একরত্তি চিনি, না হয় নুন। তোমার ভাগ্য ভাল থাকলে ওতেই বেরিবেরি সেরে যেতে পারে।

কিন্তু কোন দাওয়াইয়ের আশায় যেন বসে থেকো না। সাদারা যুদ্ধবন্দী হবার সময় যা কিছু ওষুধ হাতের কাছে ছিল সবই নিজেদের বন্দী শিবিরে সরিয়ে ফেলেছিল।

একদিন খবরও পাওয়া গেল যে ইংরেজ বন্দীরা একরকম ঘাস খুঁজে পেয়েছে। তা দিয়ে সবজির কাজ চলে যায়। খোঁজ, খোঁজ, সেই ঘাসটা খোঁজ।

দেবল রুখে দাঁড়াল। না, কক্ষনো না। মানুষের দাম ত মোটে তের আনা! তার জন্য গরু-ভেড়ার দলে নাম লেখাব না।

তের আনা? মানুষের দাম তের আনা? ওর চারদিকে দলে দলে ভারতীয় বন্দী জড়ো হয়ে গেল।

তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেবল জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল,—ভাই-সব এই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেলে যে-সব কার্বন গোছের পদার্থ বাকী থাকে বৈজ্ঞানিকরা বলে যে তার দাম তের আনার বেশী নয়। না খেয়ে রোগে ভুগে আমরা ইঁদুরের মত হয়ে গেছি। জানের খাঁচাখানার দাম এতই কমে গেছে যে জাপানীরা সেটার জন্য ছ আনা দামের একটা সীসের গুলিও আজকাল খরচ করবে না।

তবে? তবে? দেবল-ভাই কি বলতে চায়? প্রশ্ন করল একজন গুজরাটী অফিসার। অসহায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরের আরো কাছে এসে পড়েছে। তাই দেবল এখন গুজরাটী প্রথায় ওদের কাছে "দেবল-ভাই"। সবাই ভাই-ভাই।

—আমার বলার কথাটা খুবই সামান্য। আবার খুব বড়ও বটে। কয়েকটা ঘটনা বলি। এই ধর, জাপানীরা রোজ আমাদের গাল দেয় পেটুক বলে। মনে করে আমরা এখনো খাওয়ার সুখে মেতে আছি: তা না হলে একবেলা খাওয়ার মধ্যেই চাল, নুন, তেল, লঙ্কা, মসলা, ডাল এতসব বস্তু লাগবে কেন? তোমাদের মনে আছে কি যে একদিন ওরা শুধু লঙ্কা দিয়ে বলেছিল যে ওতেই আমাদের সেদিনের র‍্যাশন হয়ে গেল। নোটিশ দিয়ে গেল যে পরের দিন দেবে শুধু তেল?

সবাই মাথা নীচু করে রইল।

দেবল আবার শুরু করল,- সেদিন তোমরা কেউ খেতে পাওনি। তবু, লঙ্কার র‍্যাশন না খেয়েও ক'যে লঙ্কা খাওয়ার মত চোখে জল এসেছিল তোমাদের সকলেরই। কিন্তু এ-হেন ব্যাপারটা কি শুধু ওরা আমাদের খাবারের খবর জানে না বলেই ঘটেছিল? না, আমাদের মানুষের মধ্যে ধরে না বলে?

একটু একটু গুনগুন ধ্বনি শুরু হল ভিড়ের মধ্যে। বিশ্বাস নেই কে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে। কেউ হয়ত জাপানীদের গুপ্তচর আছে। আড়চোখে সবাই এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

কিন্তু দেবল ভয় পেল না। জীবনে কি বাকী রইল যার জন্য ভয় পেতে হবে?

সে আবার আরম্ভ করল,—তোমরা জান সবই, তবু মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। এই যে তোমরা সেদিন জাপানী পাহারাদারের ঘাঁটির পাশ দিয়ে যাবার সময় নিয়মমত সেলাম করে যাওয়া সত্ত্বেও পাহারাদার এসে আমাদের অফিসারকে চড় মেরে গেল, সেটা কেমন ব্যাপার? তোমরা প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও যে শুনলো না, সে-কথা ভুলে গেছ?

একজন বাধা দিতে এগিয়ে এল,—কিন্তু ভুলো না যে পরে সেই জাপানী এসে অফিসারের কাঁধে দুটো তারার চিহ্ন আগে দেখতে পায়নি বলে ক্ষমা চেয়েছিল। এমন কি নিজের গালও পেতে দিয়েছিল পালটা চড় খাবার জন্য?

দেবল হার মানল না,—তাতেই বা কি? চড় মেরেছিল তোমরা পরাধীন বলেই।

—কিন্তু ইংরেজদের ওরা কম বে-ইজ্জত করে না। বৃটিশ বন্দীশিবিরে পাহারা দেওয়াচ্ছে আমাদের ভারতীয় সিপাইদের দিয়েই। আমরা ন'শো গোলন্দাজ পাঠিয়েছি।

ইংরেজরা ওদের শত্রুপক্ষ; সমান সমান। কিন্তু আমরা কি? শুধু পরাধীন। আমাদের কোন মর্যাদাই নেই।

এই ধর না—সেদিন এত ধরাধরির পর ওরা আমাদের রোগীদের দুধ খেতে দিতে রাজী হল। কিন্তু বলল যে দুধ দেবে না, দেবে গাই। নিজেরা খেতে না পেলেও যদি গাইকে খাওয়াতে পার তবেই পাবে দুধ। কিন্তু কি পেলে? ষাঁড়। শক্ত সমর্থ ষাট ষাটটি ষাঁড়। আমরা যখন আপত্তি করলাম ওরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। পাল্টা প্রশ্ন করল,—কেন, ষাঁড়কে দুধ দিতে শিখিয়ে নিলেই পার?

গুজরাটী বলল,—কিন্তু দেবল-ভাই, এসব অভিযোগ ভুল বোঝার ফলেও হতে পারে। তোমার বক্তব্যটা কী সেটা খুলে বল।

দেবল গলা উঁচু করে বলল,—আমার বলবার বেশী কিছু নেই। শুধু বলতে চাই যে তোমরা লড়তে এসেছিলে, মাছির মত মরতে নয়। কাজেই এখন তোমাদের আবার লড়তে হবে। কিন্তু এবার অন্য কারণের জন্য। এবার তোমাদের শত্রু আলাদা।

অনেকে তখনি ব্যাপারটা আঁচ করে নিল। সিঙ্গাপুরের পতনের দু'একদিনের মধ্যেই এ নিয়ে কথাবার্তা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আই. এন. এ. তৈরীও হয়েছিল। কিছু কিছু লোক ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর চেষ্টায় তাতে যোগও দিয়েছিল। জাপান থেকে এলেন রাসবিহারী বোস। গড়লেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ।

কিন্তু তেমন কোন কাজ হল না। যারা যোগ দেয়নি, তাদের অনেককে চাপ দিয়ে রাজী করানো হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। বড়জোর নাম-কা-ওয়াস্তে রয়ে গেল।

কাজেই এখন দেবল সেই পুরনো কথা আবার তোলাতে কারো তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। কয়েকজন আস্তে আস্তে সেখান থেকে গা-ঢাকা দিল। বিশ্বাস নেই, কে কোথায় টিকটিকির কাজ করেছে। এপ্রিল ১৯৪৩-এ সিঙ্গাপুরের কনফারেন্সে রাসবিহারী বোস জাপানীদের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে এই স্বাধীনতা-যুদ্ধের ভার নেবার জন্য জার্মানি থেকে সুভাষ বোসকে মালয়ে আনা হোক। কই, তারও ত কোন সাড়াশব্দ নেই। কাজেই গা-ঢাকা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

একজন ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে বাধা দিল। বলল,—সে-সব কথা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না!

দেবল বিদ্যুতের মত জবাব দিল,—কিন্তু মন ভেজে। বড় আপসোসের কথা যে তোমাদের মনও ভিজল না। দেশকে এখনও ভালবাসলে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকে শুধু জাপানী আর বৃটিশের চোখ দিয়ে দেখলে। ওই অতদূরে আমাদের দেশে লোকে গান্ধীজীর ডাকে খালি হাতে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল, জেলে গেল, মরল। আর তোমরা আধ লাখ সৈন্য, সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালাতে ওস্তাদ সৈন্য, তোমরা সেই স্বাধীনতার জন্য কিছুই করলে না। মায়ের ঋণ। মায়ের ঋণ তোমরা শোধ করলে না।

রবিন উঠে দাঁড়াল একটা মোড়ার উপর। হেঁকে বলল,—ঠিক কথা। শুধু মাতৃঋণ নয়। অস্ত্রগুরুর ঋণও বটে। যে ইংরেজের কাছে হাতিয়ার

চালানো শিখেছি তাকে তারই হাতিয়ারের লড়াইয়ে হারাতে হবে। মহাভারতে বলে যে শুধু তাতেই গুরুর ঋণ শোধ করা যায়।

দেবল আবার বক্তৃতা শুরু করল,—তার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে জাপানীরাও তোমাদের সম্মান করতে আরম্ভ করেছে। ওদের চোখে আমরা আজ মানুষ নই। যে পরাধীন সে আবার মানুষ হল কি করে? আমরা সেই মনুষ্যত্ব অর্জন করব যদি স্বাধীন হবার চেষ্টা করি। বাঁচতে চাও, মানুষের মত বাঁচ। ঘাস খেয়ে গরু-ছাগলের মত নয়।

উরায়ম এগিয়ে এল, খুব সত্যি কথা, দেবল। কিন্তু বুকের উপর হাত দিয়ে বল, ইংরেজ সরকারের হয়ে যুদ্ধ করবে বলে যে শপথ করেছিলে সে শপথের কি করবে? আজ যদি ইংরেজের কাছে তোমার শপথ ভাঙ্গ, সিপাহীর সবচেয়ে বড় ধর্ম যা তা ভুলে যাও, কাল তোমার দেশের কাছে শপথও তুমি ভাঙ্গবে। হারামি বেইমানি একবার শুরু হলে আর শেষ নাই।

বুকের উপর হাত দিয়ে দেবল বলল,—ভাই-সব, তোমরাও সবাই আমার মত বুকের উপর হাত দাও। দিয়ে দেখ, রক্ত সেখানে টগবগ করে ফুটছে কি না? জোয়ানের রক্ত। মরদের খুন। বুকে হাত রেখে যে সামরিক শপথ তোমরা নিয়েছ সেটা কার জন্য? মনিব, না, মা? কে বড় তোমার কাছে। কার শান্তি বজায় রাখবার জন্য হাতিয়ার ধরেছ? মায়ের, না ভাড়াটে মনিবের?

সবাই চুপ করে গেল। একটু পরে উরায়ম আবার জিজ্ঞেস করল, —কিন্তু সেই মা-ই ত এখনো ইংরেজের রাজ্য। আমরা যে ইংরেজের রাজার নামে শপথ নিয়েছি।

দেবল অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়,—না, না, আমরা কসম খেয়েছি দেশ আর রাজার নামে। রাজা ত দেশেরই রাজা। কিন্তু দেশ যদি রাজাকে না চায়, দেশের স্বার্থ আর রাজার স্বার্থ যদি আলাদা হয়ে যায়, তা হলে ত আর রাজা 'রাজা' থাকল না। কাজেই হিন্দুস্থানই আমাদের রাজা।

তোমরা রেডিয়োতে শুনেছ গত বছর আগস্ট মাস থেকে দেশ ইংরেজকে রাজা বলে স্বীকার করছে না। লোকে সেখানে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাচ্ছে।

একেবারে খালি হাতে। মরছে খালি হাতে। আর তোমরা এখানে বসে আছ সুশিক্ষিত সৈন্যদল! তা ছাড়া ইংরেজই ত তোমাদের বন্দী ভাবে না দেখে বেওয়ারিশভাবে ছেড়ে রেখে চলে গিয়েছে। কাজেই তোমাদের ত কোন বন্ধনই আর নেই। শপথ থেকে মুক্তি পেয়েছ সবাই।

কয়েকজন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল; বলল,—কিন্তু আমরাও ত প্রায় ঠুঁটো।... লড়াই করে লাভ কি?

দেবল একবার হাতঘড়িটাতে সময় দেখে নিল। তারপর বলল,—তার উত্তর আমি দেব না। দেবেন সুভাষ বোস। এখনি বোধ হয় সিঙ্গাপুর শহরের ময়দানে তিনি সে কথা সবাইকে বোঝাচ্ছেন। শোন, তিনি কী বলেন।

বলেই দেবল বন্দীশিবিরে সময় কাটানোর সবে·ধন-উপায় রেডিয়োটি খুলল। হ্যাঁ, ঠিকই। সুভাষ বোসের গলাই শোনা যাচ্ছে। স্পষ্ট, বীরত্বে ভরা। একটা অসহায় মরতে-বসা জাতির কানে মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র:

"একটি পরাধীন জাতির পক্ষে তার স্বাধীনতার সৈন্যদলের মধ্যে প্রথম দল হবার চেয়ে বেশী সম্মানের, বেশী গর্বের আর কিছুই নেই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে একটি দায়িত্বও আছে। আমি সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন। তোমাদের নামে শপথ করছি—অন্ধকারে আর দিনের আলোয়, দুঃখে আর সুখে, কষ্ট ভোগে আর আনন্দে আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকব।"

"এখনকার মত আমি তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট, জোর করে মার্চ করা আর মৃত্যু ছাড়া কিছুই দিতে পারি না। কিন্তু তোমরা যদি জীবনে আর মরণে এবং সব সময় আমার সঙ্গে থাক তা হলে তোমাদের জয় আর স্বাধীনতার বেদীতে পৌঁছে দেব। আমাদের মধ্যে কারা কারা ভারত স্বাধীন দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে তাতে কিছু যায় আসে না। দেশ যে স্বাধীন হবে আর সেজন্য যে আমরা সব উৎসর্গ করব তাই যথেষ্ট। ইনকালাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ।"

এর পর থেকে দলে দলে সৈন্যেরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজে নাম লেখাতে লাগল। অফিসাররা প্রথম থেকেই মনে মনে তৈরী হয়েছিল। ইংরেজী

শিক্ষাই তাদের মনে স্বাধীনতার বীজ পুঁতে দিয়েছিল। অফিসারদের মেসে উপর-উপর সমান ব্যবহার আর ভদ্রতার কোন ত্রুটি থাকত না। তবু অসতর্ক মুহূর্তে মুখোশ ভেদ করে কোন কোন স্থলে ইংরেজের মনিবানা ফুটে উঠত। তা-ও যদি-বা সহ্য হয়েছিল, যুদ্ধে নেমে বিপদের মুখে ভারতীয়দের সামনে ঠেলে দেওয়ার সময় ইংরেজের সেই মুখোশটুকুও মালয় সিঙ্গাপুরে খসে পড়ত।

কাজেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তৈরী হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

দেবলের কাজ খুব বেড়ে গেল। সবচেয়ে বেশী কাজের লোকদের উপর নেতাজীর নজর ছিল। কাজেই দেবলও পিছনে পড়ে রইল না। তাকে বসান হল আজাদ হিন্দ্ বেতারের বৈদেশিক প্রচারবিভাগে। বেসামরিক ভারতীয়দের মধ্যেও এই কাজের যোগ্য অনেক লোক ছিল। কিন্তু তাকেই বাছাই করে নেওয়া হল।

সে এতদিন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের বেকার জীবনের গ্লানি বয়ে এসেছে আর সামরিক জীবনের সব অভিজ্ঞতাই একেবারে আনকোরা ভাবে পেয়েছে। সে-ই হিন্দুস্থানের চিন্তাজীবী লোকদের মনের মধ্যে আজাদ হিন্দের বাণী সবচেয়ে ভাল করে পৌঁছে দিতে পারবে। তা ছাড়া সবাই জানে যে রেডিয়োতে তার ঝোঁক খুব বেশী। বেকার বন্দী-জীবনেও তাঁবুতে বসে সব সময় সে বেতার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। দেশের সব খবর শুনে তা থেকে বেছে বেছে দরকারী খবর সবাইকে জানিয়ে দিত।

বর্মা মালয় জাপানী কবলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সে-সব দেশে আটক পড়ে গেল। তাদের কাছে তাদের আত্মীয়স্বজনের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো একটা বন্দোবস্ত করল।

সপ্তাহে দু'দিন একটা বাঁধা সময়ে দিল্লী থেকে বহির্ভারতীয় বেতারে থেকে আত্মীয় স্বজনদের টুকরো টুকরো খবর বর্মা-মালয়ে পাঠান হত। বিদেশে আটক ভারতীয়রা ইংরেজ সরকারের এই দয়া আর বিবেচনায় নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবে। শুধু তা-ই নয়। দেশটা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় নি, ইংরেজ রাজত্ব যে ঠিকমতই বহাল আছে তারও হাতে হাতে প্রমাণ দেওয়া হবে। সাধারণ লোকের মুখ দিয়েই।

দিল্লী-পাঞ্জাব অঞ্চলের দেহাতী আর শহুরে লোকেরা দলে দলে এই বেতারে খবর পাঠানোর সুবিধা নিতে লাগল। দেবল নিয়মিত সে-সব খবর শুনত আর যতটা সম্ভব বেসামরিক দেশী লোকদের কাছে তাদের আত্মীয়দের খবর পাঠানোর বন্দোবস্ত করত।

এখন রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ্ বেতারের বৈদেশিক বিভাগে এসেও সে এই খবর-শোনা আর মনিটর অর্থাৎ বাছাই করে সম্পাদন করার ভার হাতে রাখল।

এখন ইংরেজের হাতিয়ারেই ইংরেজকে হারাতে হবে।

তাই আজাদ হিন্দের তরফ থেকে বর্মা মালয় এসব জায়গায় ভারতীয়দের কুশল সংবাদটুকু দেখে পাঠানোর বন্দোবস্তও সে প্রচারসচিবের কাছ থেকে হুকুম করিয়ে নিল। কোন সামরিক গোপন খবর ফাঁস করা হবে না। কিন্তু এই সব আটক লোক বা সিপাইর খবর নেবার জন্য দেশের লোক দলে দলে আজাদ হিন্দ রেডিয়ো লুকিয়ে লুকিয়ে শুনবে। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার বাণীও শুনবে। স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দেবে। সবচেয়ে ভাল প্রচারের পথ।

এমনই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সে বিশেষ ফলাও করে বাহাদুর শা'র সমাধি থেকে নেতাজীর প্যারেড আর বক্তৃতার বর্ণনা বেতারে হিন্দুস্থানের দিকে চালু করল—

"রেঙ্গুন ডাক দিচ্ছে। রেঙ্গুন ডাক দিচ্ছে। আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো থেকে বলছি। আজ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ সালের বিকেল বেলা। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের রেঙ্গুনে রাখা সব কন্টিন্জেন্ট ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা'র পবিত্র সমাধিতে জড়ো হয়ে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা-যুদ্ধকে নমস্কার করছে। লক্ষ লক্ষ বেসামরিক ভারতীয় আর বর্মীও জমায়েত হয়েছে।

নেতাজী এইমাত্র সম্রাটের কবরে বিরাট একটি ফুলের মালা অর্ঘ্য দিলেন। ভারতের সব প্রদেশ, সব জাতি, সব ধর্মের লোকের প্রতীক ফুল নিয়ে গাঁথা এই মালা হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার প্রথম দান।

বৃটিশ আমাদের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানারকম ভেদাভেদ বাড়িয়েছে। আমরা নিজেদের দেশে তাই এখনো নিজেদের মধ্যে স্বার্থের ঝগড়া ভুলতে পারিনি। কিন্তু নেতাজীর ডাকে আমরা সব ভেদাভেদ জলাঞ্জলি দিয়ে

নতুন হিন্দুস্থানী, নতুন আজাদী ফৌজ আমরা সবাই এক হয়ে গেছি। মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন আমরা বিদেশে বসে সফল করলাম।

দেশের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সবাই এক রসুইখানায় একই লোকের রান্না একসঙ্গে বসে খাই। আমাদের সৈন্যরাও ইংরেজের তৈরী জাতি ধর্ম আব প্রদেশের ভেদ তুলে দিয়ে একসঙ্গে ব্রিগেড তৈরী করেছে। তারা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে কুচকাওয়াজের সারিতে। নেতাজী হিন্দুস্থানেব দিকে মুখ করে হিন্দুস্থানের শেষ স্বাধীন সম্রাটকে অভিবাদন করছেন।....”

নেতাজীব বক্তৃতা বেতাবে রিলে করা শেষ হল। ‘জাফর’ এই ছদ্মনামে বাহাদুব শা’ব নিজেবই লেখা কবিতা দিয়ে নেতাজী বক্তৃতা শেষ করলেন :

গাজীয়োঁ মেঁ বু রহেগি যব তক ইমান কি।
তখত লণ্ডন তক চলেগি তেগ হিন্দুস্থান কি॥

ভারতেব স্বাধীনতা-যুদ্ধের সিপাহীব আত্মার শেষ নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত যতদিন থাকবে হিন্দুস্থানের তলোয়ার লণ্ডনের সিংহাসন পর্যন্ত ততদিন বিঁধতে থাকবে।

সেদিন রাত্রে দেবল খুব হয়রান হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কিছু আর ভাল লাগে না। কাজ আছে, যুদ্ধ আছে, দেশের আজাদী আছে। কিন্তু ভেতবের মানুষটা যে একা সাথীহারা।

সাথীহারা। কিন্তু একা নয়। কাজেই ঠিক সাথীহারাও নয়। তবু সে কাছে থাকলে বা দেখা দিলে, অন্ততঃ একটা কথা বললে সমস্ত পৃথিবী ভরে ওঠে, তার সঙ্গে দেখা হবার, তার একটা কথা শোনবারও কোন আশা নেই।

যদি সে পাঞ্জাব দিল্লীতে থাকত, হয়ত দিল্লী বেতার থেকে কোন রকমে খবর দেবার বন্দোবস্তটা তার নজরে আসত। কিন্তু মিতার চোখ চারদিকে খোলা। অনেক জানাশোনাও আছে। তবু জাপানী কবলে মিলিটারী অফিসার দেবলের জন্য কোন খবরই দিল্লী বেতারের মধ্য দিয়ে পাঠানো মিতার পক্ষে সম্ভব নয়।

তার নিজের কোন খবরও সে সেজন্যই পাঠাতে পারছে না। মিতার পরিচয় আর ঠিকানা দিতে হবে। অন্ততঃপক্ষে মায়ের। কিন্তু সে মিলিটারীতে ছিল। কোন খবর এলেই সরকার ধরে নেবে যে আই. এন. এ.-র পক্ষের সাঙ্কেতিক খবর এসেছে। তখন পিছনে লাগবে টিকটিকি। গোয়েন্দা ঘুরবে ছায়ার মত।

কোন্ বাঙালীকেই বা ইংরেজ এমন ব্যাপারে বিশ্বাস করেছে? বিশেষ করে সে যদি অস্ত্রধারী হয়।

তা ছাড়া মিতার কথা আরো আলাদা। তার চাকরি এমন জায়গায়—যেখানে সর্বদা নানা দেশের লোক, মিলিটারী অফিসার আনাগোনা করে। সেখানে যে বাঙালী মেয়ে কাজ করে, তাকে এমনিতেই কর্তাদের সন্দেহের নজরে রাখা সম্ভব। কাজেই দুঃখ বরং সইব, কিন্তু ওর বিপদ বাড়াব না।

মিতা, তোমার জন্য ভাবি না। তুমি সবই বুঝবে, সবই সইবে। আমি যে কেন নীরব আছি তা তুমি বুঝতে পারবে।

দিল্লী বেতার থেকে বর্মা-মালয়ের প্রবাসীদের জন্য আত্মীয়-সংবাদ পড়া শুরু হল। নামের পর নাম আর ঠিকানা, আর ছোট ছোট খবর। কি-ই বা খবর? পাশের ঘরে স্টেনোগ্রাফার সব খবর সংক্ষিপ্ত লেখায় টুকে নিচ্ছে। দেবল শুধু কলের মত মাথায় হেড-ফোন লাগিয়ে রেখেছে। একটার পর একটা খবর শুনে যাচ্ছে। দিনের পর দিন যেমন শোনে।

হঠাৎ, হঠাৎ যেন বিশ্বসংসার দুলতে লাগল। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল; বুকটা টনটন। কপালে হাত দিয়ে চেপে ধরে কানটা খাড়া করে দেবল কলের মত শুনে যেতে লাগল,—দেবল সিংহ, দেবল সিংহ কলকাতা ইউনিভার্সিটির এম. এ. পড়া ছাত্র। সে মালয়ে রবারের বাগানে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেবল সিংহ—বর্তমান ঠিকানা জানা নেই। দেবল সিংহকে মিতা জানাচ্ছে—গঙ্গার ঘাটে তুমি আমায় যেমন দেখেছিলে তার চেয়ে ভাল আছি। তুমি ভাববে না। সুস্থ থেকে ভাল থেকে ফিরে এসো। মিতা জানাচ্ছে, মিতা জানাচ্ছে।

হেড-ফোনটা দেবল মাথার উপর থেকে সরিয়ে নিল। কান দুটো এত

গরম হয়ে উঠেছে যে সেখানে আর ফোন লাগিয়ে কিছু শোনা চলে না। অবশ দেহ এলিয়ে দিল দেবল। অসহ আনন্দ তাকে বেদনায় ভরে দিল।

অনেকক্ষণ! অনেকক্ষণ!

ঘরটা একেবারে নীরব। সেলোটেক্সে ঢাকা দেওয়াল ভেদ করে কোন আওয়াজ বাইরে থেকে আসতে পারে না। বেতারের কথাবার্তায় যেন অন্য আওয়াজ না মিশতে পারে। কিন্তু নিজের বুকের ধুকধুক আওয়াজ দেবল থামাবে কি করে?

ওটা কি ওর নিজের বুকের ধুকধুক? না, হাতঘড়িটার টিক্ টিক্? ওর নিজেব দেহ এত গবম হয়ে উঠল কি করে? পাশে-বসা প্রিয়ার উষ্ণ দেহের ছোয়া লাগল কি একটুখানি? সমস্তটা ঘর যেন সুরভিতে ভরে গেছে। মিতাব প্রিয় বকুলেব গন্ধ বেতার বয়ে ভেসে এল নাকি? সে গন্ধে দেবলের নাক মুখ গলা পযন্ত মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে।

শরীরটা এত গবম হয়ে গেল কেন। মিতার ফুলের মত সুঠাম আঙুল টুক্ টুক্ করে তার হাতের উপর টোকা দিচ্ছে নাকি? সময় বয়ে যাচ্ছে। নীরবে কার মনে কি ঢেউ উঠছে সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন।

কিন্তু দেবলের হৃদয়ের যন্ত্রটা যেন মনের সবটুকু অভিভূত ভাবকে নিমেষে নিমিষে সময়েব স্রোতের মধ্যে বইয়ে দিচ্ছে। সে স্রোত উজান বইতে-বইতে এই ইবাবতী নদী বেয়ে সাগব পার হয়ে গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকার, সেই গঙ্গার নির্জন ঘুমন্ত পাড়। সেই ব্যাকুল বিহ্বল দেবল! আর, আর?

নাঃ। কর্তব্য আছে। নিরেট নিরন্তর কাজ। সব মনের খেলা, সব কল্পনার অনেক উপরে, অনেক বড় কাজ। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল দেবল। মিতা, তুমি রইলে আমার নিভৃত মণিকোঠায়। আমার বিবশ নিমিষের কর্তব্যের পথ থেকে সরে আসার সঙ্গে কি তোমায় জড়াতে পারি?

তাড়াতাড়ি সে আবার মাথায় উপর দিয়ে কানের দু'পাশে হেড-ফোনটা নামিয়ে দিল!

মিতা, আমায় মাফ করো। হঠাৎ এই যে দুর্বলতা আমায় পেয়ে বসেছিল তার জন্য মাফ করো!

সেদিনই রাতে দেবল রবিন আর উরায়মের সঙ্গে দেখা করতে গেল। অনেক দিন ওদের সঙ্গে দেখা হয় নি। ওরা দুজনেই প্রথম ডিভিসন তিন নং গেরিলা রেজিমেণ্টের সভ্য। কাজ হচ্ছে জঙ্গী বিভাগে, অর্থাৎ লড়াই করতে যাবে। তার আগে নতুন সৈন্যদের যুদ্ধ করতে শেখানই তাদের বড় কাজ। ইতিমধ্যে নেতাজী রেঙ্গুনে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি রেজিমেণ্টও মালয় থেকে এসেছে। সর্বত্রই সাজ-সাজ রব।

তিন বন্ধুতে আবার একসঙ্গে নিবিড় হয়ে বসল। প্রথমেই উরায়ম দেবলের মাথা থেকে পা পযন্ত একচোখ দেখে নিল। তারপর ওর পিঠে চাপাল বিরাশী সিক্কা ওজনের একখানা চড় নয়, চাপড়। চোখে দুষ্টামির ঝিলিক হেনে বলল,—কি দেবল-ভাই, বেতার দেখি তোমাব খুব পছন্দসই হয়েছে? মুখখানাতে যে বেশ জেল্লা দেখছি। বলি, ব্যাপার কি?

লজ্জা নয়, আনন্দ ওর মুখকে আরো উজ্জ্বল করে তুলল।

—হুঁ, দেবল-ভাই। তোমার পেটে অনেক কথা আছে দেখছি। জান ত সেই ফরাসী কথাটা?

—কোন্ কথাটা আবার? ফরাসী যে চিজটির সঙ্গে তোমার প্রেম, সে ত হচ্ছে বোতল। বাক্য নয়।

উরায়ম হেসে ফেলল। রবিনের পাঁজবে একটা গুঁতো দিয়ে বলল,—সিলি গোট্ কাকে বলে দেখ ত রবিন? আরে, বোতল যখন বন্ধ, তখন বাক্যই ত ছিপি খুলে উপচিয়ে পড়ে। পিউরিটান দেবলের হাতে পড়ে আমাদের বেতারের যে কি অবস্থা হচ্ছে তা ভাবতেই কষ্ট হয়। সেজন্যই ত ফরাসীর খবরাখবর নিচ্ছি। ওরা কোন ব্যাপারের অন্ধি-সন্ধি না পেলেই সেটাকে নারী-ঘটিত বলে ধরে নেয়। নিদেনপক্ষে হদিশ মিলবে কোন মেয়ের কাছে। তাই বলে—মেয়েটিকে তালাশ করে দেখ; সার্সে লা ফেম্। ভেবে দেখ, জীবনের কত গভীর তথ্য এর ভিতরে লুকান আছে।

রবিনও খুব খুশী হল এ কথাতে। বলল,—সংসারটা সৃষ্টি হয়েছে উরায়মের জন্যই। বাবা উরায়ম, আমায় তোমার চেলা করে নাও। আমিও তোমার মত ডাল আর ফুলকা খেয়ে মানুষ।

—অথবা অমানুষ,—হেসে পাল্টা আক্রমণ করল উরায়ম। আরে, ভাত আব মছলিকা ঝোল খেলে তোমার প্রাণে যেটুকু-বা রস গজাবার আশা ছিল ডাল-রুটিব কল্যাণে সেটা একেবারে সাবড়ে গেছে। এই ধর না, নাচতে শিখেছিলে, রবিন পাখীব মত মিহিসুরে কথা বলতে শিখেছিলে, কিন্তু প্রেম করতে পারলে না।

রবিন গরম হয়ে বলল,—তা হলে আসল কথাটা এবাব বলি। 'ভেতো গাব ধুতো হিন্দুস্থানী জন্মে প্রেম কববাব কোন অধিকাবই নেই। সেইজন্যেই মিলিটারীতে ঢুকেছি। বিলেত-ঘেঁষা হলান ঠিক সেইজন্যেই। বাহুতে যদি না থাকে জোর, জড়াব না কোন নারীকে সে বাহু দিয়ে। "নান বাট দি ব্রেভ ডিজার্ভস দি ফেয়াব।" বীব না হলে বরনারীর যোগ্যই তুমি নও। কিন্তু দেখে নিয়ো এবার দেশে যখন জয়ী হয়ে ঢুকব······

কথাটা শেষ করতে দিল না উবায়ম। হেসে বলল,—দেখবে যে বীরপূজা করবাব জন্য হন্যে হয়ে মেয়েরা তোমার পেছনে তেড়ে ছুটেছে, আর তুমি গা বাঁচাবার জন্য ফক্স-ট্রট নাচের কায়দায় পা ফেলে পালাচ্ছ। কিন্তু আমি কি করব জান ?

দেশে যখন জয়ী হয়ে ঢুকব। দেশে যখন জয়ী হয়ে ঢুকব। শুনতে শুনতে দেবল একেবারে পাথব হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রবিন চেপে ধরেছে উরায়মকে। সে কি করবে তা জানা দরকার। এমন মন-মজানো কিছু-একটা সে বলে বসবে যার টানে হয়ত অনেক সৈন্যই মনে জোর পাবে।

কিন্তু উরায়ম ও পথ দিয়েই গেল না। বলল,—জান জার্মানি থেকে রিবেনট্রপ, ওদের বৈদেশিক মন্ত্রী, স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা হলে তাকে স্বীকার করে অভিনন্দন পাঠাবে বলে নেতাজীকে চিঠি লিখেছে। আমি সে খবরের মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা দেখছি।

রবিন ত লাফিয়ে উঠল,--বাঃ, বাঃ, সেদিন ঈমন ডি ভ্যালেরা আর মুসোলিনীর কাছ থেকেও অমন চিঠি এসেছিল। কিন্তু এ যে তার চেয়েও অনেক জবর খবর।

হাত দুটো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যেন গোটা দুনিয়াটাকে শুনিয়ে উরায়ম হাঁকল,—জার্মানির খবরেই আমি খুশী। তোমার ওই সন্ন্যেসী মার্কা হিন্দুস্থানে আমার পোষাবে না। আজাদী হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি হিটলারের দলে নাম লেখাব। অথচ শর্ত থাকবে যে, শুধু প্যারিসেই থাকব। মিলিটারী অ্যাটাশে বা লেয়াইজন অফিসার হয়ে। তবে কালচারাল লেয়াইজন হলেই আরো ভাল হয়। ওদের আসল মাল দুটোকেই কালচারাল বলা চলে।

উরায়ম গোঁফে চাড়া দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যেন মুনি বসেছে ধ্যানে। কিন্তু কোন্ উর্বশীর জন্যে ?

রবিন, দেবল দুজনেই চুপ করে রইল। ওদিকে মেসে ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। চারিদিকে অন্ধকার। মার্কিন বোমারু বিমান হানা দেয় মাঝে মাঝে। তাই ব্ল্যাক-আউট চলছে। আস্তে আস্তে তৈরী হয়ে নেবার জন্য এই ঘণ্টা।

সে আওয়াজে যেন উরায়মের ধ্যানভঙ্গ হল। সে ফিসফিস করে রবিনকে বলল,—কিন্তু দেবলের মনে যেন কোন কথা ছিল। ব্যাপারটা জানা দরকার। দাও না একটা ডেপথ-চার্জ।

—ঠিক বলেছ। বলি দেবল-ভাই, বেতারের টানে জড়িয়ে পড়লে মনে হচ্ছে। বুক ফাটছে, কিন্তু মুখ ফুটছে না। নতুন প্রেম নাকি !

দেবল বলল,—আমার এই বসে থাকাব কাজ আর ভাল লাগছে না। তোমরা সবাই হিন্দুস্থান দখল করতে যাবে, আর আমি জোয়ান জঙ্গী অফিসার হয়েও রেঙ্গুনে পড়ে থাকব ?

কিন্তু গাজী হয়ে মার্চ করতে করতে কলকাতায় তোমার সুইটহার্টের সামনে গিয়ে মালা পরাবার জন্য মাথা এগিয়ে দেবার মোকা মিলবে—এ হেন গ্যারান্টি তোমায় কে দিয়েছে ? তার চেয়ে এখানে বেশ আছ, থেকে যাও। সব ঠাণ্ডা হবার পর একেবারে আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো সুদ্ধ্ কলকাতায় হাজির হবে। শহিদ হতে হবে না। হুরীরাও অপেক্ষা করবে। তবে ওপারে নয় ; দুনিয়ার এই পারেই। .

—চাই না আমি হুরি আর হাততালি।

—তাও ত বটে। তুমি যে যোগী মহারাজ। বলি, ফৌজের সঙ্গে এলে আগেই কারো দেখা পাবে বলে এঁচে আছ নাকি? আমায় তার সঙ্গে ইনট্রডিউস করিয়ে দেবে ত? পরিচয় করিয়ে দিলে 'রিস্‌ক' নেই এ ভরসা দিতে পারি।

—থাক উরায়ম, তোমার সবটাতেই ঠাট্টা। আমি বসে বসে ক্লান্ত হয়ে গেছি।

—কেন রেডিয়োতে কোন খবর পাওনি নাকি এখনো মায়ের কাছ থেকে?—উরায়মের চোখ দুটো হঠাৎ তার দাড়িরই মত সমবেদনায় চক্‌চক্‌ করতে লাগল।

সব কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে রবিন বলল,--থাক সে-সব কথা। আমি বুঝেছি। ভাই দেবল, তোমায় অভিনন্দন করি। ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।

আট

নেতাজীর বাণী ওদের কানে অভয়মন্ত্রের কাজ করেছে :

"আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মুক্তির কারণ হবে। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জয় হবে। আমাদের কাজ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ নয়া দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদে জাতীয় পতাকা না ওড়ে, যতক্ষণ ভারতের রাজধানীতে প্রাচীন লালকেল্লার মধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বিজয়ের কুচকাওয়াজ না করে, ততক্ষণ 'দিল্লী চলো' এই বাণী মুখে নিয়ে আমরা করব পরিশ্রম, করব লড়াই।"

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ওরা ভারতের মাটিতে প্রথম পা দিল। পুণ্যভূমিতে পৌঁছে ওরা সে মাটি মাথায় তুলে নিল। গাইল ভারত-জয়গাথা। সেদিন থেকে ওদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল!

দিল্লী চলো, দিল্লী চলো—এই ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দল। ওদের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে দিল্লী।

কিন্তু প্রথমে কোহিমা আর মণিপুর দখল করতে হবে। ইংরেজ আর আমেরিকানদের বড় ঘাঁটি আছে সেখানে। তারপর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেমে পড়লে শত্রু আর বাধা দিতে সুবিধা পাবে না। আর বড় ঘাঁটিও নেই।

তার চেয়ে বড় কথা—শত্রুপক্ষের প্রচুর রসদ আর যুদ্ধের সরঞ্জাম আছে কোহিমা-মণিপুরে। একেবারে স্তূপে স্তূপে বোঝাই। শত্রুপক্ষ ভেবেছিল যে ওরা এবার বর্মায় পাল্টা হামলা করে জাপানীদের হঠিয়ে দেবে। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ আর জাপানীরাই যে আগে থেকে পাহাড় ভেঙ্গে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়বে তা ওরা ভাবেনি।

আশ্চর্য্য কথা। একমণ বোঝা পিঠে নিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা দিনে কম-সে-কম পঁচিশ মাইল পথ এগিয়ে আসতে লাগল।

শহীদ-ই-ভারত ক্যাপ্টেন অমুক সিংহের নেতৃত্বে 'পরোয়ানা' নামে একটা কোম্পানী ত একদিন আটত্রিশ মাইল এগিয়ে গেল। বর্মা-সীমান্তের ঘন বনজঙ্গল আর পাহাড়পর্বত তাদের গতিরোধ করতে পারল না।

তা ছাড়া উপায়ই ছিল না। রসদ, যুদ্ধের সরঞ্জাম, জখমী লোক এদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ১নং গরিলা রেজিমেণ্ট অর্থাৎ সুভাষ ব্রিগেডের কাছে মোটে পাঁচটি লরী ছিল। তাও তাদের না ছিল কারখানা, না কোন মেরামতের জন্য কলকব্জার স্পেয়ার-পার্টস্। এমন কি অ্যানিম্যাল ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ খচ্চরের পিঠে মাল বয়ে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত পর্যন্ত ছিল না।

জাপানীদের কাছে যা ছিল তা থেকে ওরা ভাগ দিতে চায় নি। বলেছিল যে, তাদের নিজেদের জন্যই এমন কিছু বেশী যানবাহন নেই। রেঙ্গুন থেকে ট্রেনে মান্দালে আসতেই লাগত পাঁচ দিন। তারপর পায়ে হেঁটে যাতায়াতের লাইন হেড-কোয়ার্টার্স থেকে অত বেশী লম্বা হয়ে গেল যে জাপানীরা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। যেটুকু হয়ত দিতে পারত, বিপদ-আপদের জন্য নিজেদের হাতে সে সব জিনিসপত্র রেখে দেওয়াই ভাল।

অনেক পীড়াপীড়ির পরে বলল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে 'ফ্রণ্টে' এসব আজাদ হিন্দ্‌কে দেওয়া হবে।

গরম পোশাকও আজাদ হিন্দের বিশেষ কিছু ছিল না। চীন হিল পাহাড় এলাকার কালাদান উপত্যকায় শীতে বাঘও কাহিল হয়ে পড়ে, সে কথা সবাই জানে। কিন্তু একটি করে গরম শার্ট আর একটি সুতীর কম্বল এই ছিল মাত্র সম্বল।

আর খাবারের কথা তুললে খিদে বাড়িয়ে দেওয়াই হয়। এক সময় মালয়ের জঙ্গলে লড়াইয়ের সময় সি-র‍্যাশন, কে-র‍্যাশন প্রভৃতি হরেকরকম চটকদার খাবার আকাশ থেকে দেবতার পুষ্পবৃষ্টির মত ঝরে পড়ত। যেখানে আর্মি-মেস নেই সেখানে প্যাক করে খাবার যেত। মাসে মাসে জোয়ানদের ওজন মেপে দেখা হত। বপুগুলি লড়াইয়ে যাবার মত বহাল তবিয়তে আছে কি না যাচিয়ে দেখা দরকার পড়ত।

আর এখন তাদের মোটে দশ দিনের র‍্যাশন নিয়ে বর্মা থেকে রওনা হতে হল। মার্চের পথে খাবার বলে কিছু নেই। বনেবাদাড়েই খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। বর্মা আসামের পাহাড়গুলিতে চড়াই-উৎরাইয়ের সময় যখন এল, ততদিনে অনর্থক খাবারের বোঝা পিঠে বয়ে হাঁটবার দায় ঘুচে গেছে।

'এমার্জেন্সী র‍্যাশন' হিসাবে সম্বল শুধু 'শকরপারা' বিস্কুট। রেঙ্গুনের কারখানায় তৈরী।

নেতাজী নিজে এই বিস্কুট তৈরীর তদারক করেছিলেন। তা শুনে উৎসাহে বেচারা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের খিদে আরো বেশী ধাবালোই হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে শুধু মাথার উপর নয়, চারপাশে এক নাগাড়ে ডাইভ-বম্বিং চলছে। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছে বোমারু বিমান বোঁও বোঁও করে আওয়াজ করতে করতে নেমে এসে আকাশ থেকে বোমা ফুটোচ্ছে, দলে দলে, লাখো লাখো। পাইলট হচ্ছে ম্যালেরিয়াল মশার দল। নেই রাতে ঘুম, দিনে বিশ্রাম। ক্রমাগত শুধু কামান দাগছে। এদিকে ফৌজের সঙ্গে এ. আর. পি. হেলমেট দূরের কথা, মশারী পর্যন্ত নেই।

—কুছ পরোয়া নেই,—হেঁকে উঠল রবিন। ব্রিগেডের সব জোয়ানদের সে হাসিমুখে বোঝাতে লাগল। এই ম্যালেরিয়ার মশার চেয়ে অনেক বেশী মোক্ষম বোমা খাবার জন্য আমরা তৈরী আছি। মশারা কি করবে, মশায়?

—একদম সাফ বাত,—রায় দিল উরায়ম। মশার কামড় খেয়ে-খেয়েই বাঙালীর হিম্মত এত বেশী। এত বছর শুধু ভুঁইপটকা নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়েছে। আমরা ওদের দেশেই প্রথম আস্তানা গাড়ব, তাই মশার কামড় অভ্যাস করে নিচ্ছি।

বলেই সে শুরু করল আজাদ হিন্দের মার্চ করার গান—

কদম কদম বঢ়ায়ে যা,
খুশীতে গীত গায়ে যা।

গান করতে করতে আজাদ হিন্দ দল এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাল ভঙ্গ হল। লাইনের মধ্যে কে যেন পড়ে গিয়েছে। তাই তার পিছনের সকলে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল।

পড়ে গিয়েছে পদাতিক সিপাই কৃষ্ণস্বামী। পাতলা রোগা চেহারা, কিন্তু দেখলেই মনে হয় কর্মঠ। চোখে মুখে মাদ্রাজী বুদ্ধির আলো। উরায়ম সামনে এসে দাঁড়াতেই কৃষ্ণস্বামী তাড়াতাড়ি এক পায়ে উঠে দাঁড়াল। সেই অবস্থাতেই পুরো মিলিটারী স্যালুট দিল।

কি হচ্ছে জোয়ান ভাই—উর্দু'তে উবাযম জিজ্ঞেস কবল।

ইংবেজীতে কৃষ্ণস্বামী উত্তব দিল,—কিছু হযনি, কিছু হয়নি স্যাব। আমি খুব দুঃখিত যে আমাব জন্য আজকেব মার্চেব লাইনে একটা ভাঙ্গন হযে গেল। আমাব খুব দুঃখ হচ্ছে।

উরাযম নিজেই হাঁটু গেডে কি হযেছে দেখতে চেষ্টা কবল। বেচাবা কৃষ্ণস্বামীব পাযে একটা প্রকাণ্ড জংলী কাঁটা ফুটেছে। তা ছাডা দুটো পা ই বাস্তায আব কডা পডে ক্ষতবিক্ষত।

— তোমাব বুট নেই? জিজ্ঞেস কবল উবাযম।

আবাব স্যালুট ঠোকাব কোন দবকাব ছিল না। তবু কৃষ্ণস্বামী বুক ফুলিযে মাথা উঁচু কবে স্যালুট কবল,—না স্যাব, আমাব বুট ছিলই না। আমাদেব ইউনিটে প্রত্যেকেব জন্য বুট যোগাড হযনি জেনে আমি নিজে যেচে বুট ছাডা মাচ কবতে বেবিযেছি।

উবাযম প্রশ্ন কবল,—কিন্তু তুমি ত খুব বেশী শক্ত-সমর্থ নও। তুমি কেন যেচে খালি পাযে মাচ কববাব জন্য এগিযে এলে? তোমাব হাডে সইবে কেন?

দৃঢস্ববে কৃষ্ণস্বামী বলল,—নিশ্চযই সইবে স্যাব। ইংবেজ বাঙালী মাদ্রাজীকে নন মার্শাল (অসামবিক) জাত বলে একঘবে করে বেখেছে। বদনাম দিযেছে যে আমবা লডিযে জাত নই। পাছে আমাদের মাথা ওদেব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বানাবাব গোপন কলকব্জা জেনে ফেলে, লডাইয়েব কাযদা শিখে ফেলে, সেই ভযে আমাদেব সৈন্যদলে নেয় না।

কিন্তু আজ সেই নন-মার্শল জাতেব মধ্যে থেকে নেতাজী বেরিয়েছেন। [illegible] যে [illegible]তে পারি তাব প্রমাণ দেবাব সময় এল। হাজার হাজার বা[illegible]লী-মা[illegible]ী তাদেব আরামে কলম-পে ছেডে দিয়ে আজ আজাদ হিন্দ [illegible] না[illegible] লিখিয়ে মার্চ করে চলেছে

[illegible] উরায়ম বলল,—তা ঠিক কথাই ভাই। কিন্তু তা বলে [illegible]দের এমন করে খালি পায়ে চলা ত ঠিক নয়। মনের [illegible] দিয়ে ত গায়েব হিম্মতেব ঘাটতিকে ঢাকতে পারবে না [illegible]ন্ট্রিতে ঢুকে পায়ে-হাঁটার কষ্ট না করে আর্টিলারিতে

কামান চালানোর কৌশলের দিকে মন দেবে ভবিষ্যতে। ততদিনে আমাদের আর্টিলারি হবে।

ম্লানভাবে মাদ্রাজী বলল,—আর্জি হুকুমত আজাদ হিন্দের জয়! আমি মেশিনগানই চালাতে শিখেছি। জাপানীরা আমাদের আর্টিলারি, এমন কি মর্টাব পর্যন্ত দিল না। মেশিনগানগুলি শুধু মিডিয়াম (মাঝারি) সাইজের। তা ঠিক আছে। চিন্দুইন নদীর পূর্বপারে যখন এসে গেছি, "চার্চিল সাপ্লাই" এর উপর ভাগ বসাতে আব বেশী দেবী নেই। জয় চার্চিল।

গরিলা বেজিমেন্টের তিন নতুন প্রমোশন-পাওযা লেফটেনান্ট কর্ণেল উরায়ম, রবিন আর দেবল সন্ধ্যাবেলা তাঁবুতে বসে কথা বলছে। সত্যিই ইংরেজ আব আমেরিকানদের অফুরন্ত বসদ, জিনিসপত্র, যুদ্ধেব অস্ত্র সাজসরঞ্জাম অর্থাৎ "চার্চিল-সাপ্লাই" ছাড়া আজাদ হিন্দের গতি নেই। মাত্র ত্ব'একটা প্রায় অকেজো বেতারযন্ত্র আব ফিল্ড-টেলিফোন দিয়ে কি আর গরিলা যুদ্ধ করা চলে?

তবু যে ওরা লড়াইয়ের ফ্রন্টে আসতে পেবেছে সেটাই কি কম ভাগ্য নাকি? জাপানী চীফ অফ জেনারেল স্টাফকে নেতাজী এমন ভাবে চেপে না ধরলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যুদ্ধেব জন্য সামনে এগোতেই পারত না।

উরায়ম দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বলল,—জানি না এই যুদ্ধের কি পরিণাম হবে। আমাদের একমাত্র মিত্রপক্ষ হচ্ছে জাপানীরা। অথচ ওরা হয়ত পুরোপুরি আমাদের বিশ্বাস করে না। বরং চেষ্টা করেছে বার বার যাতে আমরা ছোট ছোট দলে ছত্রভঙ্গ হয়ে ওদের তল্পি বয়ে বেড়াই।

রবিন বলল,—আমিও ঠিক সেরকমই শুনেছি। আচ্ছা, জানুয়ারী মাসে নেতাজী যখন বর্মার জাপানী সেনাপতি জেনারেল কয়াবের কাছে রিটার্ণ কল দিতে (পাল্টা দেখা করতে) গেলেন, তখন জেনারেল কয়াবে নেতাজীর কাছে এই রকম একটা প্রস্তাব করেছিল বলে শুনেছি।

উরায়মও সে কথা শুনেছিল। বলল,—হাঁ, তবে ধূর্ত লোক [illegible]। [illegible] অবশ্য অনেক মিঠে কথা বলেছিল। বলেছিল যে নেতাজী [illegible] ঢুকতে চাইবেন, ঠিক তখনই জাপানীরা আমাদের দে[illegible]।

জানত যে ব্রিটিশরা বর্মা আক্রমণ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। অতএব নেতাজীও এখনি হিন্দুস্থানে ঢুকতে চাইবেন। কিন্তু তবু জাপানের মৌখিক ভদ্রতায় ভুলে থাকা ঠিক হবে না।

ঠিক কথা—বলে উঠল দেবল। আমিও জানি সে কথা। সিঙ্গাপুরে মার্শাল তেরাউচি এমনি একটা প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু নেতাজী রাজী হন নি। বলেছিলেন যে আমবা চলেছি নিজেব দেশ স্বাধীন করবার জন্য। আমরাই সবাব আগে হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দেব, দেহেব রক্ত ঢালব। যখন স্বদেশের যে টুকরোটুকু স্বাধীন করে নেব সেটুকু আজাদ হিন্দ্ সবকারই শাসন করবে, জাপানীবা নয়। অস্ত্র, গোলাবারুদ, অন্যান্য রসদ যা ইংবেজ-আমেবিকানদের হাত থেকে আমাদের হাতে এসে পড়বে সবই আজাদ হিন্দের নামে দখল করব আমরা, জাপানীবা নয়।

তা ছাড়া নেতাজী শর্ত করেছেন যে কলকাতার নিরীহ বেসামরিক লোকের উপর কিছুতেই বোমা ফেলতে দেবেন না। নিজের দেশের লোকের, যাদের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি তাদের বোমা মেরে শত্রুতে পরিণত করা চলবে না।

—অবশ্য, অবশ্য। দাড়িতে আরো বেশী মমতা দিয়ে হাত বুলোতে লাগল উরায়ম। অবশ্য তাই হবে। দেশ আমাদের, স্বাধীন করব আমরা। জান ত, নেতাজীর হুকুম জাপানীরাও মানতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুস্থানে যখন আমরা ঢুকব, শুধু আজাদ হিন্দের ট্রাইকলার (তেরঙ্গা ঝাণ্ডা) সেখানে উড়বে। ইম্পিরিয়াল নিপ্পনের ঝাণ্ডা নয়। এমন কি, জাপানী সিপাইরা আমাদের গায়ে হাত তুলতে গেলে তাদের তখনি গুলি করার ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছেন নেতাজী। নেতাজী কি জয়!

[illegible] মাথা নাড়ল,—সবই ঠিক। তবু একটা গলদ রয়ে গেছে। [illegible]টো আলাদা ফৌজ। কিন্তু আমাদের সেনাপতির চেয়ে মেজর [illegible]ামোটো সিনিয়র বলে তারই হুকুম শেষ পর্যন্ত মানতে হবে।

[illegible], তা হোক। তাতে কিছু আসে যায় না, রবিন। উরায়ম [illegible]আমাদের জাপানী জঙ্গী আইন আর্মি-অ্যাক্টের আওতায়

ফেলতে পারেনি সেটাই খুব বড় লাভ। আমাদের পক্ষের মাঞ্চু আর্মি, নানকিন্ আর্মি, থাই আর্মি সবাই জাপানী নিয়মে চলতে বাধ্য হয়েছে।

শুধু নেতাজীর দূরদৃষ্টির কল্যাণেই আমাদের আই.এন.এ. অ্যাক্ট আগে থেকে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আর উনি কিছুতেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে জাপানী সরকারের আইনের তাঁবে আসতে দেবেন না।

দেবল বাধা দিয়ে বলল,—কিন্তু ভেবে দেখ যে তা নিয়ে নেতাজীকে কি রকম পদে পদে জাপানীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঝগড়াটা গড়াল টোকিয়ো পর্যন্ত। টোকিয়ো সরকার নেতাজীর কথা মানতে বাধ্য হল। তখন জাপানী সেনাপতি দাবী করে বসল যে জাপানী সৈন্যদল যখন সাজসরঞ্জাম, সংখ্যাবল, লড়াইয়ের ইতিহাস সব দিক দিয়েই সিনিয়র তখন আমাদের অফিসাররাই ওদের অফিসারকে দেখলে আগে সেলাম করতে বাধ্য। উনি কিছুতেই রাজী হলেন না। হিন্দুস্থান জাতি হিসাবে জাপানীদের চেয়ে সিনিয়র। কাজেই অন্ততঃপক্ষে সমান-সমান পদের তু'জন অফিসার মুখোমুখি হলে তু'জনকেই একসঙ্গে পরস্পরকে সেলাম দিতে হবে।

বন্ধুত্ব হয়, সন্ধিস্থাপন হয় শুধু সমানে-সমানে।

উরায়মের চোখে ঝিলিক হেনে গেল,—অতি উত্তম কথা। সেলাম না হয় একসঙ্গে করবে, কিন্তু জান ত যে সেয়ানের মার আসে শেষ রাত্রে ?

—অর্থাৎ ? অর্থাৎ ?

—বহুৎ সাফ বাত! হিন্দুস্থান যখন দখল হয়ে যাবে তখন যদি জাপানীরা জোর করে দেশ দখল করে নিতে চায় ?

হাতের মুঠো জোর করে চেপে ধরল দেবল। বলল,—'বন্দে মাতরম্' ! আমরা দেশের মাটিতে পা দিলেই দেশের লোক সাড়া দেবে। বাঙলাদেশ বোমা আর ভাঙা রিভলভার নিয়ে শুধু হাতে পর্যন্ত লড়েছে। সেই বাঙলায় আমরা হাজির হব "চার্চ্চিল-সাপ্লাই" সঙ্গে নিয়ে। আট কোটি লোক জয়ধ্বনি করবে 'বন্দে মাতরম্'। আট কোটি লোক, উরায়ম। ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই। আটত্রিশ কোটি সে ডাকে সাড়া দেবে সঙ্গে সঙ্গে। [illegible]রেল

যামামোটো আর তার সাকরেদেরা মীরজাফরী করতে কোন মোকা-ই পাবে না।

—আর তখন যদি তোজো আর হিটলারে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বনে যায়?—আড়চোখে উরায়ম রবিনের দিকে তাকিয়ে যেন ওকেই প্রশ্ন করল!

দেবল ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলল,—নেপোয় মারবে দই? নেভার নেভাব। কভি নেহি। মহাত্মাজীকে উদ্দেশ করে নেতাজীর বক্তৃতা আমিই বেতারে দেশে পাঠিয়েছিলাম। তাতে নেতাজী বুঝিয়ে বলেছেন যে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'-ই হচ্ছে দুর্বলের একমাত্র খাঁটি রাজনীতি। ইংরেজ যদি মার্কিনের কাছে হাতজোড় করে সাহায্য নিতে পারে, অসহায় ভারতও জাপানীর কাছে সাহায্য নিলে কোন অন্যায় হয় না। চাণক্য থেকে মার্কিন জর্জ ওয়াশিংটন আর ইটালির গ্যারিবল্ডি পর্যন্ত সবাই এই নীতির সাহায্য নিয়েছে। আটত্রিশ কোটি লোক, ইংরেজ-মার্কিনের লড়াইয়ের সরঞ্জাম আর আমাদের শিক্ষা—এ মিলিয়ে আমরা নতুন একটা শক্তি হয়ে যাব। তা ছাড়া জার্মানরাও জাপানীদের চেয়ে কম-জোর হয়ে যেতে রাজী হবে না। কাজেই আমাদের কোন 'রিস্ক', কোন ভয়ের সম্ভাবনা নেই। শুধু একবার তোরা মা বলে ডাক। একবার সবাই মিলে বল ভাই—

'বন্দে মাতরম্'

কিন্তু লড়াই করতে এসে এ-হেন গরম বক্তৃতার সময় কোথায়? সুবিধাই বা দিচ্ছে কে? বাইরে হঠাৎ খটাখট আওয়াজ। দুমদাম হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ছোড়ার শব্দ। অনেকগুলি পায়ের দপাদপ, কিছু দিব্যি দেওয়া, কিছু গালাগালি, নিকট সম্বন্ধের কোন ইংরেজ কন্যার ভাইয়ের কম-সে-কম চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার—সাফ্ হিন্দুস্থানী ভাষায়।

একজন টমিকে পাকড়িয়ে নিয়ে এসেছে কয়েকজন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জোয়ান। প্রত্যেকের হাতে বেয়নেট-বসানো বন্দুক। বন্দী একটু পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করবে। ভয় দেখানোর জন্য নয়, একেবারে প্রাণে মারবার জন্য।

উরায়মই প্রথম এগিয়ে এল। তাকে ভাল করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে যাচাই করে নিল। অস্ফুট স্বরে বলল,—বা, বেশ ত দেখছি খেয়ে দেয়ে পুরুষ্টু পাঁঠাটির মত। বলি, টমি মহারাজ, "বিস্কিট লব একস্ট্রা অর্ডিনেয়ার" যে রোজ বেশ প্রেমসে খাও সে ত চেহারাতেই মালুম দিচ্ছে। বলি, বাকী আছে কিছু তোমার হ্যাভার-স্যাকে (ঝোলায়) এই অভাগাদের জন্য ?

জোয়ানরা সেলাম করে বলল,—স্যার, এই টমিটা অন্ধকারে একটা রেডিয়ো-সেট নিয়ে গুটিগুটি পাহাড় চড়াই করছিল। আমরা পিছন থেকে লাফিয়ে ধরে ফেলেছি। ওর সঙ্গীরা পালাচ্ছিল। গ্রেনেড ছুঁড়েছি অনেকগুলো। কিন্তু অন্ধকারে ঠাহর হল না যে ওরা মরে পড়ে আছে, না পালিয়েছে।

ফৌজের অগ্রগামী 'অ্যাডভান্স কলাম' হিসাবে এরা এগিয়ে আছে। তিন লেফটেনান্ট-কর্ণেলের নিজেদের লাইনের কাজ ঠিক বাঁধা ছিল। রবিন তখনি কয়েকজন জোয়ানকে নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে চলে গেল। দেবল রয়ে গেল। সব খবর টমির পেট থেকে বের হলে রেডিয়ো-সেট নিয়ে তাকেই কাজ চালিয়ে অজানা দেশে এগিয়ে যেতে হবে। এদের মধ্যে সেই-ই হচ্ছে মিলিটারী ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ সামরিক গোপন খবর, তথ্য এসব জিনিসের জন্য বিশেষজ্ঞ।

উরায়মের খেয়াল হল যে, যে মহা সুখাদ্যটির নাম নিয়ে ঠাট্টা করেছে তা জোয়ানরা বুঝতে পারবে না। অথচ যদিও কড়া সামরিক ডিসিপ্লিন মেনে সবাই চলেছে—একটা হাসিঠাট্টার কথা উঠলে মজাটুকু সবাই মিলে ভাগ করে উপভোগ করা হয়। তা না হলে শুধু হুকুমের জোরে কি জোয়ানরা এত কষ্ট সহ্য করে এত সাহস দেখাতে পারত ?

কাজেই সে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল,—কি হে ব্রিটিশরাজের অগ্রদূত, কথাটা যেন বুঝতে পারলে না ? বলি পরের এলাকায় ত চোরের মত ঘুরেছ। কিন্তু নিজের দেশের রাজভোগ ত আর. এ. এফ. ঠিকমতই যুগিয়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে। বিস্কুট, চকোলেট, খেজুর, কিসমিস, পনীর এসব

দিয়ে বানিয়ে যে টিন-বোঝাই খাবার তোমাদের জন্য আকাশ থেকে ফুলের মত ঝরিয়ে যায় তার আস্তানাটা এবার আমাদের বলে দাও ত যাদু!

টমি চুপ করে রইল।

একজন জোয়ান খাবারের নামে পাগল হয়ে এগিয়ে এল। সেলাম করে বলল,—কর্ণেল সাব, টমিগান ছাড়া টমি শা—কোন কথাই বলবে না। প্রথমে একটু ঠাণ্ডি পোলাও দিয়ে দিই।

কথাটা শুনে টমির সারা দেহ কেঁপে উঠল। কিন্তু ঠোঁট খুলল না একটুও। শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার নীল চোখে ইস্পাতের আলো!

উরায়ম হাত নেড়ে জোয়ানকে বারণ করল। হিন্দুস্থানীতে বলল যে ইংরেজ বাচ্চাকে ভয় দেখিয়ে মুখ খোলানো যাবে না। দেখা যাক হাসি-ঠাট্টায় মন খোলানো যায় কিনা।

তারপর বলল,—বাঃ, সাজপোশাকে বেশ ত 'ক্রিসমাস-ট্রি'র মত চেহারাখানা খোলতাই হয়েছিল দেখছি। চমৎকার লেদার জার্কিন (চামড়ার হালফ্যাসানের গরম কোট), ক্যামেল-হেয়ার ওভারকোট, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট, ছুরি কাঁটা চামচ, বুটের ফিতে সমেত কিট-ব্যাগ আর কাশ্মিরী কম্বল পর্যন্ত। বাঃ বাঃ, তা দাও ওই বুট আর কম্বল আমাদের কৃষ্ণস্বামীর জন্য। তার পক্ষে এগুলো বড় দরকার। এর চেয়ে বেশী দরকারী কিছু তুমি তোমার নাতি-নাতনীর জন্য উইল করে দিয়ে যেতে পারবে না।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। টমি কিন্তু একেবারে নির্বিকার। যেন মানুষের ভাষা, হাবভাব কিছু বোঝে না।

উরায়ম ওকে একটা খড়ের গাদায় বসতে বলল। নিজেও বসল একটা খড়ের স্তূপে। তারপর সব জোয়ানকে তাঁবুর বাইরে গিয়ে পাহারা দেবার জন্য ইসারা করল। শুধু উরায়ম আর দেবলের রিভলভার ভিতরে পাহারার জন্য তৈরী রইল।

গলার স্বরে বেশ একটু বন্ধুত্ব আর ঘনিষ্ঠতার আমেজ মাখিয়ে উরায়ম বলল—দেখ টমি, তোমার চেহারা আর আউটফিট (সাজ-পোশাক) নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য আমি দুঃখিত। তার জন্য কিছু মনে করো না। মার্কিন

দোস্তদের কল্যাণে তোমাদের সবকিছুই সঙ্গে আছে, মায় মশার হাত থেকে মুখ ঢাকবার মশারির ঘোমটা পর্যন্ত। তা, এস এক বোতল মদ তিনজনে ভাগ করে খাওয়া যাক। এ ছাড়া আর কোন জিনিসই আমার কাছে নেই যা তোমাকে আমি অতিথির সেবা করবার জন্য এখন দিতে পারি।

—মদ? ড্রিঙ্ক? তোমাদের কাছেও হুইস্কি আছে নাকি?—এই প্রথম মুখ খুলল টমি।

—হুইস্কি? একেবারে জনি-ওয়াকার মার্কা আছে। ১৮২০তে জন্ম, এখনো মার্চ করে চলেছে। সেই হুইস্কি আছে, জর্জ। তবে কথা হচ্ছে কিনা যে আমাদের কোয়ার্টার-মাস্টার (রসদদার) সিন্‌হা বড় মরালিস্ট। নীতিবাগীশ। ওর জন্য আমাদের হুইস্কি, ব্রাণ্ডি এসব স্বর্গসুধা পান করার বহু অসুবিধা হয়। তুমি ওকে একটু ভজাও না, জর্জ। তাতে তোমারও সুবিধে; আর আমারও বরাত খুলে যেতে পারে। গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ মেরে গেছে।

--এগজাক্‌ট্‌লি সো। আমারো সেই দশা--বলে উঠল টমি। বেচারার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল।

উরায়ম বলল,—তবু সিন্‌হা আমাদের বিয়ার পর্যন্ত দেয় না।

—সে কি কথা? টমি অবাক হয়ে গেল। তোমরা এক সঙ্গে আছ, এক ইউনিটে। একই তাঁবুতে। তবু একজন নেহাত নিরেট পাদ্রী গোছের বলে বাকী সবাই একটু নির্দোষ ভাবে গলা ভেজানো থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে? এইজন্যেই ত ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কমরেডশিপ (সাথিত্ব) হয় না কখনও।

—ঠিক বলেছ জর্জ।

দেবল এবার ব্যাপারটা হাতে তুলে নিল। বলল,—এই দেখ না, আমাদের বন্ধুর এত বড় দাড়ি গজিয়ে গেছে। এত বেসামাল ভাবে বেশী গজিয়েছে। কিন্তু তবু দাড়িটা অন্ততঃ একটু ছেঁটে ফেলতে রাজী হচ্ছে না। ওকে যদি তোমার আয়নাখানা দেখাতে পারতাম, নিজের মুখের চেহারা দেখে ওর চৈতন্য হত। দাও না তোমার আয়নাখানা একবার।

—আয়না? আমার সঙ্গে ত কোন আয়না নেই।

—এখন নেই? আহা বড় আফসোসের কথা। কিন্তু ইস্যু ডিপো থেকে

নিশ্চয়ই তোমায় দিয়েছিল। এমন কি যার চেহারা মোটের উপর খারাপ বলে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে চায় না, তাকেও স্টোর থেকে আয়না দেওয়া হয়। আর তোমার ত আয়নায় দেখবার মত চেহারা।

ফস করে টমি বলে বসল,—অবশ্য আয়না দিয়েছিল আমাকে।

—কিন্তু সেটা তুমি বোধ হয় কোন পাহাড়ী জংলী অপাত্রকে দান করে ফেলেছ? নিশ্চয়ই করেছ। আমি গনৎকার কিনা। তাই বুঝতে পেরেছি। আর তোমার সিগারেটের প্যাকেটগুলোও তাকে দিয়েছ নিশ্চয়।

টমি একটু জমে উঠতে লাগল। বলল,—কি করে তুমি জানলে যে আমি আমার কোন সাবল্টার্ণকে দিয়ে দিই নি।

—গনৎকার না হলেও বলতে পারতাম, জর্জ। তোমার আয়নাটা যদি রূপো দিয়ে বাঁধানও হয়ে থাকে তবু তা সে নিতে রাজী হবে না। ধর, পাহাড়ে জঙ্গলে তুমি তোমার নিজের অধীন 'সাব'কে খুব দাক্ষিণ্য দেখিয়ে এহেন সুন্দর আয়নাটা দিতে চাইলে। সে খুব বিনয় দেখিয়ে মাপ চাইতে চাইতে বলবে—বহু ধন্যবাদ স্যার, কিন্তু খুব আফসোসের কথা যে ওটাতে আমার বর্তমানে কোন দরকার নেই।

উরায়ম খুব বড় দার্শনিকের মত মাথা নাড়ল। অত্যন্ত ঠিক কথা। পাহাড়ে জঙ্গলে লড়তে বেরিয়ে দাড়ি কামানো একটা ভীষণ বিলাস। ক্ষমা করা যায় না তা।

দেবল একটু যেন গনৎকারের মত পোজ নিল। এদিক সেদিক চোখ পালটিয়ে, আঙুল মটকিয়ে বলল যে,—তার চেয়ে বরং এই সব নাগাদের আয়নাটা সিগারেটটা দিয়ে দিলেও ওটার সদ্ব্যবহার হয়। তা শুধু আয়না কেন, সাবানের টুকবোটাও দিয়ে দেওয়া যায়। এটাই বা আর কি কাজে লাগবে? বরং ওই নাগা পাহাড়ীদের কাছে সাবান, আয়না, ফালতু মোজা-মাফলার এসব কত শখের জিনিস।

টমি নাগাদের কথাতে খুব মজা পেল। উৎসাহ করে বলে গেল,—আশ্চর্য, তুমি স্রেফ ভোজবাজী দিয়ে ধরে নিয়েছ যে একটা নাগা গাঁও-বুড়াকেই আমি আয়না, সিগারেট, সাবান, মোজা এসব দিয়ে দিয়েছি। লড়াইয়ের বাজারে সব কিছুরই তোমাদের দেশে অনটন। তার কল্যাণে

কী চমৎকার পোশাক পরেছিল নাগাদের সর্দার। পরনে শুধু হাঁটু পর্যন্ত মোটা কাপড়। কিন্তু গলায় ঝুলছে মোটা মালা। তাতে দুলছে কী চমৎকার সব মাল। মদের বোতলের ছিপি, বিয়ারের টিনের মুখ, বোতাম, মায় সুতোর গুলি পর্যন্ত। কানে ঝুলছে সেফ্‌টি-পিন আর পায়ে জড়ানো বেশ কয়েক গজ হাতীর ল্যাজের চুলের দড়ি।

—বাঃ, চমৎকার রোমান্টিক চেহারা ত নাগাদেব! দেবল একেবারে আমেরিকান টুরিস্ট বুড়ীদের মত আহ্লাদে গলে গেল। হাউ টপিং, মাইটি ফাইন—এহেন হালের মার্কিন বিশেষণ আর ভাষা ব্যবহার করে নিজের মনের উচ্ছ্বাসকে একেবারে খুলে ধরল। যেন ময়ূর মেঘ দেখে পেখম মেলেছে।

টমিরও মনে নাড়া পড়ল অত উৎসাহ দেখে। সেও নাগা গাঁও-বুড়ার চেহারা, তার গ্রাম, তাদের যাতায়াতের রাস্তা এসবেব খুব মনমাতানো বর্ণনা দিয়ে গেল। শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে আছে বলে মনেই হল না।

—কিন্তু সে তোমায় কিছু দিল না তার বদলে? ওরা ত খুব অতিথিপরায়ণ হয় বলেই জানি।

—তা অবশ্য কিছু দেয়নি। তবে ওরা খুব সরল আর বিশ্বাসী লোক। তা ছাড়া জানে যে আমাদের খাবার দরকার পড়লে তা দাম দিয়েই কিনে নিই। সেজন্য পুরানো হাঁড়িতে করে ভাঁড়ে ভাঁড়ে চাল যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সে জায়গাটাও দেখিয়ে দিল। বলল—যদি দরকার পড়ে এখান থেকে তোমাদের খাবার দেব। পাহাড়ের পাশে এক ঝাড় রোডোডেনড্রন গাছের তলায় একটা গুহা! কী চমৎকার লুকোবার জায়গা! নাগা সর্দার খুব ভাল লোক। আমাদের বলল—যত চাল চাও নিতে পার, শুধু তার দামটা দিয়ে যেও।

দেবল প্রশ্ন করল,—সেখানে তোমরা নিশ্চয়ই নাগা পাচোয়াই খেয়েছিলে দল বেঁধে?

উরায়ম সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল,—বড় খাসা মাল। কোথায় লাগে তোমার মল্ট-বিয়ার তার কাছে।

দেবল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, –ওহ্! ফর এ বটল অব বিয়ার। আহা

যদি এক বোতল বিয়ার পাওয়া যেত। তা তোমাদের রেগুলেশন ওয়াটার-বটলে ত দেড় পাঁইট করে জল ধরে। তোমাদের মধ্যে অর্ধেক লোক শুধু জল আর অর্ধেক লোক শুধু বিয়ার তাদের বোতলে ভ'রে পরে ভাগাভাগি করে নিলেও ত অনেক পাঁইট বিয়ার তোমাদের সঙ্গে থাকত। তা শ' দেড়েক পাঁইট হবে বোধ হয়। আহা, ইংলিশ মল্টেড বিয়ার! তার কাছে জার্মান পিলস্‌নার বিয়ারও লাগে না। কম-সে-কম দেড়শো পাঁইট।

বিয়ারের সোনালী রঙ আর মধুর তারের কথা মনে পড়ে টমির প্রায় দিশেহারা হবার যোগাড়। ঠোঁট চাটতে লাগল। যেন শেষ বিয়ারের ফোঁটাটুকু এখনো সেখানে লেগে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। তারপর বলল,—আমরা তোমার চেয়ে কম বুদ্ধি রাখি না। ওই রকম করেই অর্ধেক বোতলে বিয়ার ভরে নিয়েছিলাম। কিন্তু দেড়শো পাঁইট নয়, মোটে পঁচাত্তর। তাও কুড়ি মাইলের মার্চের মধ্যেই শেষ ফোঁটাটুকু চেটেপুটে শেষ।

—তা মুখে রোদ পড়লে তেষ্টা বেড়ে যায় বৈকি।

এমন দরদী মনের পরিচয় দেবার জন্য টমি দেবলকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দিল।

দেবলের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল,—ব্রাভো, ব্রাভো জর্জ। তোমরাই বাহাদুর লড়নেওয়ালা। কিন্তু কথা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আফ্রিকা কোর্‌ বা গুর্খা রাইফেল্‌স-এর সিপাইদের বোতলেও ত কিছু বিয়ার ভরে নিতে পারতে? না, ওরা বোধ হয় রাজী হত না?

—রাজী হবার কথাই ওঠে না। আমরা 'রিকনয়টার' (তত্ত্বতালাস) করতে বেরিয়েছি। গুর্খা পাঞ্জাবী ওরা ত শুধু লড়তে জানে চোখ বুজে। চোখ খোলা ত থাকে না ওদের।

—ঠিক বলেছ জর্জ, একেবারে খাঁটি কথা। তোমরা লড় মাথা দিয়ে। তারপর দেবল যেন নিজের মনেই বাংলায় বলল,—চোখ খোলা থাকলে কি আর তোমাদের হয়ে লড়তে আসে।

তার পরই মাথা তুলে দেবল উরায়মকে বলল,—এই যুদ্ধবন্দীকে এখন পাহারাদারদের হাতে তুলে দেওয়া যাক চটপট। আমাদের আর এক মুহূর্তও নষ্ট করবার উপায় নেই।

উরায়ম অবাক হয়ে গেল। বলল,—ব্যাপার কি? হঠাৎ যে তুমি বড় জেগে উঠলে? এই নিশুতি রাতে?

—হ্যাঁ, এখনি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে হবে। ঘুম পেয়েছে।

সংক্ষেপে এই উত্তরটুকু দিয়ে দেবল অর্ডারলিদের হাঁক দিল। ওদের সঙ্গে টমিকে বন্দী হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাইরে।

তারপর দেবল খুব চাপা গলায় উরায়মকে সব বুঝাতে শুরু করল। সে জায়গাটার হাতে-আঁকা ম্যাপ খুলে দেখাল।

—রোডোডেনড্রন ফুল এই নাগা পাহাড়ের জঙ্গলে খুব বেশী নেই। এমন কি শিলং পাহাড়েও বিশেষ দেখা যায় না। কাজেই এখান থেকে পনরো মাইল পশ্চিমে "রিকনয়টার" করতে করতে তাব নজরে পড়েছিল। জায়গাটা যে পাহাড়ের পাশে সেখানে নাগাদের বসতি আছে। ওরা যে সব জিনিস পেলে খুশী হয় সে-সব জিনিসই ইংরেজরা ওদের দিয়েছে। ওদের মনের মধ্যে সেঁধিয়েছে। তা ছাড়া ওই বিয়ারের পরিমাণ হিসাব করলে অন্ততঃ একশো জন ইংরেজ সৈন্য ওদের ওখানে হাজির আছে। দুশমন সবাই ইংরেজ না-হয় মার্কিন হবে। কপাল ভাল যে দেশী সৈন্য ওদের সঙ্গে নেই। আফ্রিকান সৈন্যও নেই। ওরা আবার রাতে মোটেই ঘুমোয় না। ওই জায়গা থেকে আরো পেছনে ওদের আসল আস্তানা মনে হচ্ছে। সেটাই বিপদ। সম্ভবতঃ কুড়ি মাইল দূরে "ইম্ফু ডিপো" আর বড় ঘাঁটি আছে। ঘাঁটিটা থেকে আসতে মুখে রোদ পড়েছে সারা রাস্তা। এই দেখ কম্পাস দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে ঘাঁটি তা হলে কোথায় বসানো হয়েছে। অতএব···

—অতএব, দেবল-ভাই, তোমার জয় হোক। তোমার বুদ্ধি আর আমার বাহু দুয়ে মিলে আমরা দুশমনকে ফৌত করে ছাড়ব। জয় হিন্দ্।

—জয় হিন্দ্! তা হলে আজ রাতেই—

স্বাধীনতার যজ্ঞের কুণ্ডে আজ এই প্রথম আহুতি দেওয়া হবে। শুভলগ্নের দেরী নাই।

উৎসাহে অস্থির হয়ে উরায়ম গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল,

—হ্যাঁ। আজ রাতেই।

নয়

সেই রাতেই।

দেবলের আন্দাজে একটুও ভুল হয়নি। দুশমনের পিকেট অর্থাৎ ঘাঁটির পাহারাদাররা ঘুমোচ্ছিল। না হয় ঝিমোচ্ছিল। পাহাড়ী ঠাণ্ডা আর গরম অস্ট্রেলিয়ান কম্বলকেই সেজন্য দোষ দেওয়া চলে।

এদিকে চাঁদ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত আজাদ হিন্দ্ সৈন্যরা পাহাড়ী খড় আর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। সঙ্গে শুধু হাল্কা অটোম্যাটিক আর রাইফেল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওরা একটা ঘাঁটি ঘেরাও করে ফেলল। তারপর হঠাৎ শত্রুর উপর চড়াও হয়ে সোজা আক্রমণ করল। হঠাৎ হামলাতে পাহারাদাররা একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। তার পরই তাদের মধ্যে একজন আকাশে লালরঙের রকেট হাউই ছুঁড়ে দিল।

সমস্তটা জায়গা লাল আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নাগা গ্রামে যত ইংরেজ পক্ষের সৈন্য পচোয়াই আর খানাপিনার পর নরম গরম মৌতাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল সবাই ধড়মড় করে তৈরী হয়ে নিল।

কিন্তু ততক্ষণে পিকেটগুলি সাফ হয়ে গেছে।

এবার আসল দলটার পালা। গ্রামের যে জায়গাটায় তাদের আসল ঘাঁটি, হেড কোয়ার্টার্স, সেখানে ওরা সকলে আশ্রয় নিল। চারিদিকে কাঁটা-তারের বেড়া।

আজাদী দলের সঙ্গে ট্যাঙ্ক নেই, এমন কি ওই বেড়া উড়িয়ে দেবার মত হেভী মর্টার পর্যন্ত নেই। ওরা যদি তেড়ে বেড়া কেটে ঢুকবার চেষ্টা করে সেই সুযোগে শত্রুর গুলীতে অনেক লোক অযথা মারা পড়বে। কি করা যায়?

উরায়ম লাফিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। হেঁকে ডাকল ইংরেজীতে,—তোমরা না বড় লড়িয়ে সব? হাইল্যাণ্ডার্স বলে মনে হচ্ছে। এসো না বেরিয়ে সামনা-সামনি। কাওয়ার্ডস্।

অবশ্য ধর্মযুদ্ধের যুগ নয়, সম্মুখ যুদ্ধের ত নয়ই। তাই হেভী মেশিনগানের গুলী বর্ষার বৃষ্টিধারার মত ঝরতে আরম্ভ করল। উরায়ম অবশ্য তার জন্য

তৈরীই ছিল। তাই আগে থেকে তৈরী করে বসিয়ে রাখা ইংরেজ পক্ষেরই একটা পাথরের ব্যারিকেড অর্থাৎ আড়ালের সামনে দাঁড়িয়ে এ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। চট করে মাথা নীচু করে সে পাথরের পিছনে গা-ঢাকা দিল।

আর মুখে কথাটি নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে হাইল্যাণ্ডাররা এবার গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসতে লাগল। এত দিন যারা ওদের পায়ের নীচে ছিল আর ওদেরই কাছে অস্ত্র চালানো শিখেছে তারা কিনা কাওয়ার্ড (কাপুরুষ) বলে গাল দেয় !

সাম্রাজ্য যাক, তা সহ্য হয়। তা বলে কাওয়ার্ড? যদি জাপানীরা বলে কাওয়ার্ড, নিরুপায় হয়ে মাথা মীচু করে থাকতে হয়। তা বলে ভারতীয়? নেভার—নেভার!

পাগলের মত ছুটে চার্জ করে তেড়ে এল হাইল্যাণ্ডারের দল। নাঃ, এবার সামনা-সামনি হাতাহাতি লড়েই বান্দাদের শিক্ষা দিতে হবে। রুল ব্রিটানিয়া, রুল দি শ্লেভস্।

এদিকে দেবল নিশ্চিন্ত ছিল না। সে তার কোম্পানী নিয়ে শত্রুর আগুয়ান ঘাঁটিগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে তা থেকে তাদের ভাল ভাল অস্ত্র-শস্ত্র সব যোগাড় করে নিয়েছে। ইংরেজ পক্ষ সাধারণতঃ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। কারণ জাপানীরা ইংরেজের হাতিয়ার বা গোলাবারুদ হাত করতে পারলেও ব্যবহার করতে পারত না। ব্যবহার জানত না। তা ছাড়া অন্য রকমের যন্ত্রে ব্যবহার করার জন্যে তৈরী বলে বেশীর ভাগ অ্যামুনিশনই জাপানী অস্ত্রের পক্ষে অকেজো থাকত। কাজেই হাইল্যাণ্ডাররা নিশ্চিন্ত হয়ে এগোতে লাগল।

দেবল যে-সব রাইফেল আর গ্রেনেড হাতাতে পেরেছিল সেগুলির ব্যবহার তার দলের সকলের কাছেই জানা ছিল। কিন্তু মুশকিল হল যে এই তিন বছরে ইংরেজ পক্ষের হাতিয়ারের সাইজ আর রকম কিছু কিছু বদলিয়ে গিয়েছে। কাজেই সব জিনিস আজাদ দলের পুরানো যন্ত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

এদিকে হাইল্যাণ্ডাররা তেড়ে আজাদ সৈন্যদের গুলী করতে করতে আর

বোমা মারতে মারতে এগিয়ে আসছে। ক্রমাগত রকেট ছুঁড়ে লাল আলোতে জায়গাটা উজ্জ্বল করে দেখে নিচ্ছে—কোথায়, কোন্ কোণায় শত্রু লুকিয়ে রাইফেল চালাচ্ছে। অথচ আজাদ দলের কাছে রকেট নেই। তাই উরায়ম ওদের নির্দেশ দিয়েছে যে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো সারতে হবে। ইংরেজের আলোতেই ইংরেজকে নিশানা করে গুলি ছুঁড়তে হবে।

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হল ভীষণ ভাবে। কেউ কাউকে ক্ষমা করছে না। আমাব মৃত দেহেব উপর দিয়ে না গিয়ে এক তিল মাটিও পাবে না দুশমন। একেবারে দুর্যোধনের পণ।

তবুও কম সৈন্য আর কম হাতিয়ার দিয়ে কতক্ষণ চালানো যায় ?

বেগতিক দেখে দেবল তার কোম্পানীকে হুকুম দিল যে ৩০৩ নং বল অ্যামুনিশন দিয়েই রাইফেল গ্রেনেড চালাও। প্রথমে সবাই অবাক হয়ে গেল। কোন যুদ্ধের কানুনে এ-হেন কথা লেখে না! বিপদে পড়ে কর্ণেল সাহেবের মাথা বিগড়ে গেল নাকি ?

কিন্তু দেবলের হুকুম টলল না।

সে আবার হুকুম দিল। নিজে ছুটে এসে সবার সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশটা গ্রেনেড ছুঁড়ল হাইল্যাণ্ডারদের উপর। নিজেদের সঙ্গে ব্যালিস্টাইট গ্রেনেড কার্তুজ নেই বলে কি শত্রু পার পেয়ে যাবে ? দু' একটা রাইফেল গ্রেনেড না হয় নিজেদের হাতেই ফাটবে, নিজেরাই না হয় কয়েকজন তাতে মারা যাব। কিন্তু শত্রুকে শত্রুরই গোলা দিয়ে ঘায়েল করার আনন্দ কি কম ?

গুরুদক্ষিণা দিতে লাগল দেবল।

একজন ক্যাপ্টেন ওর হাত ধরে মিনতি করল,—দোহাই আপনার, আপনি যা করছেন তাকে শুধু সুইসাইড (আত্মহত্যা) বলা যায়।

দেবল চেঁচিয়ে বলল,—প্রায় হাতিয়ারহীন হয়ে দুশমনের হাতে মরার চেয়ে ওদের মারতে-মারতে মরাই ভাল। ভাইয়োঁ। আউর জোয়ানো, জয় হিন্দ্।

কিন্তু হাইল্যাণ্ডররা জঙ্গলের লড়াইয়ে হালফিল অনেক তামিল পেয়েছিল। তা ছাড়া ইউরোপীয় যুদ্ধশাস্ত্রে এন্‌সার্কল করা একটা বড়

কায়দা। পাশ থেকে ঘুরে এগিয়ে এসে শত্রুকে ঘিরে ফেলতে পারলে ল্যাঠা সহজে চুকে যায়। ওরা আজাদ দলের এই অদম্য উৎসাহের সামনে টিকতে না পেরে হটে যাচ্ছিল।

কিন্তু ওদের পেট্রলপার্টির কোন কম্‌তি ছিল না। এহেন একটা টহলদার দল লড়াইয়ের সাড়া পেয়ে দূর থেকে এসে আজাদ দলের পিছনের একটা টিলায় উঠে পড়ল। সেখানে মেসিনগান বসিয়ে রকেটের আলোয় হঠাৎ চারদিক উজ্জল করে তুলে গুলি চালাতে লাগল।

চোরের উপর বাটপাড়িই এ হেন অবস্থায় একমাত্র দাওয়াই। হাইল্যাণ্ডাররা টিলায় চড়ে মেসিনগান চালাবার মোকা পেয়েছে। যদি ওদের সুবিধাজনক ঘাঁটিটা দখল না করতে পারা যায়, আজাদ দল বেঘোরে মারা যাবে। দেবল তখনি একজন লেফটেনাণ্টকে একটা ইউনিট দিয়ে টিলা দখল করতে পাঠাল।

কিন্তু সামনা-সামনি পাহাড় চড়াই করা অসম্ভব। উপর থেকে বিনা আয়াসে নির্ঝঞ্ঝাটে দুশমন গুলি চালাবে। তাই অন্ধকারের মধ্যে গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট টিলার পিছনে চলে গেল। ওপাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কখনো বুকে হেঁটে টিলার চূড়ায় চড়ে বসল। যেই হাইল্যাণ্ডাররা আবার রকেট ছুঁড়ল সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনেডের পর গ্রেনেড তাদের উপর এসে পড়ল। তারা এহেন পাল্টা প্রতিশোধ আশা করেনি।

কিন্তু ব্যাপার বুঝে তখনি কয়েকটা মেসিনগানের মুখ চাকা ঘুরিয়ে আজাদ দলের দিকে তাক করে নিল। গ্রেনেড বা মর্টার পাহাড়ের উপরের দিকে ছোড়া জুত হয় না। কিন্তু মেসিনগানের সে অসুবিধা নেই।

তবু মোটের উপর আজাদ দলের কিছু কম অসুবিধা হবে। ওরা তেড়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে নীচের দিকে একটু একটু করে নামতে লাগল। যেমন করেই হোক পাহাড় থেকে জঙ্গলের দিকে মুখ করা মেসিনগানগুলোর মুখ বন্ধ করতে হবে। তা হলেই আজ লড়াই ফতে হয়ে যাবে।

কিন্তু হায়, ওদের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আর্টিলারী, ভারী দূর-পাল্লার কামানের গোলার সাহায্য। সেই সব গোলা অনেক দূরে দুশমনের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরতে থাকে ; দুশমন হয়ে যায় ব্যতিব্যস্ত। এদিকে যতখানি

জায়গা ধরে গোলার পাল্লা চলছে ততখানি জায়গায় যেন ছাতার আড়াল তৈরী হয়ে যায়। ততখানি এগিয়ে আসে সৈন্যরা বিনা বাধায়। বিনা অসুবিধায়।

না থাকুক কামানের আশ্রয়। বুকে আছে সাহস, মনে আছে দেশের জন্য ভালবাসা। এ ত বহুদূর বিদেশে সাম্রাজ্য সামলাবার জন্য লড়াই নয়। কাজেই লেফ্‌টেনান্ট মনসুর সবার আগে এগিয়ে টিলার চূড়ো থেকে মেশিনগানের ঘাঁটির দিকে নামতে লাগল। ওর দলের উপর বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়তে লাগল। মনসুরের গায়ে তেরটা গুলি বিঁধল। সে পেট চেপে পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়ল। হাত থেকে খসে গেল রাইফেল।

সঙ্গের সৈন্যরা একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। দলপতি পড়ে গেছে। মরে যাচ্ছে। তাদের আর এগোন কি বুদ্ধির কাজ হবে ?

মনসুর বুঝতে পারল। সিংহের মত গর্জন করে উঠল,—ভাইয়োঁ। ঔর জোয়ানোঁ. নেতাজী কি জয়! চলো আমার সাথ।

এই বলে সে রাইফেলটা আবার কুড়িয়ে নিল। পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও বাকী নেই। সে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

তার সঙ্কেত বুঝে নিল বাকী সবাই। ওরাও শুয়ে পড়ল। নীচের দিকে গড়াতে শুরু করল। মাঝে মাঝে তাক করে গ্রেনেড ছোড়ে, আবার গড়িয়ে নামতে থাকে। উপরের দিকে মুখ তোলা মেসিনগানের গুলি আর ওদের ছুঁতে পারল না। টপাটপ বেরিয়ে এদিক সেদিক পাথরে ঠকাঠক লেগে ছিটকিয়ে যায়। অথচ গ্রেনেড ঠিক চলে।

এমন করে লড়াই হতে-হতে সব মেসিনগানই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যে কজন হাইল্যাণ্ডার বাকী ছিল তারা মরিয়া হয়ে তেড়ে এল। বেয়নেটে বেয়নেটে লড়াই। কিন্তু যারা উপর থেকে নীচের দিকে নামছে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কি করে ? সবাই ওরা শেষ হয়ে গেল। গড়াতে গড়াতে মনসুরের মৃতদেহ একটা মেসিনগানের গাড়ীর চাকায় এসে আটকিয়ে রইল। জয় হিন্দ্‌।

এদিকে সামনের এলাকায় উরায়ম সিং-এর দল খুব মুশকিলে পড়েছে।

ব্রিটিশপক্ষের আরো অনেকগুলি টহলদার দল এদিক সেদিক কয়েক মাইলের মধ্যেই ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছিল। তারা নিশুতি রাতে রকেটের আলো আর গুলির আওয়াজ থেকে বুঝতে পারল যে দুশমন হামলা দিয়েছে। বেপরোয়া হয়ে পায়ে-হাঁটা পথের উপর দিয়ে জীপ চালিয়ে তারা এই নাগা গ্রামের দিকে এগিয়ে এল।

এবার ওদের দল খুব ভারী। তারা কাছে এসেই চটাপট কয়েকটা মেসিনগানের নেস্ট অর্থাৎ বাসা বেঁধে নিল। তাদের গুলি যেন একটা আগুনের দেওয়াল তৈরী করল। সে দেওয়াল ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তাকে বাধা দেয় সাধ্য কার?

এক যদি ট্যাঙ্ক থাকত।

কিন্তু ট্যাঙ্ক জিনিসটা যে যুদ্ধে লাগে তা আজাদ দল এতদিনে প্রায় ভুলে গেছে।

উরায়ম মরিয়া হয়ে বুকে হাত ঠুকে বলল, ভাই সব, জোয়ানের বুকের পাটা ইস্পাতের চেয়ে যে বেশী শক্ত তার প্রমাণ দাও। আমি পাঞ্জাবে স্পোর্টসে "ডিসকাস থ্রো"—চাকতি ছোঁড়াতে যে প্রথম হয়েছিলাম তার প্রমাণ এই দেখ।

দু'হাতে দুটো গ্রেনেড। মূর্তিমান যমের মত সে ছুটে এগিয়ে গেল একটা পাহাড়ী মোটা গাছের আড়ালে। তাক করে ছুঁড়ল সামনের জিপটাতে। জিপ আর তার সিপাইরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্! নেতাজী কি জয়!

এমনি ভাবে সে সবাইকে নতুন উৎসাহে মাতিয়ে তুলল? যেন পুকুরে খেলার ছলে খোলামকুচি ছুঁড়ছে সবাই। জঙ্গলের মধ্যে জীপ আর কতটুকু ঘোরাফেরা করতে পারবে? চটপট করে মোড় বদলানোও সহজ নয়। ততক্ষণে যে জীপের শত্রুসৈন্যরা খতম হয়ে যায়, সে জীপের ভাঙ্গা কঙ্কালটাই নতুন আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে দেবল আর রবিনের দলও এগোতে এগোতে পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু রক্ষা নেই। জঙ্গলের একটা নালার মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে ছিল দু'জন ইংরেজ অফিসার। ওদের ইংরেজ লাইন থেকে খুব তাড়াতাড়ি

লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্ম সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই দলের সঙ্গে আসতে পারেনি। এসেছিল অনেক পরে।

ততক্ষণে ওদের আগুয়ান দলগুলিকে ঠেকিয়ে দিয়েছে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী। এমন কি ওদের একটু একটু করে কোণঠাসা করে হটিয়েও দিচ্ছে।

এমন সময় এই দুই ইংরেজ অফিসার এসে হাজির হল। এরা মেজর জেনারেল উইনগেটের বাছাই-করা "চিনডিট" বাহিনীতে হাত পাকিয়ে এসেছে। জঙ্গল-যুদ্ধে এদের চেয়ে বেশী ওস্তাদ লোক নাকি আর পাওয়া যাবে না। বর্মার ভিতরে চিন পাহাড়েব এলাকাতে হঠাৎ হামলা দিয়ে লড়াই করতে ওস্তাদ ব্যানডিট অর্থাৎ ডাকাত বলে সেবা লড়নে-ওয়ালাদের নাম ছিল চিনডিট।

এই দুই চিনডিট সর্দার নালায় লুকিয়ে অব্যর্থ তাক করে মেশিনগান চালাতে লাগল। চট করে ওদের হদিশ না পেলে মেশিনগানের মার বন্ধ হবে না। একজন আজাদ সেনা একটা গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু গুলিটা ঠিকমত শরীবে ঢুকতে পারেনি। বুকের কাছে সিগারেট কেসের বদলে একটা লোহার ছোট বাক্স ছিল। তাতে প্রথমে লেগে গুলিটার জোর কমে গিয়েছিল।

দেবল চট করে ছুরি দিয়ে টেনে গুলিটা বের করে নিল। হাতে করে এপাশ ওপাশ নেড়েচেড়ে বলল,—বুঝেছি, বুঝেছি, এটা হচ্ছে টমসন সাব মেশিনগান। এর পাল্লা খুব বেশী দূর নয়। নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে লুকিয়ে এটা চালানো হচ্ছে। অতএব দুশমন হাতের কাছেই আছে। জয় হিন্দ্!

কিন্তু আজাদী দল ওদের খুঁজে বের করার আগেই ওদের দলের একজন ইংরেজ নালাতে ফিরে এসে আশ্রয় নিল। ভয়ে তার দুটো ঠোঁট জমে এক হয়ে গেছে। যেন শক্ত আঠা দিয়ে একসঙ্গে আটকিয়ে দিয়েছে কেউ। তার পরনের পায়জামা আধখানা ছিঁড়ে গেছে। আজাদী দল হঠাৎ চড়াও হওয়াতে সে ইউনিফর্ম পরবার সময় পায়নি। পায়জামা বোধ হয় কোন কাঁটাগাছে আটকিয়ে গিয়েছিল। বেচারী দৌড়ে পালাবার সময় কাঁটা

ছাড়িয়ে নিতে সময় পায় নি। তার হাতে বন্দুক আছে কিন্তু গুলির পাউচ একটাও নেই।

তার নিজেরই দলের লাল ট্রেসার বলের আলো দেখতে দেখতে সে চারিদিকে শুধু লাল দেখতে শুরু করেছে। বেচারির কচি মুখ রোদে পুড়ে নয়, ভয়ের চোটে লাল হয়ে গেছে।

একজন অফিসার বলল,—টোনি, আমার বোতল থেকে ওকে একটু 'রাম' খাইয়ে দাও। মদ খেলে সাহস ফিরে আসবে।

অন্য জন উত্তর দিলেন,—ঠিক বলেছ ক্রিস। ওর একটু 'রাম'ই দরকার এখন।

মদ খেয়ে মুখ খুলল আস্তে আস্তে। কিন্তু কিছুই লাভ হল না।

ক্রিসকে বেচারী বলল,—আমি যদি বেশীক্ষণ বেঁচে থাকি—চারিদিকে দুশমন থাকা সত্ত্বেও যদি বেঁচে থাকি, তার জন্যই আমার ভি. সি. পাওয়া উচিত। (ভি. সি. অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া ক্রস হচ্ছে ইংরেজ সেনাদলে বীরত্বের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার।)

ক্রিস আর টোনি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারল যে বেচারী টমি হঠাৎ আক্রমণে খুব বেশী ভয় পেয়ে গেছে। এমন বেশী ভয় যে, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একে যদি এখন একেবারে উপেক্ষা করা যায় তা হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে। কাজেই একটু কথা বলা দরকার।

ক্রিস বলল,—ঠিক বলেছ। এই নাও আরেকটু 'রাম'। আর এই হচ্ছে তোমার জন্য গুলি। তুমিও বন্দুক ছুঁড়তে আরম্ভ কর। দুশমন ভেগে পড়বে।

টমি কিন্তু থামল না। বিড়বিড় করে বলে চলল,—কিন্তু আমি ত এখনি মরে যাব। আমার বাবা হয়ত আমার বদলে ভি. সি. পাবে। তার একমাত্র সন্তান। সে ভি. সি. পেয়েছে। উইনস্টন (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল) বাবাকে এসে নিজে হাতে মেডালটা দিয়ে যাবে।

ইংরেজ দল পেছন থেকে হঠাৎ অনেকগুলি ট্রেসার বল আকাশে উড়িয়ে

দিল। শত্রুরা কোন্ দিকে আছে আরেকবার ভাল করে নজর করে দেখা দরকার। এরা তিনজন তাড়াতাড়ি নালাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

টমি চেঁচাতে লাগল,—লাল জল, লাল জল! রবারের হোস-পাইপে করে লাল জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আমার মাথার উপর।

কিন্তু ওদের এসব প্রলাপ শুনবার সময় কোথায়? এই লাল আলোটুকুর সুবিধা নিয়ে দুশমনকে নিশানা করতে হবে। ওরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত রইল। চারিদিকে গোলাগুলির আওয়াজ। কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। কারই-বা মাথার ঠিক থাকে এ অবস্থায়?

হঠাৎ টোনি দেখল টমি হামাগুড়ি দিয়ে নালা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

সর্বনাশ! এখনি শত্রুরা ওদের লুকিয়ে থাকার আস্তানা টের পেয়ে যাবে। তা হলে রক্ষা নেই। টোনি ওর পায়জামার বশি টেনে ধরল। ফিসফিস করে বলল,—ব্লাডি ফুল। দুশমন এখনি তোমায় শেষ করে ফেলবে। খবরদার!

টমি চেঁচিয়ে উঠল। জড়ানো স্বরে পাকিয়ে পাকিয়ে বলল, ইউ ব্লারি অস্সিফার (অফিসার), আই স্স্লিউট (সেলাম করি) ইউ। ব্লারি অস্সিফার, লেল্মি গো (আমায় যেতে দে, পাজী)।

টোনি কিন্তু খুব শক্ত গলায় আওয়াজ করে বলল,—ডানকার্ক থেকে সমুদ্র পেরিয়ে পালাবার সময় সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল। তবু এখানে নালায় শুয়ে নিরাপদে আছি। তুমিও এখানেই থাক।

ছোঃ! ডানকার্ক ছিল এর তুলনায় চড়িভাতির বাগানবাড়ী। ইউ··· প্রভৃতি অকথ্য পাড়াগেঁয়ে গালি দিতে দিতে টমি আবার হামাগুড়ি দিতে শুরু করল।

ক্রিস এসে টমির মুখে ঘুষি চড়িয়ে দিল। একেবারে বিরাশী সিক্কা। কিন্তু একটাতে শানাল না। তাই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথায় মারল আরেকটা ঘা। টমি এবার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল নালার তলায়। এরা দু'জনেও ব্যাপার বেগতিক দেখে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে যুদ্ধও প্রায় শেষ হল। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত পিছু হটে পালিয়ে গেল। রাতের আঁধারের মধ্যেই পালাতে হবে। না হলে আজাদ দলের

হাতে কারো রক্ষা নেই। যেটুকু লড়াই এখানে সেখানে বাকী ছিল তা খতম করে আজাদ দল ইংরেজ পক্ষের হেড-কোয়ার্টার্স সেই গ্রামটাতে ফিরে গেল। শীতের রাত, ঘন কুয়াসায় চারিদিক ঢাকা। পাহাড়গুলি পর্যন্ত যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

সেই রাতেই অন্ধকারের মধ্যেই সবগুলি কুঁড়েঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা শুরু হল। গ্রামের সবচেয়ে উঁচু বাসায় তেরঙা স্বাধীন পতাকা ওড়ানো হল।

দেবল নিজেদের হেড-কোয়ার্টার্সে ইংরেজদলের কাছ থেকে হাত করে নেওয়া বেতারে খবর পাঠাল—"অনেক যোঝাযুঝির পর শত্রুর ঘাঁটি দখল করেছি। বহু লোক মরার পর ওরা ঘাঁটি ছেড়ে রাশি রাশি টিনের ফল, মাখন, জ্যাম এসব ফেলে পালিয়েছে। অনেক অস্ত্র আর গোলা-বারুদও ফেলে গেছে।"

এই বেতারের খবর যেখানে থেকে রেজিমেণ্টাল বেজ অর্থাৎ লড়াইয়ের প্ল্যান যেখান থেকে তৈরী হয়, সেখানে আবার পাঠানো হল।

সেখান থেকে তখনি হুকুম এল—এবার ব্রিগেডের আসল অংশটা কোহিমা রওনা হয়ে যাও। ইম্ফল আমাদের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে বাংলাদেশের হৃদয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

বাংলাদেশের হৃদয়ে! বাংলাদেশের হৃদয়ে! দেবল লাফিয়ে উঠল। জড়িয়ে ধরল উরায়মকে। জড়িয়ে ধরল রবিনকে। বাংলাদেশের হৃদয়ে ঢুকে পড়তে হবে। উরায়ম, তুমি হচ্ছ আমাদের সর্দার-ই-জঙ্গ।

এদিকে আবার চারদিকে লাল আলো ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। ট্রেসার বলগুলি আকাশ থেকে ফেলা হচ্ছে। বোমারু বিমান কয়েকটা এসে পড়েছে ইংরেজদের পিছনকার ঘাঁটি থেকে।

ওরা বুঝে নিয়েছে যে ওদের এই রাতের যুদ্ধে হার হয়েছে। কিন্তু শত্রু নিশ্চয়ই গ্রামের হেড কোয়ার্টার্সে জমা হয়েছে। কাজেই সেখানে বোমা দিয়ে হানা দিতে হবে। তার আগে নিজেদের ছড়িয়ে-পড়া সৈন্যদেরও খুঁজে দেখা দরকার। যাতে তারা নিজেদের দলের বোমায় না মারা পড়ে।

আজাদী দল তখনি ছুটে বেরিয়ে পড়ল। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া আর জংলী নালার খাদে শুয়ে পড়াই বাঁচবার একমাত্র উপায়। জাপানী বিমান ত আর আজাদী দলের মাথার উপর কোন রক্ষাকারী ছাতা মেলে ধরবে না।

কিন্তু এই সন্ধানী লাল আলোর সুবিধা নিয়ে এই টমসন সাব মেশিনগানওয়ালা ইংরেজদের এতক্ষণে লক্ষ্য করা গেল। ততক্ষণে ওদের নালাতে ইংরেজ পক্ষের কিছু ভারতীয় সিপাই জড়ো হয়েছে। ওদের ঘিরে পাহারা দিয়ে রয়েছে।

দু'দলের সেপাইয়ে খুব কাছের পাল্লাতে বন্দুক ছোঁড়া শুরু হল। এক দল লড়ছে শুধু মাইনে পায়, খেতে পয়ে বলে। আরেক দল দেশ স্বাধীন করবার জন্য।

প্রথম দল হার মেনে চেঁচিয়ে উঠল,—হামকো কাহে মারতে হো। মৎ মারো। হাম আপলোককো ভাই হ্যায়। আপলোক কেয়া চাহ্‌তে হো?

শুনে উরায়ম একলাফে এগিয়ে এল। বলল,—তবে তোমরা বন্দুক গুটোও। লড়াই থামাও।

ইংরেজ দলের ভারতীয় সিপাইদের সর্দার ছিল একজন ভি. সি. ও. (ভাইসরয়ের কমিশন্‌ড্‌ অফিসার)। সে বলল,—বেশ, তাই করলাম, এখন বল তোমরা কি চাও?

উরায়ম একা এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। চট করে দেবল বাধা দিল। বলল,—তুমি সিনিয়র, আমায় যেতে দাও শত্রুদের মাঝখানে।

উরায়ম রাজী হল না। দৃঢ়স্বরে বলল,—না, না, দেবল আমাকেই যেতে হবে। সংসারে আমার কোন পিছুটান নেই। কেউ আমার জন্য ভাববার নেই। কেউ ফেলবে না চোখের জল। আমারি যাবার অধিকার।

সে লাফিয়ে এগিয়ে এসে নালার মধ্যে নেমে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল,—ম্যায় তো স্রেফ ইন্‌ দোনো ইংরেজো-কা খুন চাহ্‌তা হুঁ। আপ্‌সে হামারি কোই লড়াই নেহি হ্যায়।

এত কাছে। মরণের এত মুখোমুখি। কোমরবন্ধ থেকে পিস্তল বের করে অব্যর্থ তাক করল উরায়ম। ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌।

আরো অব্যর্থভাবে উপর থেকে ডাইভ বম্ব করে নেমে এল স্পিটফায়ার বোমারু বিমান।

দুম্ দাম্ দুম্ বোমা পড়তে লাগল ওদের চারিদিকে। ওদের মাঝখানে। ওদের ঘেরাও করে। টুকরো টুকরো লোহা, হল্কা-হল্কা আগুন, বোমার বিশ্বনাশী ধাক্কা। যেখানে যেখানে বোমা পড়ল সেখানেই সব একাকার হয়ে গেল। মানুষের মাংস, মেশিন, কাপড়-চোপড়, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, ভবিষ্যৎ সব। সব!

দশ

নেতাজীর হেড-কোয়ার্টার্স থেকে নতুন নির্দেশ এল।

এরকম ভাবে যুদ্ধ চালানো কোন কাজের কথা নয়। ইণ্টেলিজেন্স অর্থাৎ সামরিক গোপন তথ্যের ব্যাপারে আরো বেশী নজর দিতে হবে। আজাদ হিন্দ্ দলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বা সেই সঙ্গে যে-সব সাজসরঞ্জাম কাজে লাগে তার সব কিছুরই বড় টানাটানি। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ফেব্রুয়ারী মাসেব শেষে কর্ণেল শাহ্ নাওয়াজ নেতাজীর কাছে যুদ্ধের অবস্থা জানাবাব জন্য যুদ্ধেব সীমান্ত থেকে হেড-কোয়ার্টার্সে ফিরে গেলেন। যাদের সঙ্গে এবোপ্লেন নেই তাদের ফিল্ড-টেলিফোন, না হয় বেতারের বন্দোবস্ত থাকা আরো বেশী দরকার। এছাড়া হালের লড়াই চলেই না।

কিন্তু আজাদ হিন্দের এসব নেই বলতে গেলে। এরোপ্লেন ত নেই একখানাও। সে সময়ে কর্ণেল সায়গল কমাণ্ডার ছিলেন। পোপা পাহাড়ের দিকে শত্রুরা এগিয়ে আসছে বলে তাদের রুখবার জন্য ২নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্টকে পাঠানো হল। কিন্তু তাদের সঙ্গের অস্ত্রশস্ত্রের হিসাবটা একবার দেখা যাক।

তাদের সঙ্গে ছিল মোটে তিনটি ওলন্দাজের তৈরী মর্টার আর সেগুলির জন্য মোটমাট আশী রাউণ্ড গুলি। হেভী মেশিনগান ত ছিলই না। মাঝারী মেশিনগান যা ছিল তার জন্য গড়গড়তা মোটে চারশোটা করে গুলি। প্রত্যেক সিপাইয়ের সঙ্গে একশোটা করে গুলি। ব্যস্। এতে স্রেফ ছ'ঘণ্টা একটানা যুদ্ধ চালানো চলে।

তারপর সম্বল শুধু বুকে সাহস আর মুখে জয়ধ্বনি।

ইম্ফল থেকে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূবে পালেল গ্রামে ইংরেজরা শক্ত ঘাঁটি বসিয়েছিল। তাদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করতে গেল গান্ধী ব্রিগেড। সঙ্গে মোটে দশ দিনের রসদ। নেই কোনরকম যানবাহন বা বেতার বা টেলিফোন। একটা ব্যাটালিয়ন যখন লড়তে চলে যায়, একেবারে যেন উইল করে অগস্ত্য-যাত্রা করে। হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে কোন যোগাযোগই আর থাকে না।

তাই এবার নতুন নির্দেশ এল যে—কিছুদিন লড়াইয়ে কোন হেস্তনেস্ত হচ্ছে না আর আজাদ সেনা প্রায় একই জায়গায় থেকে যাচ্ছে, কাজেই এখন দেবলকে কয়েকজন ইনটেলিজেন্স কাজে হাত পাকানো লোককে নিয়ে শত্রুর লাইনের পিছনে চলে যেতে হবে। ইংরেজদেব লাইন থেকে দখল করা বেতারযন্ত্রগুলিতে এখন "মিটার ব্যাণ্ড" বদলি করে ওদেরই গোপন খবরগুলো চালান করতে হবে।

কাজেই দেবলকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে হল।

হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি বৈকি।

অর্থাৎ সেই বোমারু বিমানহানার পরের দিনই। সেই হানায় কয়েকটা বোমা এসে ফাটল একেবারে নালাটার উপরে। আকাশ থেকে আঁধারের মধ্যে আগুন-ঝরানো চোখ-ধাঁধানো বোমা শত্রু-মিত্রে কোন বাছাই করল না। বোমা কোন পক্ষপাতিত্ব করে না। উরায়ম আর তারই হাতে মারা টোনি আর ক্রিসের মৃতদেহকে একই বোমায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। কারো কোন চিহ্ন রইল না।

উরায়ম নেই!

ব্যাপারটা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু মৃত্যু চিরকালই নিষ্ঠুর। সত্যের চেয়ে একবিন্দু কম নিষ্ঠুর নয়।

এই যুদ্ধ ত একদিন শেষ হয়ে যাবে। আরো পরে লোকে ভুলেই যাবে সে কথা। নিশ্চিন্ত মনে ঘর-সংসার করবে। হবে নতুন বন্ধু, আসবে নতুন হাসি গল্প ঠাট্টা। কিন্তু আসবে না উরায়ম।

নতুন পথে রওনা হবার আগে দেবল একবার সেই নালাটার পাশে আবার এসে দাঁড়াল। গত রাতের বোমার হানার ধুঁয়োটুকু পর্যন্ত উড়ছে না। চারিদিকে ছড়ানো মৃত্যুর চিহ্ন থেকে সে চোখ সরিয়ে নিল। না। সে টুকরো টুকরো করে উড়ে যাওয়া মৃতদেহগুলির মধ্যে উরায়মকে খুঁজে নিতে আসেনি। মৃত্যুহীন প্রাণকে সে মরণের চিহ্ন দিয়ে সীমানা বেঁধে দেবে না।

দেবলের হাতে শুধু একগোছা রোডোডেনড্রন ফুল। এই গ্রামে যে

ইংরেজ ঘাঁটি ছিল তা এই ফুলের নিশানা দিয়েই সে বের করতে পেরেছিল। এইখানেই হল মহা আত্মবলি।

লাল, টকটকে লাল ফুলগুলি—আকাশে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে দেবল মাটিতে ফেলে দিল। একটুক্ষণ মাথা নীচু করে রইল। তার পরই উঁচু করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক ফিরে চলল কাজে। কদম কদম বঢ়ায়ে যা। কিন্তু খুশকে গীত ? তা গাওয়া কি সম্ভব ?

"হায় ওরে মানবহৃদয়"—তোর দাঁড়াবার সময় যে নাই !

কিন্তু পথ চলতে চলতে উরায়মের হাসি-ঠাট্টার কথা সব সময় মনে পড়ে। পা যখন ভারী, মন যে তখনো হাল্কা রাখা দরকার। তাই সে নিয়েছিল সবার মনকে হাল্কা করে রাখবার ভার। শুধু লড়াইয়ের সর্দার নয়, সব সুখে-দুঃখে সাথী, সখা—সমভাগী।

তার যোগ্য হতে হলে, সহচর হতে হলে আজ দেবলকে কেমন ভাবে চলতে হবে ?

এখন থেকে এই বাহিনীটার দলপতি, সিনিয়র কর্ণেল হচ্ছে দেবল। এই দলের মধ্যে এখন অনেক বাঙালী। এই জায়গাতে ইন্‌টেলিজেন্স অর্থাৎ মিলিটারী খবরাখবরের কাজ চালানো বাঙালীর পক্ষেই একটু সুবিধা হবে। নাগা মণিপুরীরা বাঙালীকে অতটা দূরের লোক মনে করবে না। সন্দেহ করবে কম। তা ছাড়া নেতাজীর বিশেষ বাছাই করে পাঠানো দূত বলে বিশ্বাস করবে। আসামের সীমান্তে বাঙালীর পক্ষে গাঁয়ে বিভুঁয়ে গা-ঢাকা দেওয়া, পাঞ্জাবী বা মারাঠা-মাদ্রাজীর চেয়ে বেশী সহজ।

নেতাজীর লোক বাছাই ছিল সব সময়ই খুব সঠিক, খুব কাজের।

নাগা পাহাড়ের রাজধানী কোহিমা আর মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলকে যোগ করে দিয়েছে সুন্দর পিচ-বাঁধানো একটা রাস্তা। পাহাড়ের গায়ের উপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তাটা যেন একটা সাপের মত লম্বা হয়ে পড়ে আছে। এইটেই হিন্দুস্থান থেকে কোহিমা হয়ে ইম্ফলে ইংরেজ আর আমেরিকান সৈন্য আর রসদ যাতায়াতের একমাত্র পথ।

আজাদ হিন্দ্‌ দল কোহিমা প্রায় দখল করে ফেলেছে। পিছন থেকে পাহাড় বেয়ে হঠাৎ হামলা দিয়ে কোহিমার ডেপুটি কমিশনার পসি সাহেব

১৯১৪ সনের যুদ্ধে মিলিটারী ক্রস পেয়েছিলেন। এবারকার যুদ্ধেও তিনি নিজের বাঙলোর সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সৈন্য নিয়ে লড়ে গেলেন। কিন্তু তারপর কোথায় যে গা-ঢাকা দিলেন তার হদিশ কেউ পেল না। না জাপানীরা, না আজাদ দল।

ওদিকে মণিপুরের ঘাঁটি এখনো দখল করা হল না। ইংরেজ সৈন্যরা অনেকটা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তবু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন ওদের এলাকায় রসদ ফেলে যাচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে। জাপানীরা নেতাজীকে বলে রেখেছিল যে সময়মত হিন্দুস্থানের মাটিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী এরোপ্লেন আজাদ সৈন্যদলকে আকাশে সাহায্য করবে। কিন্তু কোথায় জাপানী "জিরো" ফাইটারের দল? কোথায় তাদের সূর্যের আলোয় ঝলমল রূপোলী চেহারা!

নেতাজীকে না জানিয়ে জাপানরা তাদের প্রায় সব এরোপ্লেন দেশের কাছে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ইয়োরোপে হিটলার হটতে শুরু করেছে। রাশিয়া এখন কি করে বিশ্বাস নেই। আমেরিকানরা অগুন্তি বোমারু বিমান তৈরী করে ফেলেছে। কোন্ দিন হয়ত জাপানের উপরই হামলা করে বসবে।

এখন কে বা মনে রাখে বন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি? কে বা তাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবার জন্য দুঃখ করে? চাচা, সব্‌সে পহেলা আপনা জান বাঁচা।

কাজেই আজাদ দলের অত্যন্ত দরকার ঐ কোহিমা-ইম্ফল রাস্তাটার উপর দখল রাখা। নিদেনপক্ষে কড়া নজর রাখা। সময়মত খবরগুলো বেতারে নিজেদের "কম্‌ব্যাটাণ্ট" লড়ুয়ে দলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এমনকি যদি ইংরেজদল কোন রকমে কোহিমার ঘাঁটি পেরিয়ে "রিইনফোর্সমেণ্ট" অর্থাৎ আরো সেপাই, সাজ-সরঞ্জাম মণিপুরে পাঠাতে চেষ্টা করে তা হলে রাস্তার পোল সাঁকো এসব ভেঙে দিয়ে তাদের চলাচল বন্ধ করে দিতে হবে।

আজাদ দলের ইন্‌টেলিজেন্স আর স্যাপার এণ্ড মাইনার সব কাজই একই লোককে করতে হচ্ছে। অত বিশেষজ্ঞ লোকবল কোথায় ওদের?

হঠাৎ নীল আকাশের চাঁদোয়া ফুঁড়ে নেমে এল কয়েকটি পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে, সারি-বেঁধে। বাজপাখী যেন ছোঁ মারতে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বোঁ-ও বোঁ-ও আওয়াজ! যমদূতের রথের আওয়াজ! বাতাসের বুক ফেটে গোঙানির মত। দেবলের দল সবাই একসঙ্গে পিচ বাঁধানো রাস্তার তুপাশে নালার সঙ্গে গা মিলিয়ে শুয়ে পড়ল। দম-দমাদ্দম চারিদিকে বোমা ফাটতে লাগল। ডাইভ বম্ব করে এরোপ্লেনগুলো নাচানাচি শুরু করল। কিন্তু শুধু একতরফা নাচানাচি। শুধু একতরফা।

কাজ শেষ হয়ে গেছে মনে করে এরোপ্লেনগুলো আবার আকাশে মিলিয়ে গেল। আলপিনের মুখের মত অব্যর্থ তাক করে তারা রাস্তাটা বাঁচিয়ে কাতারে কাতারে বোমা ফেলে গিয়েছিল। কত জন মরল বা মরবার মুখে এসে পড়ল তার হিসাব কে রাখে!

যে ক'জন বেঁচে ছিল তাদের দেবল আবার জড়ো করে নিল। যারা এখনো মরে নি, তাদের মুখে জল দিতে চেষ্টা করল। একজন শিখ সিপাইয়ের মাথার পাগড়ী এরোপ্লেন থেকে তাক করা খুব সহজ হয়েছিল। গুলীতে ঝাজরা-করা তার দেহ। কিন্তু অতি কষ্টে কোন রকমে মাথা তুলে সে দেবলকে বলল,—সাহেব, আমায় যেন কোন তুশমনের পাশে মাটী দেওয়া না হয়। নেতাজী কি জয়! ভারতমাতা কি ... ...!

দাঁড়াবার সময় যে নাই!

আবার চলল ওরা।

এবার রাস্তার কাছ দিয়ে নয়। জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে।

একজন বলল, স্যার, এই লড়াইয়ে কোন "গ্ল্যামার", কোন চটকই নেই। আগেকার মত নেই ব্যূহ তৈরী করে সৈন্য চালানো, না একটা ক্যাভাল্রি চার্জ। ওরা ত বোমা মেরে হাওয়া হয়ে গেল। সামনা-সামনি একহাত হয়ে গেলেই ত মুরদ টের পাওয়া যেত।

দেবল বলল,—সাবাস! এই ত মরদকী বাত। গলির মোড়ে নিশ্চয়ই অনেক দিন দল পাকিয়ে আস্তিন গুটিয়ে চেঁচিয়েছ—'চলে আয় একবার অলপ্পেয়ে। হাত থাকতে মুখ কেন?'

এত তুঃখেও বাঙালী "সাব" অর্থাৎ সাব-অলটার্ণ (নীচের অফিসার)

হেসে ফেলল,—আলবত স্যার, কিন্তু অলপ্পেয়ের দল ত ছিল হাড্ডিসার, টিং-টিঙে বাঙালী। ষাঁড়ের ডালনা খেয়ে পুরুষ্টু ইংরেজ বাচ্ছা নয়।

দেবল সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—তুমিও ত সেই দিনকার বাঙালী নেই, ভাই! তুমি হচ্ছ আজ পুরো একটা মরদ। তোমার তুলনায় আজ ইংরেজকেই সেদিনকার বাঙালী বলে মনে করে নাও। আজ তুমিই হবে তার চেয়ে বড়। বীর্যে, চরিত্রে, ত্যাগে।

একটু পরে আবার হেসে বলল,—কর্পূরের মত ওদের গায়ের রং সার্থক দিয়েছিলেন ভগবান। এতদিন আমরা ওদের অধীন ছিলাম। আজ আমাদের দেখলে ওরাই কর্পূরের মত ভয়ে উবে যায়। আমাদের যে নবজন্ম হয়েছে।

এদিকে দাড়ি চুলকাতে লাগল কয়েকজন। কড়া রোদ উঠেছে। ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গে। দাড়ি কামানো হয়নি ক'দিন ধরে। দাড়িকে নিয়ে এই মুশকিল ভাবটা দেবলের নজর এড়াল না। সঙ্গের সৈন্যদলের শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে হবে। তাদের "ম্যরাল" বজায় রাখা দলপতির কর্তব্য। তাতেই তার বাহাদুরী।

এমন অবস্থায় উরায়ম কী করত?

না। উরায়মের কথা মনে করে মন খারাপ করলে চলবে না। ওর স্মৃতি থেকে খুঁজে নিতে হবে নতুন প্রেরণা।

দেবল হেসে সবাইকে বলল,—জান, কর্ণেল উরায়ম সিং আমায় দাড়ি না কামানোর স্বপক্ষে একবার কি বলেছিল? বলেছিল যে, তিন-তিনটে সাচ্চা ভারী কারণে সে দাড়ি রাখছে—যদিও জঙ্গী কানুনে দাড়ি কামানোই আজকাল নিয়ম হয়েছে। এক নম্বর—কামানোর সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে ঘুরতে হয় না। দোসরা—জঙ্গলের লড়াইয়ে মশা, টিক পোকা এসবের হাত থেকে মুখ বাছাধন একটু রেহাই পায়। আর তিসরা এবং এটাই সবচেয়ে মোক্ষম কথা—দাড়ি হচ্ছে দুনিয়ার সেরা ক্যামোফ্লাজ। হাঃ হাঃ। তোমার দুশমন তোমায় আর চিনতেই পারবে না। কোন—হাল-ফ্যাসানের হলিউড-মার্কা ক্রিম নাকি এত ভাল করে চাঁদমুখখানার চেহারা ঢেকে লুকিয়ে রাখতে

বা বদলাতে পারে না। তা ছাড়া একেবারে পাকাপাকি স্থায়ী বন্দোবস্ত। ভেবে দেখ দুনিয়ার কত বড় তত্ত্ব লুকানো আছে দাড়িতে।

মৃত্যুর মন্ত্র জপতে জপতে যে নতুন প্রাণ পেয়েছে ওরা। দাড়ি না কামানোর অস্বাচ্ছন্দ্য ওদের আর কি ক্ষতি করতে পারে ?

কিন্তু দাঁড়াবার সময় যে নাই।

একসঙ্গে দল বেঁধে চলবারও উপায় নেই। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন একবার ওদের খোঁজ পেয়ে গেছে। এখনি বেতারে সে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এরোপ্লেন থেকে বার বার ওদের চলার পথ, লুকোনোর আস্তানা চষে বেড়াবে। কোহিমার দিক থেকে যদি কোন সৈন্যদল মণিপুরের দিকে এগোতে না-ও পারে, প্যারাসুট দিয়ে কয়েকটা টহলদার দল নামিয়ে দেবে নিশ্চয়ই।

তা ছাড়া ওদের "ও. পি." অর্থাৎ নজর রাখবাব ঘাঁটি এই তল্লাটেই এদিকে সেদিকে ছড়ান থাকা সম্ভব।

কাজেই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে রাখতে হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু পরে আবার একসঙ্গে কোথায় মিলবে তার ব্যবস্থাও এখনি করে নিতে হবে। ম্যাপ খুলে দেবল সবাইকে ভাল করে দিশা বুঝিয়ে দিল। দূরে দূরে ছোট গ্রাম মাঝে মাঝে পাওয়া যাবে। কিন্তু বেশীর ভাগ জনমানবহীন জঙ্গল। ভাল করে দেখিয়ে চারিদিকে কোথায় কি আছে সব বুঝিয়ে দিল। সাঙ্কেতিক কোডগুলি সব ভাল করে ঠিক করে তালিম দিল। হেড-কোয়ার্টার্স আর রেজিমেণ্টাল বেজের রেডিয়োর মিটার-ব্যাণ্ড ঠিক করে হিসাব করে নিল।

কিন্তু খাবার ?

খাবার যে একেবারেই নেই।

লড়াইয়ের ভয়ে সব গাঁ-ই এই এলাকাতে খালি হয়ে গেছে। নেহাত যাদের পালাবার উপায় বা আশ্রয় নেবার ঠাঁই নেই তারাই শুধু বাকী। তাদের ভাতে ভাগ বসানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

দেবল তবু সাবধান করে দিল সবাইকে : ভুলো না যে এই সব লোকের সহানুভূতি ছাড়া সাহায্য ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারব না।

ভুলো না কর্ণেল কিয়ানীব কথা। লিবারেটেড অর্থাৎ ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীন করে নেওয়া দুশো স্কোয়ার মাইল এলাকার গবর্ণর তিনি।

রসদের অভাবে সরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাগা কাছারী গাঁওবুড়ারা ওঁকে কিছুতেই চলে যেতে দেয়নি। ওরা বলেছে যে, ওরা নিজেরাও যদি খেতে না পায় তবু যারা ওদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদেব খাবার যোগাড় কবে দেবে। যা খাবাব তোমরা পাও তা লুট করে নিয়ো না। বিনা দামে নিয়ো না।

একটু থেমে দেবল আবো বলল,—তবে হাঁ, যে টাকা ইংরেজের সিপাইদের পকেটে পেয়েছ, সেই সব টাকা দিয়েই খাবাব জিনিসের দাম দিয়ো। "মিকি-মাউস কারেন্সি" দিয়ো না যেন।

"মিকি-মাউস কারেন্সি" অর্থাৎ জাপানী ছাপানো নোট।

এগারো

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার !

চোখে ফিল্ড-টেলিস্কোপ লাগিয়ে দেবল সবটা তন্ন তন্ন করে দেখছে। খুব অল্প একটু একটু আলোর ফালি এদিক-ওদিক থেকে দেখা যাচ্ছে। ছাদের উপর চিলেকোঠার মত ছোট্ট একটা ঘর। বুনো ইকড়া আর লাকড়ী দিয়ে বানানো অসমীয়া খাঁচের ঘর। একেবারে টিলার চূড়োয়।

চিলেকোঠা ভাবতেই অনেক কথা মনে এল। তাড়াহুড়ো নেই কিছু। হাতে অনেক সময় ভাববার। তাই দেবলের নিজের বাড়ীটুকুর কথা মনে পড়ল। মায়ের নজর এড়িয়ে কাঁচের বয়াম থেকে সরিয়ে-ফেলা লেবুর আচার, আমসত্ত্ব দিয়ে শুরু হয়েছিল চিলেকোঠায় আনাগোনা। তারপর চলল সেখানে স্কুলের পড়ার নামে বটতলার নভেল পড়া। তার শেষ বিকাশ হল দেওয়ালে সিনেমার নায়িকাদের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার সাজানোর মধ্যে।

আর ?

আর কিছু কি নয় ?

কেন ? সেই ট্রাম থেকে নেমে চুপচাপ সটান চিলেকোঠায় চলে আসা ? সেই-যে পেন্সিল দিয়ে অধীর হাতে সাদা কাগজের বুকে কালো আঁচড় কেটে একটি মুখ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা ?

বার বার দেবল চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জীবনে কখনো ত আঁকে নি। ভাবেও নি যে একজন অজানা অচেনা তরুণী তার অস্তিত্বটুকু ওর মনে এমন করে এঁকে দিয়ে যাবে। তার কথা কাউকে বলা যায় না, আলোচনা করা যায় না। ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থাকে সে ! চেনা-পরিচয়ের অতীত।

সে কী জ্বালা ! সে কি শাস্তি !

আনমনে সে সেই হিজিবিজি-আঁকা কাগজটাতে বড় বড় করে বিশ্ব-সাহিত্যিক মেটারলিঙ্কের একটা কথা লিখে ফেলেছিল। "এমন একটা সময় আসবে, তার বেশী দেরিও নেই—যখন মানুষের আত্মা দেহের সম্বন্ধ ছাড়াও পরস্পরের অস্তিত্বের খবর পাবে।"

সে কথা এখন কেন মনে পড়ল দেবলের ?

খবর ? 'খবর' কথাটা মনে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। না। এই মুহূর্তে ভাব-বিলাসের কোন ঠাঁই নেই। হেড-কোয়ার্টার্সে যদি কোন খবর পাঠাবার মত থাকে তাই খুঁজে দেখা উচিত।

কিন্তু পাঠাবার মত কোন খবরই এখনো যোগাড় হয়নি। এই ছোট্ট কুঠরীটা ভাল করে যাচাই করে দেখতে হবে। ভিতরে আলো আছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। শত্রুপক্ষের লোকই নিশ্চয় ওর ভিতরে আছে। তা না হলে বোমারু বিমানের ভয়ে আলো নিবিয়ে রাখত। অন্ততঃ পর্দা আরো ভাল করে টানা থাকত।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দেবল একবাব পিছু ফিরে বেতারযন্ত্রটা যেখানে লুকিয়ে রেখে এসেছে সেদিক তাকাল। একবার তাকাল হাতঘড়িটার দিকে। যেন আঁধারে ভাষা ফুটে উঠে ওকে সাহস দেবে। ভয় কি, এগিয়ে যাও ! আমি আছি সঙ্গে পাহারা দিতে।

ব্যাটল-ড্রেসের পাছার পকেটে লুকানো রিভলবারটা দেবল একবার ছুঁয়ে নিল। পোশাকটা এখনো লুকিয়ে ফেলবার সুবিধা হয় নি। একটা শত্রুপক্ষের পোশাক এখনো যোগাড় করা বাকী আছে। একটা হাবিলদারকে টিলার নীচে আচমকা পাকড়িয়ে ফেলে মুখ আর হাত-পা বেঁধে রেখে এসেছিল। কিন্তু তাব পোশাক পবে নেবাব আগে টিলাটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

খুব আস্তে আস্তে চারদিকের নিস্তব্ধতাকে যাচাই করতে করতে দেবল কুঠরীটার কাছে এসে পড়ল। গাছপালায় প্রায় ঢাকা টিলার উপরের ঘরটার দেওয়ালে নানারকম রং লাগিয়ে "ক্যামোফ্লাজ" করা হয়েছে। দূর থেকে দেখে কেউ ওটাকে মানুষের আস্তানা বলে চিনতে পারবে না। নেহাত রাতের আঁধারে কেরোসিন কুপীর আলোয় ধরা গিয়েছিল। বুঝতে পারল যে মতলব করেই এত মিটিমিটি আলোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অতএব আরো একটু সাবধান হওয়া দরকার।

পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে দেবল ভিতরটা দেখতে লাগল। একটা কুঠরী নয়। গোটাকয়েক খুপরী। প্রায় প্রত্যেকটাতেই মানুষ থাকে,

আর থাকে নানারকম যন্ত্রপাতি। কয়েকটা দেখেই চেনা গেল—বেতারের হালফ্যাশানের যন্ত্র। অনেক রকমের কলকব্জা সাজানো। একেবারে আধুনিক ব্যবস্থা। ম্যাপ, ব্যাটারি আর বেতার টেলিপ্রিণ্টারের ছড়াছড়ি। যদি এ-সব দখল করতে পারি তা হলে গুরুদক্ষিণা দেব ভাল করেই—মনে মনে ভাবল দেবল।

আরো কয়েকটা জানালার তলায় দেবল ঘুরে দেখতে লাগল। একি! এ যে ওয়াক.আই.-দেব খাঁকী পোশাকও দেখা যাচ্ছে। রাতটা মায়ায় ভরা নয় ত?

অবশ্য কামরূপ-কামাখ্যার দেশে সবই আগেকার দিনে সম্ভব হত। কিন্তু সে যুগও নেই, সে মুলুকও নেই। এ-হেন কল্পনা আর যাকেই হোক, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আগুয়ান ইনটেলিজেন্স-অফিসার কর্নেল দেবলকে মানায় না।

সে মুছে ফেলল মন থেকে সে চিন্তা। পিছনের পকেটে রিভলভারটা আবার ছুঁয়ে দেখে নিল।

হঠাৎ কি মনে হল। একবার মণিবন্ধে হাতঘড়িটাও সে দেখে নিল। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। কিন্তু ঠিক বেজে চলেছে—টিক্, টিক্, টিক্……

একটা জানালার ভিতরের ছিটকিনি ঢিলে ছিল। পকেট থেকে সরু ইলাস্টীক রেঞ্চ-যন্ত্র বের করে সে বাইরে থেকেই ছিটকিনিটা খুলে ফেলল। খুব হাল্কাভাবে আস্তে আস্তে জানালা দিয়ে প্রথমে মুখ গলাল, তারপর আরো খানিকটা শরীর। তারপর সবটা।

একটা খুপরীতে—হ্যাঁ, ওই খুপরীটাতে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ক'জন হবে? নিশ্বাস বন্ধ করে দেবল সাড়া আর ইশারার অপেক্ষা করতে লাগল।

না, শুধু একজনই হবে। কোন হাতিয়ার আছে কি তার হাতে? পা টিপে টিপে দেবল খোলা রিভলভার হাতে এগিয়ে গেল। মাঝের পর্দাটা একটু সরিয়ে একেবারে খুপরীর মধ্যে চলে এল। মেঝে মাটির। তার

উপরে শতরঞ্জি পাতা। তার উপরে ক্যাম্বিশের ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারে পিছন ফিরে বসে একজন ওয়াক. আই. অফিসার।

দেবল দৃঢ়স্বরে হুকুম দিল,—হ্যাণ্ডস্ আপ!

সঙ্গে সঙ্গে দুটি মেয়েলি হাত মাথার উপর উঠে গেল।

দেবল আবার হুকুম দিল,— অ্যাবাউট টার্ন। আমার দিকে মুখ ফেরাও—কিন্তু হাত রাখবে মাথার উপর। খবরদার! আই শুট টু কিল। না হলে আমি গুলী করে মেরে ফেলব।

মাথা উঁচু রেখে দৃপ্তভঙ্গীতে মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল। হাত দুটো তখনো মাথার উপরে তোলা।

এ কি! এ কি! দেবলের মুখ দিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হল না।

ঠোঁটের মধ্য দিয়ে আর কি আওয়াজ বের হল তা সে নিজেই শুনতে পেল না। কখন উঁচিয়ে-ধরা রিভলভারটা নেমে গেল; কখন যে সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ইকড়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রইল তাও সে জানে না।

দেবলের হুঁশ প্রথম হল যখন ওয়াক. আই. অফিসার নিজেই তাকে ডাকল,—তুমি! তুমি দেবল? আই. এন. এ.-র কর্ণেল?

আই. এন. এ.-র কর্ণেল? যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল দেবল। সেদিন রাতে আকাশী বোমার হানায় সে এমন ধাক্কা খায়নি।

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। দেবল আর মিতা। দুই শত্রুপক্ষ।

বারো

—তুমি? দেবল?

—মিতা?

কথাটা প্রশ্ন না উত্তর তা বোঝা গেল না। দেবলের গলা কে যেন টিপে ধরেছে। যেন ওর নিজের হাতের রিভলভারটাই ওর মাথার উপর তাক করে ধরে রেখেছে কেউ।

হাতঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলছে কিনা সেদিকেও দেবল তাকাতে পারছে না। গরম কিছুই নয়। কিন্তু বিন্দু বিন্দু ঘাম তার কপালে চিকচিক করে উঠেছে। ক্যাম্বিসের ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারটা মিতা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

তার পরই মিতা একবার চকিতে চারদিকে বাইরে তাকিয়ে নিল। পাশের খুপরীতে গিয়ে বাইরে থেকে আসার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল,—হাবিলদার সেনট্রিটা টের পেয়েছে কি? না, ওকে শেষ করে দিয়েছ?

শত্রুপক্ষের কাউকে শেষ করে দেওয়ার কথায় এতক্ষণে দেবলের যেন জ্ঞান ফিরে এল। কোন রকমে বলল,—ওর হাত পা মুখ বাঁধা।

কিন্তু এই যে ওয়াক. আই.-এর খাঁকী ইউনিফর্ম পরে হরেক রকমের যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি—এই যে মিতা—সেও ত শত্রুপক্ষের!

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিঙ্কের ওয়াটার বটল থেকে জল আর কাগজের কার্টুন থেকে 'চক' বিস্কুট আর টিন কেটে পাতলা করে কাটা মাংস মিতা দেবলের সামনে এনে ধরল। খুব শান্তভাবে অথচ হুকুমের সুরে বলল,—চট করে খেয়ে নাও। ব্রাণ্ডি চাও ত দিতে পারি। আর এই "ইমলি শ্ল্যাব"গুলি পকেটে রেখে দাও। মাঝে মাঝে খেয়ো। "ভিটামিন সি"র অভাব তোমার মুখে ফুটে উঠেছে।

হায়, দেবল কাকে সামনে দাঁড়ানো দেখছে এখন! এতদিনের স্বপ্ন এতদিনের প্রত্যাশা। মিতা তার মুখে শুধু ভিটামিনের অভাব দেখল এতদিন পরে?

দেবলের ঠোঁট শুকিয়ে উঠল। একবার জিভ দিয়ে সে উপরের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল। তারপর উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করল। যেন মরুভূমির জ্বালা নেভানো যাবে একফোঁটা জলে।

আবার মিতাই কথা বলল,—তোমার হাতে খুব বেশী সময় নেই, দেবল। আমাদের "ও. পি."র (অর্থাৎ নজর করার ঘাঁটির) লোকেরা, মায় অন্য ওয়াক. আই.-রাও সবাই গিয়েছে মাইল পাঁচেক দূরে। সেখানে নতুন একটা "ও. পি." খোলা হয়েছে। সেই অবজারভেশান পোস্টের সঙ্গে বেতারে এইমাত্র কথা হয়েছে। ওরা এখনি রওনা হবে। রওনা হওয়ার সঙ্কেত পাস-ওয়ার্ড এইমাত্র দিয়ে দিয়েছি।

মিতা এত তাড়াতাড়ি, এত চাপা গলায় ব্যস্ত-সমস্তভাবে কথা বলে চলল যে দেবল সব কথা শুনতেই পেল কিনা কে জানে।

সে শুধু হতভম্বের মত মিতার দিকে তাকিয়ে রইল। মিতার মুখ, মিতার চোখ, মিতার ইউনিফর্মের দিকে।

মিতা সবই বুঝল। বলল,—খুব অবাক হয়ে গেছ, এই ত? কিন্তু শোন, দেবল। একমুহূর্তও সময় নেই তোমার হাতে; তুমি কেন আই.এন.এ.-তে যোগ দিয়েছ তা বুঝি। কিন্তু আমি কেন ওয়াক. আই.-এ জুনিয়র কমাণ্ডার হয়ে এখানে এসেছি তা বুঝতে নিশ্চয়ই পারছ না।

দেবল কোন রকমে মুখ খুলে বলল,—তুমিও কি আমার মত···আমায় দেখতে·······

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মিতা দেবলের কথায় বাধা দিল,—না না, তুমি ভুলেও ভেবো না যে আমি তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার আশা নিয়ে লড়াইয়ের এলাকায় এসেছি। আমি দেশ স্বাধীন করতেও আসিনি। জাপানীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাতেও আসিনি।

—তবে—তবে কেন তুমি ওয়াক. আই.-তে ঢুকেছ? কেন এই ঘোর

বিপদের মধ্যে পশুর মত সৈন্যদের মাঝখানে এসেছ? মিতা, এ তুমি কী করেছ?

অস্থির হয়ে ছুটে সামনে এসে মিতার হাত দুটি চেপে ধরল। পাগল রক্তধারা বইছে তার শিরায় শিরায়। বলতে চাইছে লক্ষ লক্ষ কথা।

মিতা হাত ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল দেবলের দিকে। যেন ঘুমের মধ্যে নিশিতে পেয়েছিল বলে দাঁড়িয়েছে।

এক-পা আধ-পা করে মিতা পেছিয়ে যেতে লাগল। নিজেরই অজান্তে বিনা চেষ্টায়, বিনা ইচ্ছায়। প্রত্যেকবার পিছু হটে, আবার একটু আসে। আবার একটু পিছু হটে। যেন ওই সব তার আর বেতারের যন্ত্রে মিতার পদক্ষেপ তালে তালে মাপা আছে: নিয়ন্ত্রিত করছে তার পিছু-হটাকে।

দেবল এতক্ষণে জেগে উঠেছে। বিস্ময়ে নয়, বেদনায়! গভীরভাবে সে মিতার চোখের উপর চোখ রাখল। যেন অতলান্ত মহাসাগরে জলের গভীরতা মাপছে।

মিতার চোখে একটু যেন ভীরু বনহরিণীর ছটফটানি, অসহায় ব্যথার চঞ্চলতা। একেবারে চুপ করে রইল মিতা। দেবলের কথার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ব্যাকুল হয়ে দেবল আবার জিজ্ঞেস করল,—কই মিতা, জবাব দিলে না যে?

আরো বেশী ব্যাকুল হয়ে মিতা বলল,—সব বলব—কিন্তু তুমি কথা দাও যে ঠিক আধঘণ্টা পরে তুমি চলে যাবে। ওরা নিশ্চয় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এসে পড়বে। নীচে হাবিলদারটা বাঁধা আছে। তোমায় খুঁজে বের করতে চেষ্টার কসুর করবে না। এ কী সর্বনাশ তুমি করলে দেবল?

—না, তোমায় ছেড়ে আমি যাব না, একটুও যাব না। এত বছর পরে তোমায় দেখলাম! আর তোমায় ছেড়ে যাব না।

বিদ্রূপ করে উঠল মিতা—হাউ রোমান্টিক অব ইউ, দেবল। চমৎকার!

তুমি এতই ভালবাস যে, যাকে ভালবাস বলে মনে কর তার চোখের সামনেই হাতের কাছের গাছ থেকে না ঝুলে পড়লে শান্তি পাবে না।

চুপ করে রইল দেবল।

মিতা ব্যঙ্গের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল,—অথবা বোধ হয় ভাবছ যে, যাকে ভালবাস তাকেও ফাঁসানো দরকার। জীবনে এত ভালবাস বলে ভেবেছ যে মরণেও একটি সহমরণ ঘটাতে না পারলে কীর্তি রেখে যাবে কি করে?

দুঃখে দেবলের মুখ যেন একটু কালো হয়ে গেল। সে বলল,—তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না। শুধু তাড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমার নিজের জন্য নয়; তোমার আই.এন.এ.-র জন্য, তোমার নেতাজীর জন্য। তুমি না সামরিক অফিসার?

দেবলের মনে পড়ল একদিন মিতা দু'চোখ মেলে দেবলের দিকে তাকিয়েছিল···পুরোপুরি দৃষ্টিতে, একেবারে সামনা-সামনি।

সেদিন সে আঁখি দুটো তার বুকে উইনচেস্টার রিপিটিং রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছে মনে হয়েছিল। আজো ঠিক তেমন করেই মিতা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আই. এন. এ.-র কর্ণেল ও ওয়াক. আই. জুনিয়ার কম্যাণ্ডার। শুধু দেবল আর মিতা এই-ত ওদের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

আস্তে আস্তে দেবল বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। বলল,—তুমি ঠিকই বলেছ, মিতা। আমি ত শুধু দেবল নই। তার আগে আমি মিলিটারী অফিসার। নেতাজীর জয় হোক।

কাগজের গ্লাসে জল খেয়ে দেবল একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করল,—তুমি ত বললে না তোমার কথা।

বলব। কিন্তু তুমি আগে একটু খেয়ে নাও। তোমরা আই.এন.এ-তে কী খেতে পাও তা আমাদের অজানা নেই।

বলতে বলতে খুব শান্ত মনে অথচ হাত চালিয়ে মিতা একটি সিল-করা টিন গরম জলে বসিয়ে গরম করে কেটে নিয়ে, তা থেকে রান্না-করা ভাত আর মাংসের তরকারী বের করে নিল। ইংরেজ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের

জন্য সবরকম বন্দোবস্তই জাপানী যুদ্ধের এলাকায় ১৯৪৪ সনে তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

সেই ক'মিনিট দেবল চুপ করে শুধু মিতার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সুঠাম তনুদেহ। ফিটফাট খাঁকী ইউনিফর্মে ঘেরা তনু কোমলে কঠোরে অপরূপ দেখাচ্ছে। শুধু শ্যামল রূপে নয়, ব্যক্তিত্বে ঝলমল করছে মিতা।

এতদিন জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে-ঘুরে মেঠো, না হয় পাথুরে, পাতা-পচা গন্ধ দেবলের নাকে বাসা বেঁধেছিল। সে গন্ধ আর নেই। একটা সৌরভ মিতাকে যেন ঘিরে আছে—সেটাই যেন দেবলের মরণ-অভিযানের সাথী হয়ে থাকবে এখন থেকে।

মিতা যখন একটু নীচু হয়ে কাগজের হাল্কা প্লেটে মাংস ঢালতে লাগল তখন তার সেই বঙ্কিম ভঙ্গী পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের কল্পনাকে লজ্জা দিয়ে গেল। তার হাত কী তাড়াতাড়ি অথচ সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে! তার চোখ দেবলের দিকে চকিতে তাকিয়েই বাইরের অন্ধকারের দিকে মেলে ধরছে। তার হাই-হিল পরা পা দু'খানি যেন গতিকে যোগাচ্ছে গানের ছন্দ। বীর নারী ; শুধু বরনারী নয় মিতা।

চট করে একটা সাউণ্ড লেভেল মিটার যন্ত্রের চাবি খুলে দিল মিতা। অনেকখানি জায়গার মধ্যে যা কিছু আওয়াজ হবে তার চাপা প্রতিধ্বনি শোনা যাবে এই যন্ত্রে। কি জানি যুদ্ধের দিনকালে শুধু একটা জানা দলই যে এদিকে আসবে এমন কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোন অজানা টহলদারী দলও ত আসতে পারে ?

কিন্তু মিতা যেন একটা যন্ত্র হয়ে গেছে। যন্ত্রের মত সব কিছু করে যাচ্ছে চটপট। অথচ একটিবারও সোজাসুজি দেবলের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকছে না।

এদিকে দেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ; তার দৃষ্টি ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছে যে এই কটা বছর যেন সে বেঁচেই ছিল না। সে ত বাঁচা নয় ; মৃত্যু। প্রতিদিনকার প্রতি নিমেষের সব কাজের মধ্যেও জেগে জেগে মৃত্যু।

মিতা কাগজের প্লেটটা একটা বেতের টেবিলে চাপিয়ে, এগিয়ে এল। দেবলের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

কোথায় জীবন, কোথায় মৃত্যু, কোথায় স্বপ্ন! এই মুহূর্ত্তটিতে মিতাই একমাত্র সত্য। মিতার হাত ধরে আলগোছে একটু টান দিয়ে বলল,—এবার বল তোমার কথা, মিতা।

—আমার কথা? ম্লান হেসে মিতা বলল,—আমার কথা বলতে আর কি আছে? তুমি খেয়ে নাও। তোমার যে এখনি গা-ঢাকা দিতে হবে।

আমি খাচ্ছি। তবু, তবু জানতে চাই তোমার কথা। শিগ্‌গির বল, মিতা। সব বল আমায়, আমায় সংশয়-দোলায় এমন করে ঝুলিয়ে রেখো না।

—তবে শোন আমার কথা। তুমিই ত আজাদ হিন্দ্‌ বেতারে প্রায়ই বক্তৃতা দিতে। তাই না? তোমার গলা থেকেই চিনেছিলাম।

আনন্দে দেবল খাওয়া ছেড়ে মিতার হাত দুটি আবার জড়িয়ে ধরল। ধীরে ধীরে মিতা হাত ছাড়িয়ে নিল। ইশারায় তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিতে বলল।

—তুমি যখন আজাদ হিন্দ্‌ রেডিওতে ছিলে, দেশের সব খবরই জান। জাপানীরা এসে পড়বে এই ভয়ে কর্তারা বাঙলাদেশের সব ধান চাল নষ্ট করে ফেলল। নৌকা ডুবিয়ে দিল, বাস লরী করল আটক। একটা গোটা দেশের লোক—সবাইকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেরা চলে না। তাই তাদের তিলে তিলে খাওয়া বন্ধ করে মুষড়ে রাখার নাম দিল ডিনায়্যাল পলিসি। আসলে সে বঞ্চনা জাপানীকে না বাঙালীকে, সে হিসাব কেউ রাখল না। জান, অন্ততঃ লাখ তিরিশেক লোক বাঙলাদেশে না খেতে পেয়ে মরেছে?

—জানি না আবার? নেতাজী ত বাঙালা দেশের জন্য বর্মা আর শ্যাম থেকে জাহাজে বোঝাই চাল বিনা দামে পাঠাতে চেয়েছিলেন। দুশমন ইংরেজ তার জবাবই দিলে না।

—দিল না বটে, কিন্তু র‍্যাশনের বন্দোবস্ত করে এমন অবস্থা করল যে, যুদ্ধ চালু রাখার কাজে ব্যস্ত আপিস, গুদাম, কলকারখানা এসব জায়গায় কাজ না করলে খেতে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠল। দলে দলে লোক সরকারী আপিসে, অস্ত্র-তৈয়ারীর কারখানায়, সিপাই-দলে কাজ নিল কেবল

র‍্যাশনের চাল, ডাল, কয়লা পাবে বলে। তারা প্রার্থনা করতে লাগল যেন বাঙলাদেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত ধসে না যায়। তা হলে যে র‍্যাশনটুকু বন্ধ হবে।

—তুমিও বুঝি তাই....?

করুণ বেদনায় দেবলের গলা আটকিয়ে গেল। সে আর কথাগুলি শেষ করতে পারল না।

– হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিছুদিন ক্লাবের মিলিটারী মেম্বারদের দৌলতে র‍্যাশনের বন্দোবস্ত হচ্ছিল। কিন্তু ওরা তার যে দাম আদায় করতে চায়... থাক সে-সব কথা। তা ছাড়া ওরা আরো সুবিধাজনক রিশেপ্‌শনিস্ট চেয়েছিল। ক্লাবটাব চেহারা বদলে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু তুমি 'ওয়াক.আই.' হয়ে এলে কেন? সেইটেই ত আমি বুঝতে পাচ্ছি না। একটু অধীর হয়ে প্রশ্ন করল দেবল।

মিতা একটুক্ষণ চুপ করে রইল।

পরে আস্তে আস্তে বলল,—আমি স্মার্ট হতে পারি, ইংরেজনবীশ আধুনিকা হতে পারি, কিন্তু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী ত আমার নেই। কাজেই সরকারের সাপ্লাই দপ্তরে সবচেয়ে ছোট কেরানী হওয়া ছাড়া মা-ভাই-বোনদের মুখে অন্ন যোগাবার আর কোন্ পথটা খোলা ছিল? কিন্তু তাতে এই মাগ্‌গি আর আকালের দিনে এত জনের পেট ভরত না।

—কিন্তু তোমার এত চেনাশোনা ছিল যে কোন অফিসারের প্রাইভেট সেক্রেটারীও ত হতে পারতে। সেটা ত রেস্পেক্টেবল হত।

মিতা আর ধৈর্য রাখতে পারল না। একটু রাগ দেখিয়েই বলল,—ডোণ্ট বি এ ক্যাড, দেবল। রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে লোক মরে পড়ে আছে খেতে পায়নি বলে। তাদের ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে অন্ধকার থাকতেই লোক লাইন দেয় কয়লার গুদামে, চালের দোকানে। মেয়েরা রাস্তায় বের হতে পারে না, পরনে আস্ত কাপড় নেই বলে। কাজে নামতে পারে না মেয়েদের নিরাপদে সম্মান বাঁচিয়ে চলাফেরা করার পথ নেই বলে। আর তুমি বক্তৃতা দিতে শুরু করলে কোন্ কাজে ইজ্জত আছে আর নেই সে সম্বন্ধে। জাহান্নামে যাক তোমার জাত আর ইজ্জত।

ব্যাকুল ভাবে দেবল প্রশ্ন করল,—তবু, তবু তুমি যে অন্য কোন পথ না পেয়েই এই কাজে এসেছ তাও ত বিশ্বাস হয় না। জীবন-সংগ্রামে তুমি ডুবে যাবে এমন ভয় ছিল না।

—ভেসে থাকতে পারব এমন ভরসাই বা কে তোমায় দিয়েছিল, দেবল? করুণ সুরে উত্তর দিল মিতা।

—না, তবু মনে হয় আরো কোন কথা আছে এর মধ্যে।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল মিতা। একটুখানি ভাবল।

তারপর বলল,—তবে শোন, সে-সব কথা। তোমার কোন সুখ হবে না, তবু শুনতে যখন চেয়েছ তখন শোন। আমি যে পাড়ায় ছিলাম সেখানে প্রায় সবগুলো বাড়ী মিলিটারীতে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে রিকুইজিশন করে নিল। কিছু টাকা দিল বটে। কিন্তু কলকাতায় টাকা দিলে বৌ মেলে এন্তার, বাড়ী মেলে না একটাও। যেখানে উঠে আসতে হল সেটা বস্তিগোছের, পুরনো-কেলে ছোটমনের লোকদের আড্ডা। কালো কাফ্রি সৈন্যেরা রোজ রাতে দেয় হানা। রোজ দিনে চরিত্রবানরা মিছিল করে দাঁড়িয়ে থাকে চোখ দিয়ে গিলবার জন্য। ঘেন্না ধরে গেল মানুষ জাতটার উপর। যুদ্ধটা হচ্ছে বিদেশে। কিন্তু দেশে মারা গেল গোটা জাতের চরিত্র।

খুব মৃদুস্বরে মাথা নিচু করে দেবল বলল,—কিন্তু ঘেন্না ধরে গিয়ে হার স্বীকার করবার লোক ত তুমি নও, মিতা।

—না, তা আমি নই। সেজন্যই একদিন পাড়ার মধ্য দিয়ে গট গট করে হাই-হিলের ঢেউ তুলে ওয়াক.আই. ইউনিফর্ম পরে চলে এলাম। একেবারে জুনিয়ার কমাণ্ডার। মিসি-সাহেবকে সেলাম করতে পথ পায় না তখন। আর কি চাই, বল?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল দেবল,—উঁহু, চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার লোক তুমি নও, মিতা। তুমি তার চেয়ে অনেক উপরে, অনেক বড়।

ঠোঁট একটু বাঁকিয়ে হাসল মিতা,—হ্যাঁ, সেটুকু ভেবেও সান্ত্বনা।

আর সুখ?—দেবলের মুখ করল প্রশ্ন। কিন্তু মন ত উত্তর আগে থেকে জুগিয়ে রেখেছিল।

এক মুহূর্ত পরে দেবলই আবার নীরবতা ভাঙ্গল। বলল,—কিন্তু মিতা, এর পিছনে আরো কোন কথা আছে। হয়তো কোন ব্যথা। হয়ত কোনো…

দেবলের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মিতাই বলল,—তুমি ঠিক ধরেছ, দেবল। আছে আরেক জন। তার কথা তোমায় আজ নাই-বা বললাম।

—আ-রে-ক জন ?—যেন একটি যন্ত্র এই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করল।

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তা নিয়ে তোমার মনে কোন তোলপাড় করো না, দেবল। ভুলে যাও, ভুলে যাও সে-সব কথা। আজ তুমি আই. এন.এ. কর্ণেল দেবল আর আমি শুধু 'এলাই' দলের একজন জুনিয়ার কামাণ্ডার। এই ক'মিনিট পরে শুধু এই পরিচয়টুকুই থাকবে। মনকে চঞ্চল করো না, দেবল। ফর ওল্ড টাইমস্ সেক (পুরানো কালের দোহাই)।

টাইম ? সময় ? তা সে অক্ষয় হয়ে গাঁথা রয়েছে দেবলের মণিবন্ধে। অজানতে দেবলের চোখ তার মণিবন্ধে ঘড়িটার উপর এসে পড়ল।

মিতার নজর এড়াল না সেটুকু। সে উঠে এল দেবলের কাছে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল,—কিন্তু দেবল, আমি যে একেবারে অসহায়। একেবারে নিরুপায়। তার জন্যে আমি সব করতে পারি। সে যে এসেছে এই আসাম-বর্মা ফ্রণ্টে। তোমাদেরই বিরুদ্ধে লড়ছে সে। কাজেই…।

—বুঝেছি, বুঝেছি মিতা। তুমি! ওঃ তুমি…। হায়, কেন আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

দেবল একবার উঠে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পা দুটো অবশ হয়ে গেছে। ঠিক মনেরই মত।

মিতা আবার করুণ সুরে বলল,—দেবল, ক্ষমা করো। আমায় ক্ষমা করো। আমি আজ তোমায় কিছুই জানাতে চাইনি। তুমি বার বার জিজ্ঞেস করাতে কেমন করে বের হয়ে গেল। তুমি কিন্তু মুষড়ে পড়ো না। তুমি যে বীর।

বীর ? কথাটা হঠাৎ ধাক্কা দিল দেবলের মনে। বীর ? হ্যাঁ, এই

কথাটা দিয়েই তাকে সম্বোধন করেছিল মিতা গঙ্গার ধারে। শুধু বীর নয়। বীর আমার।

বীর সে ত আছেই। তবু যার চোখে বীর হবার সাধনা, তার কেউ নয় সে আজ ?

উত্তেজিত হয়ে উঠল দেবল। বীর ? বীর ? বীর কি কখনও দুর্বলের মত, অসহায়ের মত হার বরণ করে নেয় ? সে ত এই মনের ক্ষেত্রে, এই ভালবাসার লড়াইয়েতেও বীর হতে পারে। আবার মিতার মনোহরণ করতে পার।

দৃঢ়কণ্ঠে সে বলল,—একদিন তুমি বলেছিলে আমায়—'বীর আমার'। আজ 'আমার' কথাটি খসে গেছে। আবার সে কথাটুকু যোগ করবার সুযোগ আমি চাই। তুমি আমারই থাকবে মিতা, শুধু আমারই। আর কারো নয়।

—কি করে তা সম্ভব দেবল ?

সে কথা কানে না তুলে দেবল বলল,—এই ত মাত্র ক'মাস আগেও তুমি অনেক ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি করে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে আমার কাছে তোমার খবর পাঠিয়েছিলে। কেন পাঠিয়েছিলে ?....কেন এত বিপদের ঝক্কি মাথায় তুলে নিয়েছিলে ? সে ত শুধু আমায় ভালবাস বলেই। না, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকেই ভালবাস। তোমার আজকের বানানো কথায় আমি ভুলব না, মিতা।

—ভালবাসা ? সে যে বড্ড বড় কথা হয়ে গেল, দেবল। তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। রেডিওতে খবর পাঠিয়েছিলাম, শুধু তুমি শুনতে পেলে মনে ভরসা পাবে সেজন্য। ভালবাসার কোন কথা নেই তাতে। সংসারের কিছুই বোঝো না তুমি। কত জটিল মানুষের মন।

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে দেবল আপত্তি জানাল, যা হোক, তবু ভালবাসা সোজা সহজ কথা। হয় ভালবাসি, না-হয় বাসি না। এর মধ্যে কোন ফাঁকও নেই, ফাঁকিও নেই—তোমার মত 'অনেস্ট' মেয়ের কাছে।

ম্লান হাসল মিতা। যেন আসাম সীমান্তের পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যাস্তের করুণ আভা।

বলল,—আমি এখনো অনেস্ট ভাবেই বলছি, দেবল। আমি তোমায় ভালবাসি নি। ভালবাসতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনকে তোমার দিকে ফেরাতে পারি নি। বিশ্বাস কর, দেবল।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠে দেবল বলল, · সব বুঝি আমি, সব বুঝি। আমি যাতে আবার তোমার কাছে আসবার চেষ্টা করে বিপদে না পড়ি সেই জন্যেই তুমি এই কথা বলে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করছ। কিন্তু দোহাই তোমার মিতা, আমি না হয় তোমার সন্ধানে আসব না। তবুও বল যে আমায় ভালবাস।

চুপ করে রইল মিতা।

—যে এত সরল, এত বিশ্বাসী, তাকে এত মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে কি করে পাঠাবে মিতা?

ভালবাসা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। মনকে চঞ্চল করে রাখে। আজ যদি দেবলকে এমন একটা আশা দিয়ে এই আঁধারের মধ্যে ছেড়ে দেয় —আনন্দে, মিথ্যা আনন্দের বালুচরে অসাবধানে তার পা আটকিয়ে যাবে। বরং যদি সে শূন্যমনে ফিরে যায়—একটা আক্রোশ, সম্ভবতঃ ভাগ্যের সঙ্গে বোঝা-পড়ার ইচ্ছা হতে পারে। তার ফলে সে একটু সাবধান হতে শিখবে। সহজে শত্রুর নজর এড়িয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

মিতা দেবলের কাছে অনেক আশা করে। আশা করে যে মিলিটারীতে ঢুকে তার মন আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হয়েছে। নরম মাটি যুদ্ধের আগুনে পুড়ে শক্ত হয়েছে। বেদনার কথা শুনেই ভেঙ্গে পড়বে না।

সামনে উঠে এসে মিতার মুখোমুখি দাঁড়াল দেবল। গলার স্বরে নেই এতটুকু কাঁপন, একটুও দুর্বলতা। মিতার চোখে চোখ রেখে দেবল শুধাল,—তবে—তবে, কেন আমায় এতদিন ভুল আশা দিয়েছিলে? ভালবাসার ভান করেছিলে?

—আশা ত তোমায় দিইনি, দেবল! আমি নিজেই আসা করেছিলাম। ভেবেছিলাম নিজের মনকে আবার গড়ে নিতে পারব। নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছিলাম তোমার সঙ্গে মিশে। ভালবাসতে চেষ্টাও করেছিলাম। আমি করছিলাম চেষ্টা, আর তুমি গিয়েছিলে ডুবে। তা-ও বুঝতে পেরেছিলাম।

—তবে ?

দেবল সমস্তটা সত্তা দিয়ে যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

—আশা করেছিলাম যে তোমার মত আমিও সব ভুলতে পারব। একেবারে পরিত্রাণ পাব। কিন্তু নিজের মনকে নিয়ে তুমি এত বেশী তন্ময় ছিলে যে, আমার মনের দ্বন্দ্বের কথা তোমায় জানাতে পারিনি। সুযোগও হয়নি তার। বরং আশা ছিল যে তোমায় কোনদিন সত্যি ভালবাসতে পারব।

—কিন্তু -কিন্তু আমিও ভালবেসেছিলাম তোমায়, মিতা। সেটাও কি মিথ্যা ?

- ভালবাসা সহজ দেবল। কিন্তু অনেক, আরো অনেক বেশী ভাগ্য থাকলে তবে যায় ভালবাসা পাওয়া।

কঠিন হয়ে উঠল,—ওঃ তোমার নিজের অভিজ্ঞতা বুঝি ?

মাথা নীচু করে উত্তর দিল মিতা,—সত্যি তাই। আমি আগে একজনকে ভালবেসেছিলাম। শুধু সেইটুকুই তোমার জানতে মন সরেনি। তার নতুন ঝকঝকে মিলিটারী ইউনিফর্ম, নতুন কায়দায় গোরা অফিসারদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, ক্লাবে ডিনারে ডান্সে প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো—ঐ সবই আমার চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছিল। মনকে দিয়েছিল রাঙিয়ে। এখন তুমি বুঝবে কেন আমি সেই ক্লাবেই কাজ নিলাম, কেন ওয়াক.আই. হয়ে এই বিভুঁয়ে বসে আছি।

—কিন্তু আমি ? দেবল এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেল। যেন তার আর কিছু বলবার নেই।

মিতাই বলল,—বিশ্বাস কর দেবল, আমি চেয়েছিলাম তোমায় ভালবাসতে। চেষ্টা করেছি অনেক। করেছি মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া। তবু, তবু তাকেই ভালবাসি এখনো।

স্তব্ধ হয়ে গেল দেবল। টেরও পেল না কেমন করে চুপ করে কথা শোনার মধ্যেই তার গলা শুকিয়ে উঠল। বুঝতেই পারল না তার জীবনে কী একটা মর্মান্তিক আবিষ্কার এসে গেল। শুধু চুপ করে রইল সে।

কিন্তু চারিদিকে যুদ্ধের আবহাওয়া, মৃত্যুর নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে জীবনের সঙ্গে অভিসারের সময় কোথায় একজন যোদ্ধার? দেবল নিজেকে সামলিয়ে নিল। সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞেস করল,—কিন্তু এখনও কি তার কাছ থেকে কোন সাড়া পেয়েছ?

মাথা নীচু রেখেই মিতা উত্তর দিল,—আমি জানি সে আমায় জানে, কিন্তু এখনও ভালবাসে না। কিন্তু ভাল বাসতে পারা-ই যথেষ্ট। আমি শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন আমার সৌভাগ্যটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে। কখনো দয়াময়কে জানাইনি যে সে-ও যেন আমায় প্রতিদান দেয়। ভালবাসা—সেটুকুই আসল জিনিস। প্রতিদান না পেলেও ক্ষতি নেই।

—তাই বুঝি তুমি আমায় কখনো সে-সব কথা খুলে বলনি? আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চাও নি?

—হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র কারণ। আমি ত দেখেছি তোমার মন কেমন করে জল পেয়ে আস্তে আস্তে চারা থেকে ফুলে ফুলে ভরা গাছ হয়ে দাঁড়াল। তোমার ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়ে উঠল। তাকে বাধা দেবার, ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করাও পাপ। যে জিনিস আমার অন্তরকে দহন করেছে, তা তোমায় করে তুলল উজ্জ্বল। সে আলোকে চেপে রাখব, নিভিয়ে দেব—কোন্ অধিকারে, দেবল?

বলতে বলতে মিতার স্বর প্রায় ফিসফিসানিতে এসে দাঁড়াল। প্রায় শোনা যায় না। দেবলের হাতঘড়িটার টিক্ টিক্ পর্যন্ত তার চেয়ে বেশী জোরে শোনা যাচ্ছে।

দেবলের কান সেদিকে গেল। সে তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেলতে গেল।

মিতা বুঝতে পারল। অমনি বাধা দিল,—না, থাক থাক। ওটা তোমারই হাতে থাকুক। মনে করিয়ে দেবে আমার কথা—'ওগো, ভাল থেকে, সুস্থ থেকে, ফিরে এসো তুমি'। তুমি তা হ'লে নিজের দিকে নজর রাখবে। ইচ্ছা করে অনর্থক বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কথা দাও, কথা দাও দেবল! আমার দিব্যি!

—আচ্ছা, কথা দিলাম, মিতা। কিন্তু কথা দিলেই যে তা রাখতে পারব তার ঠিক কি? এই লড়াইয়ে আমরা ত শুধু মেশিনের সামনে দাঁড়-করানো পুতুল। কিন্তু তুমিও কথা দাও যে এই ফ্রন্ট থেকে এখন পিছনে চলে যাবার চেষ্টা করবে? যাকে তুমি ভালবাস অন্তত: তার জন্যেও ত তোমায় নিরাপদে থাকতে হবে। তা হলে হয়ত একদিন তুমি তাকে পেতেও পার।

ম্লানভাবে মিতা বলল,—তা হয় না, দেবল। আমি বিশেষজ্ঞ, স্পেশালিস্ট; ট্রেনিং নিয়েছি এই সব যন্ত্র চালাবার জন্য। সেজন্যই ফরোয়ার্ড এরিয়াতে আগুয়ান এলাকায় আমায় আসতে দিয়েছে। অন্য ওয়াক.আই. যারা এসেছে তারা যদি ফিরতে চায় তাদের ফিরে যেতে দেবে। কিন্তু আমার কোন অজুহাতে ফিরবার পথ নেই। তোমরা না হটে যাওয়া পর্যন্ত সে কথাই ওঠে না। কিন্তু তোমরা হেরে যাও তাই-বা প্রার্থনা করব কোন প্রাণে?

আওয়াজ ধরবার যে যন্ত্রটার চাবি মিতা খুলে রেখেছিল তাতে শব্দ উঠতে লাগল।

—দুশমন, কম্যাণ্ডার মেমসাহেব, দুশমন মেরা হাত-পাও বাঁধকে পাকড় রাখ্‌খা হ্যায়। দুশমন। হুঁশিয়ার!

—ওই রে, হাবিলদার ব্যাটা মুখের বাঁধন খুলে ফেলেছে। যাই ওকে বন্দুকের এক কুঁদোর ঘায়ে অজ্ঞান করে আসি।

বলতে বলতেই ছুটতে শুরু করল দেবল। মিতা লাফিয়ে ওর সামনে এসে পথ আটকাল, বলল,—খবরদার, ভুল করো না। ও তোমায় চিনে রাখবে। আর সবাই জানবে যে তুমি এখনো কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছ। আধঘণ্টাও হয়ে এল। শিগগির, পালাও শিগগির। আর দেরি নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেটে কিছু খাবারের প্যাকেট গুঁজে দিল। আর একটি জলের বোতল। ভগবান তোমার ভাল করুন, দেবল। মঙ্গলে রাখুন! আমার কথা মনে রেখো। যাও, যাও—এক্ষুণি।

নিজে হাতে দেবলকে মিতা অন্ধকারে ঠেলে দিল।

সেই অন্ধকার, যাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, যায় না দেখা চোখ দিয়ে। শুধু সারা মন জুড়ে রাখে, ঢেকে দেয় সারা জীবন।

সেই অন্ধকারের মধ্যে একা পিছনে পড়ে রইল মিতা।

আর রইল তার চোখের জল······মনের কান্না!

তেরো

কিন্তু কান্নারই বা সময় কই ?

মিতার কাছে দেবল কথা দিয়ে এসেছে যে অনর্থক বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। তার ফলে মিতার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে। শুধু দূরে নয়। এখানে এসে পড়ার চিহ্নটুকু পর্যন্ত এমনভাবে মুছে ফেলতে হবে যাতে মিতার দলের লোকেরা কিছু বুঝতে না পারে।

শত্রু যে এই ঘাঁটিতে এসেছিল তার প্রমাণ ত রইল সান্ত্রীর কাছে। কিন্তু সে যে শুধু সান্ত্রীকে বেঁধে রেখেই চলে গেছে, এ কথা এই 'ও. পি'র অর্থাৎ নজর রাখবার ঘাঁটির লোকেরা মনে করবে না। হয়ত মিতাকে সন্দেহ করবে। জবানবন্দী চাইবে। এমন কি ইন্‌টারোগেশনও করতে পারে। বাঙালী মেয়ে ত।

একটু থেমে পড়ল দেবল। তা হলে মিতার কি হচ্ছে সে খবরটা না জেনে চলে যাওয়া যায় না।

কিন্তু সে যদি নিজেই ধরা পড়ে।

তা হলে মিতার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ হবে নাকি ? মিতাকে ইংরেজ বিপক্ষের ফিফ্‌থ কলমের, শত্রুপক্ষের গোপন লোক বলে সন্দেহ করলেও সর্বনাশ। প্রমাণের অভাব হবে না। ইংরেজের এমার্জেন্সী কমিশনড্‌ অফিসার দেবল আর আই.এন.এ.র দেবল যে একই লোক সে কথা সহজেই বেরিয়ে যাবে। এমন কি রেডিওতে দেবলের কাছে পাঠানো মিতার খবরটুকুও। তারপর এই হাতঘড়িটা কি কারো নজরে পড়বে না ? তাছাড়া দুজনেই যে বাঙালী সে-ই ত যথেষ্ট বড় প্রমাণ।

নাঃ। দেবলকে গা-ঢাকা দিয়ে পালাতেই হবে।

কিন্তু মন ? মনকে সে ঢাকবে কি করে ?

গলা শুকিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মিতার দেওয়া জলের বোতল থেকে দেবল ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল। তৃষ্ণার বারি। মিতা, তুমি ত আমার তৃষ্ণার জল !

টিলা থেকে নামতে নামতে দেবল নিজেকে একটু সামলে নিল। না, মিতা ত তৃষ্ণার জল নয়। সে তৃষ্ণার্ত হতে পারে। কিন্তু মিতা ত তার

জন্য জল সাজিয়ে রাখে নি। যার জন্য রেখেছে, সে হয়ত এই জলের দিকে কোন দিন ফিরেও তাকাবে না। এই জল পান করা ত দূরের কথা। অথচ যে সেই জলের দিকে তাকিয়ে চির-পিপাসিত হয়ে আছে তার কাছে সে-জল হয়ে রইল শুধু মরীচিকা।

মিতার সান্ত্বনার কথা মনে পড়ল। মিতা দেবলের আলোকে চেপে রাখেনি, নিভিয়ে দেয়নি। তাকে ফলে-ফুলে ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে প্রেরণা দিয়েছে। শুধু সেইটুকুই দিয়েছে মিতা। তার বেশী কিছু নয়। শুধু মায়া, শুধু ছায়া। কায়া নয়। জায়া হবে না মিতা তার।

মনে পড়ল কৈশোরে পড়া কবিতা—

ফুলেরে যা দিলে কিছু নাই ক্ষতি
অথচ আমার লাভ ;
আমি চাই সেই সৌরভ শুধু
অতনু অতল ভাব।

এত বিপদ, এত ব্যস্ততা-উৎকণ্ঠার মধ্যেও দেবলের হাসি পেল। সত্যি, মিতা ঠিকই বলেছে,—দেবল অসম্ভব রকমে রোমান্টিক একেবারে 'ফানি' বলা চলে। 'অতনু অতল ভাব'। হায় রে, কবিতায় ভাববিলাসে তোমার সব কিছু ঢেকে রাখতে হবে, সাজিয়ে রাখতে হবে। তার বাইরে এগিয়ে আসবার তোমার অধিকার হবে না কখনো। অতনু! তপস্যার মধ্যে মহাদেবের মনে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলার অপরাধে মদন ভস্ম হয়ে গেলেন, তাই তাঁর নাম অতনু। কথাটা দেবলের মনে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিল যেন। সে আগুনে আর একবার বোধ হয় মদন ভস্ম করা যায়।

দেশের জন্য তুমি উৎসর্গ করতে পার দেহ। কিন্তু প্রিয়ার জন্য দিতে পার শুধু মন।

না, তাও তুমি পার না। দেশের জন্য দিতে হবে সব। মন সরিয়ে আনতে হবে আর সব-কিছু থেকে। এই একটি আদর্শ যার সেবায় ভাগাভাগি চলবে না। চলবে না কোন বিচার,—কোন বিতর্ক।

তাড়াতাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল দেবল। যে যন্ত্রপাতি সেখানে লুকিয়ে রেখে টিলাটা তালাস করতে গিয়েছিল সেগুলি তুলে নিল। এখন

কি সে একবার বেতারে নিজেদের হেড কোয়ার্টার্সে খবর দেবে যে এখানে একটি আর পাঁচ মাইল দূরে আর একটি সন্ধানী ঘাঁটি শত্রুরা বসিয়ে রেখেছে ?

কিন্তু এই ঘাঁটিতে আছে মিতা। তার মিতা না হোক। মিতা ত বটেই। খবরটা সে দেবে কি ?

একদিকে নিজে, নিজের দল, আজাদ সৈন্যদল, দেশ। অপর দিকে মিতা—শুধু মিতা। তার মিতা নয়। তবু মিতা।

মাথাব উপর অনন্ত আকাশ আঁধাবে ভরা। একটি তারাও কি দেবে কোন ইশারা ? কোন আলো ? শুধু একটি উল্কা কোথা থেকে খসে গিয়ে চোখের নিমেষে হারিয়ে গেল।

এই রাত্রেও ঘেমে উঠল দেবল। ভগবান, ভগবান, পথ দেখাও! বলে দাও, কী করা উচিত। কে বড় ? কার প্রতি এখন বিশ্বাসঘাতকতা করব ?

বিশ্বাসঘাতকতা ? সে ত শুধু এক পক্ষেরই প্রতি করা যায়। সে আজাদ হিন্দ্ সৈন্য আইনে শপথ নিয়েছে যে দেশ স্বাধীন করতে হবে। মিতার গা ছুঁয়ে ত কোনদিন শপথ করেনি যে তাকে সুখে দুঃখে জীবনে মরণে দেখাশুনা করার ভার তার। এমন কি মিতা তাকে কোনদিন সে দায়িত্ব নিতে বলেনি। বলবার মেয়েই নয় সে। দেবলের কর্তব্যের পথ ত শুধু এক দিকেই রয়েছে। মিতার প্রতি কোন বিশ্বাসই নষ্ট করা হবে না।

তবু ...

মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল দেবল। মিতা ত শুধু মিতা নয়। সে হচ্ছে শত্রুপক্ষের ওয়াক-আই। শুধু তাদের সহচারিণী নয়। সাধারণ ওয়াক-আই-এর সাধারণ কাজের চেয়ে অনেক বেশী যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে সে আছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তার এই কাজ যে-কোন সৈন্য বা অফিসারের কাজের চেয়ে এক হিসাবে অনেক বড। তার কাজের উপর নির্ভর করছে শত্রুপক্ষের গতিবিধি।

শুধু মিতা নয়। সে হচ্ছে শত্রু। শুধু দেবলের নয়, দেশের শত্রু।

তবু.......

আবার নিজেকে বোঝাল দেবল। একজন মিতা গেলে হাজার জন বেতার-কর্মী জুটবে ইংরেজদের। কিন্তু দেবল গেলে আর একজন দেবল নেই

আজাদ দলে। মাঠে ঘাটে ব্যাটারীতে বেতার চালিয়ে কাজে লাগাবাব মত শিক্ষা ত নেই-ই। এমন কি এই বেতারযন্ত্রটা যদি যায় তার সব কটা টহলদার দলই অকেজো হয়ে পড়বে।

মিতার নিবাপদ থাকার উপব ইংরেজ-আমেবিকান দলের এমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু দেবল ধরা পড়লে বা দেবল তার কর্তব্য পুরোপুরি পুরোদমে না করলে এই অভিযানটাই হয়ে যাবে কানা।

ব্যাটারীব সঙ্গে বেতাবের তার ঠিকমত লাগানো আছে কিনা তাড়াতাড়ি দেখতে লাগল দেবল। লডাইয়ে এসে দোমনা দশা হচ্ছে সর্বনাশেব কথা। অত ওজন করে ভেবে-চিন্তে গুলি ছোঁড়া যায় না। তর্ক কবলে সৈন্য হওয়া যায় না।

দেবল হচ্ছে বীব, বীরের মত তার কর্তব্য করে যাবে। তাতে যদি নিজে সে ধবা পড়ে বা মাবা যায় তাতেই বা দুঃখ কি?

ধরা পড়ে? কেন মিতাই কি তাকে ধবিয়ে দিতে পারত না? এখনও ইচ্ছা করলে তাব খুপবীতে ওই যে একেবারে আধুনিক জোরালো যন্ত্রটা আছে তাব সাহায্যে দেবলের চারপাশে খোঁজ করবার দল পাঠিয়ে দিতে পারে। দেবল জানে যে মিতা তা কখনও করবে না।

তা হলে মিতার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাও ত আছে। একজন সৈনিকের আর একজন সৈনিকের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের একটা অলিখিত রীতি আছে। আপ্‌না ইমান, নিজের মর্যাদা বজায় রাখা ফৌজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা। কোড অব অনার।

জ্বালা বড় কম নয়। একদিকে সিপাহী হিসাবে নিজের কর্তব্য, অন্যদিকে সিপাহী হিসাবে নিজের ইমান। মিতার কথা ছেড়েই দিলাম। নিজের হৃদয়কে হিসাবের মধ্যে আনলামই না। শুধু স্বার্থের, শুধু কর্ণেল দেবল সিংহের দিক দিয়েই ব্যাপারটা বিচার করছি। তবু যে কোন কিনারা হচ্ছে না।

তারগুলো দেবল তাড়াতাড়ি ঠিক জায়গায় লাগিয়ে নিল। এবার এবার......

আচ্ছা, আমি যে এখন খবরটা পাঠাতে যাচ্ছি এটা ত উপরের টিলায় বসানো আওয়াজ প্রতিধ্বনিত করে তোলার যন্ত্রে ধরা পড়বে। মিতা ত যন্ত্রটা খুলে রেখেছিল দেবলকে বাঁচাবার জন্যে। যাতে হঠাৎ কোন লোক বা দল টিলার কাছে অজান্তে না এসে পড়ে সেজন্যে।

এখন মাত্র মিনিট কয়েক পরেই সেই যন্ত্রেই তার রক্ষণকারিণীকেই বিপদে ফেলার মত কাজ করা হচ্ছে এই খবরটুকু ফুটে উঠলে কেমন হবে? মিতা কি ভাববে? মিতার মুখখানা কেমন হয়ে উঠবে?

বীর আমার!

হ্যাঁ, অবশ্যই বীর। নিজের দেশের জন্য, নিজের আদর্শের জন্য যে নিজের প্রিয়াকে বলি দেবার জন্য তৈরি, তার চেয়ে বড় বীর আর কে আছে দুনিয়াতে?

ঠিক কথা। এই রকম ভাবেই দেশ বড় হয়, স্বাধীন হয়। নিজের সুখ-শান্তি উৎসর্গ করেই জাতিকে তুলে ধরতে হয়। দধীচিও নিজের হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করেছিলেন নিজের জাতিকে যুদ্ধে জেতাবার জন্য। তৈরি হয়ে নাও দেবল। ধরে নাও যে তুমি মানুষ নও, মেশিন।

কিন্তু মেশিন চালানো হয়ে উঠল না। দূরে একটু আলোর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আগে তার কিনারা করা দরকার।

অনেকটা হেঁটে আসার পর ওদিকের জঙ্গলে কড়মড় করে একটা আওয়াজ শুরু হল। মানুষের পায়ের আওয়াজ। শুকনো গাছের পাতা, বাঁশের ঝাড় এ-সব ভারী কিছুর চাপে যেন পিষে যাচ্ছে। এখন ত বেতার-যন্ত্রের কাজ আরম্ভ করা ঠিক হবে না। ওটাকে একটা জলার পারে মাটি চাপা দিয়ে দেবল খুব সাবধানে আওয়াজটির দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে লাগল।

খানিকটা এগোনোর পর দেবল বুঝতে পারল যে একটা বিশেষ গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটবে। জঙ্গলের ওপারে একটা মণিপুরী গ্রাম, সম্ভবতঃ খুব ছোট্ট গ্রাম হবে। সেদিকে এগিয়ে চলেছে একজন সিপাই। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে সাধারণ পদাতিক সিপাই হবে। গা ঢাকা দিয়ে বিপথ দিয়ে চলেছে সাবধানে লুকিয়ে-চুরিয়ে। অর্থাৎ কোন কিছু বদ মতলব আছে।

এমন অবস্থায় দেবলের ওর পিছু নেওয়া ঠিক হবে না। ওর যদি কোন খারাপ মতলব থাকে তাতে বাধা দিয়ে দেবলের বা আজাদ দলের কোন লাভ নেই। বরং ওরা যত খারাপ বলে লোকের সামনে প্রমাণিত হবে ততই দেবলের সুবিধা। তা ছাড়া দেবল যদি বাধাই দেয়, ভবিষ্যতে কার লাভ হবে তাতে ?

ওই গাঁয়ের লোকেরা যদি ওকে ধরে ফেলে আর শত্রুর হাতে তুলে দেয়, নিশ্চয়ই মোটা রকমের বখশিশ ওদের জুটবে। এমন কি যে লোকেরা একলা বা লুকিয়ে আই. এন. এ.-দের সহায়তা করতে চায় তারাও—অনেকে জড়ো হলে বা অনেকে জানতে পারবে এই ভয়ে সাধু বনে যাবে। হাতের কাছে কর্তা রয়েছে বৃটিশ দল ; রাজার প্রতি অনুগত প্রজার ভক্তি দেখানো হবে। উপরি পাওনা হবে বখশিশ।

নাঃ, ওসব কাঁচা কাজে দেবল নেই।

তবু সে ওত পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। সিপাইটা রাতারাতি ফিরে আসবে। হয়ত এক্ষুনি আসতে পারে। চোর বনবাদাড় ঘেঁষেই চলাফেরা করে। কাজেই এই জঙ্গল দিয়ে ফিরে আসার সময় ওর ইউনিফর্মটি কেড়ে নেওয়া বড় দরকার। এ পর্যন্ত একটাও শত্রুপক্ষের ইউনিফর্ম যোগাড় হয়নি। তাছাড়া নূতন মডেলের রিভলভার আর তার কিছু গুলী পাবারও সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু এই রাহাজানিটা গ্রামের কাছাকাছিই করতে হবে। জঙ্গলে করলে টিলার হাবিলদারের কাহিনীর সঙ্গে এটা মিলিয়ে নিয়ে ওরা ঠিক ধরে নেবে যে, কোন আই. এন. এ. বা জাপানী হানা দিয়েছিল। ধরে নেবে যে, সে এখনো কাছাকাছি আছে। তার জন্য খানাতল্লাশী শুরু হবে।

গ্রামের কাছাকাছি হলে ওরা হয় ত মনে করবে যে বদমায়েসী করার ফলে গ্রামেরই কোন লোক এই কাণ্ড করছে। কুকীর্তির কাহিনী তখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হবে।

আরও একটা কথা ভাববার আছে। যদি ওরা পরে দল বেঁধে এসে গ্রামটার উপর অত্যাচার করে—আজাদী দলকে

ভবিষ্যতে দু হাত তুলে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আরো এলাকা মনে মনে তৈরি হয়ে যাবে।

মোটকথা ইউনিফর্মটা তার চাই। তা না হলে যে-কোন সময় হঠাৎ সে এই শত্রু-এলাকাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। একেবারে বমাল-সমেত।

বমালের কথাতে টিলার 'ও.-পি.' সম্বন্ধে খবরটা যে এখনো পাঠান হয়নি সে কথা আবার মনে পড়ল।

ততক্ষণে দেবলের মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। দুটো-একটা ও.-পি. কোথায় বসানো হয়েছে সেটা আর এমন কি বড় খবর? সারাটা শত্রু-এলাকাতেই ত এরকম 'ও.-পি' নানা জায়গাতে বসানো থাকবে। তাই ত স্বাভাবিক। এরকম ছোটখাটো খবর দিয়ে ওর বেতারের ব্যাটারিটা খরচ করে ফেললে চলবে কি করে?

ব্যাটারি আবার চার্জ করিয়ে নেবার যন্ত্র আই.-এন.এ. ফরোয়ার্ড ইউনিট-এ কারো সঙ্গেই নেই। কাজেই যেটুকু মাল-মসলা আছে সেটুকু বাজে খরচ না করে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হবে বৈকি? হত যদি একটা বড় সৈন্যদলের চলাচলের খবর, সেটি পাঠানোর মানে হত।

দুটো-একটা সন্ধানী ঘাঁটির খবর হেড কোয়ার্টার্সে পেলেই বা লাভ কি? আমেরিকানদের মত লিবারেটার উড়োজাহাজ ত নেই। থাকলে সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে রসগোল্লার মত গোটাকয়েক বোমা টুপটাপ···

ভাবতেই শিউরে উঠল দেবল। একি সাংঘাতিক চিন্তা যত। মিতা, মিতা।

হ্যাঁ, দেবলের কাছে এতক্ষণে ব্যাপারটা তার প্রকৃত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মিতা যে শত্রুপক্ষে রয়েছে সেই আবিষ্কারই ও.-পি.কে দেবলের চোখে এত বিষম আর ভাবনার ব্যাপার করে তুলেছিল। তার মনে যে এত দ্বন্দ্ব তার সবকিছুর মূলেই রয়েছে মিতা।

ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। শুধু একটা ও.-পি.র খবর বেতারে পাঠিয়ে আই.এন.এ.র কোন লাভ হবে না।

দেবলের মন শান্ত হয়ে এল।

শিকারী বাঘের মত ওত পেতে জঙ্গলের কিনারায় বসে রইল দেবল।

আসুক একবার শিকার তার আওতায়। তারপর থেকে আবো একটু বেশী বেপরোয়া ভাবে খবর যোগাড়ের জন্ম ঘোরাফেরা করা সম্ভব হবে।

হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার উঠল। মেয়ের গলা। কিন্তু সে চিৎকার পুরোপুরি বোধ হয় গলা থেকে বেব হল না। মেয়েটির মুখ নিশ্চয়ই চেপে ধরা হযেছে।

দেবল তীরের মত সামনে ছুটে গেল। মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে। পিছনে পড়ে রইল হিসাব কষে সাবধানে পা মেপে মেপে চলাব ভাবনা।

অন্ধকাবে এই ছোট্ট গাঁ-খানা দেবলের ঠাহর হয়নি। একেবারে ছেড়ে আসা গ্রাম। লোকজন বোধ হয কোন বাড়ীতেই নেই। সম্ভবতঃ মিলিটারীরা টিলায আস্তানা নিয়েছে বলে ভয়ে পালিয়েছে।—

পালাতে পাবেনি বোধ হয় অসহায় মেয়েটি।

কিন্তু ওর আত্মীয়-স্বজন কি কেউ নেই নাকি? না হলে মাত্র একটা সিপাই বাডী ভেঙ্গে ঢুকে এবকম অত্যাচাব করবার চেষ্টা করতে পারে?

সে-সব কথা ভাববার সময় নেই! সিপাইটা তেড়ে ছুটে এল দেবলের দিকে, হাতে তার টমিগান। দেবল দডাম করে তার বন্দুকের নলের উপর একটা বেতের চেয়ার ছুঁডে মারল, বন্দুকেব নিশানা ফস্কে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে তেড়ে এসে সিপাইটাকে আক্রমণ করল। দুজনে ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হল।

দিনের পর দিন আধপেটা খাওয়া, রোজ রাতে দিনে লুকিয়ে মার্চ করা আজাদী দেবল একদিকে; অন্যদিকে সামরিক নিয়মে র‍্যাশন, বিশ্রাম আর তোয়াজে পুরুষ্টু সিপাই। এ দুয়ে হাতাহাতির লড়াই বেশীক্ষণ চলতে পারে না।

কিন্তু দেবল জাপানী বন্দীশিবির থেকে বের হবার পরেই জাপানীদের কাছে যেটুকু যুযুৎসু শিখেছিল, তার কল্যাণে শেষ পর্যন্ত সিপাইটাকে মাটিতে ফেলে দিল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। সিপাই আবার উঠে দেবলকে তেডে গেল; ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরল। দুজনে জড়াজড়ি করতে করতে টমি-

গানটার কাছে গিয়ে পড়ল। দেবল আবার যুযুৎসু প্যাঁচ দিয়ে সিপাইকে কাহিল করে আগেই টমিগানটা তুলে নিল। ফট্ ফট্···

ঝড়ের মত ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হবে না।

মৃতদেহটা টানতে টানতে সে গ্রামের পুকুরে এনে পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিল। যে ইউনিফর্মটা তার এত দরকার ছিল সেটা আর নেওয়া হল না। লড়াইয়ে ফৌজ নয়, কিন্তু গ্রামে নিখোঁজ যে সিপাই তার ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় ধরা পড়লে নিজেই যে খুনী তা হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে যাবে। যাক্ গে ইউনিফর্মটা।

খুনের বাকী সাক্ষী রয়েছে মেয়েটি, যদিও তাকে বাঁচানোর জন্যই খুন করতে হোল। তাকে এরকম অবস্থায় এখানে ফেলে যাওয়া নিরাপদ নয়। না মেয়েটির পক্ষে, না তার নিজের পক্ষে।

এবার পালাবার পালা।

দেবল মেয়েটির হাত ধরে ঘরের বাইরে এসে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। কোথায় পালাবে জানে না, এলাকাটাও সম্পূর্ণ অজানা। কিন্তু পালাতে হবেই, শুধু নিজেকে নয়, মেয়েটিকেও। না হলে রক্ষা নেই।

টিলার আস্তানাটা এমন কিছু বেশী দূর নয়। সেই দূরের ও. পি. থেকে লোকগুলির ফিরে আসতে দেরি নেই। তার পরই শুরু হবে নিজেদের মধ্যে থেকে নিখোঁজ এই মরা সিপাইয়ের খোঁজ, শুরু হবে হাবিলদারকে বেঁধে রেখে যাওয়া দুশমনের সন্ধান। এই গাঁ-খানাতেই টহলদাররা হানা দেবে সবার প্রথম। জঙ্গলটাও বাদ যাবে না।

—আঃ, ছাড় ছাড়, বাবা গো···

মেয়েটি অসহায় ভাবে চেঁচাতে লাগল। কী বলে যে চেঁচাচ্ছিল তা শুনবার মত মনের অবস্থা দেবলের ছিল না। তবে ওই ওরকমই কিছু একটা মনে হল। কিন্তু মেয়েটিকে চেঁচাতে দেওয়া চলে না। দেবল তার মুখ জোর করে চেপে ধরল।

ছাড়া পাবার জন্য মেয়েটি হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল। তখন দেবল তার মুখে শাড়ীর আঁচল গুঁজে দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ছুটতে

লাগল। অন্ততঃ গাঁ থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে এসে লুকোনো দরকার। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে সাফ করে দিলেই চলবে।

জঙ্গলে ঢুকেই দেবল সেই জলার পারে চলে গেল। তারপরে মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে দেখল যে সে মূর্ছা গেছে। এ হল আর এক নূতন বিপদ। এরকম অবস্থায় একে এখানে ফেলে যাওয়া যায় না। অথচ যত দেবি কববে ততই ধরা পডবাব সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েটির মূর্ছা ভাঙ্গাতে হবে। জল চাই। এইবার দেবল মিতার দেওয়া বোতলের জলের দিকে তাকাল। একটু ইতস্ততঃ করল।

মিতার দেওয়া জল। মিতা তার কেউ নয়, তবু তার দেওয়া জল। অন্তহীন পিপাসার অমৃতবারি। একটু ইতস্ততঃ করে, মন ঠিক করে সেটাই মেয়েটির চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। তারপর বোতল ভরে জলা থেকে আরো জল আনল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ফিরে আসতেই মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল।

কী করবে বুঝতে না পেরে দেবল ভাবল যে, বোধ হয় তা হলে নিজে চলে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল হবে। কী ভাষায় বলবে? মেয়েটি হয়ত মণিপুরী, না হয় বড় জোর আসামী হবে।

তাই বাংলায় বলল,—তা হলে এবার যাই।

সে হুহু করে আরও কাঁদতে লাগল, দেখে দেবল হতভম্ব হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল,—আপনি যখন আমায় ভয় পাচ্ছেন আমি বরং যাই।

মুখ ফিরিয়ে সে শুধু কাঁদতে লাগল। দেবল অস্থির হয়ে গেল— এখনো কেন কাঁদেরে বাবা!

আমি ত চলেই যেতে চাচ্ছি, যদি আমায় এত ভয় করো। আর যদি জঙ্গলে একা থাকার জন্য ভয় পাও তো পালিয়ে আসতে আপত্তি কেন তোমার? না, তুমি ভাবছ যে এক ডাকাতের হাত থেকে আর-এক ডাকাতের হাতে পড়েছ।

কিছুই বুঝতে না পেরে দেবল উঠে পড়বার জন্য তৈরি হল। কিন্তু মেয়েটির চোখের সামনে বেতারযন্ত্রটা মাটি খুঁড়ে বের করা কি ঠিক হবে?

একটু ইতস্তত: করে সে মেয়েটিকে ভাল করে দেখবার জন্য নীচু হয়ে হাঁটু গেড়ে মুখটা কাছে আনল

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ততক্ষণে একটু আলো ছড়াচ্ছে।

মেয়েটি এতক্ষণে বাংলায় খুব নীচু গলায় বলল,—আপনি বাঙালী?

—হ্যাঁ, আমি বাঙালী। কিন্তু খবরদার। আমার কোন কথাই জানতে চাইবেন না। শুধু আপনাকে যে এখনি কোন নিরাপদ জায়গায় পালাতে হবে সে-কথা ভাবুন। আপনি মণিপুরী?

—হ্যাঁ, আমি মণিপুরী।

—তবে ত আপনার পালিয়ে যাবার জায়গা কোথাও না কোথাও হবে। চলুন আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আমাকেও চলে যেতে হবে। আমার তাড়া আছে।

একটু আশ্বস্ত হয়ে চোখের জল মুছে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল,—আপনি নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান আর্মির লোক নন। কিন্তু ইউনিফর্ম পরা ত দেখছি।

খুব সংক্ষেপে দেবল গা বাঁচিয়ে উত্তর দিল,—না।

কিন্তু অত সহজে পার পেল না। আবার প্রশ্ন হল,—কিন্তু ইউনিফর্মটাও পুরানো ছেঁড়া দেখছি। হিজ ম্যাজেস্টিস ফোর্সে বা 'জি. আই.'তে এরকম পোষাক কেউ পরে না।

জি. আই. অর্থাৎ আমেরিকান সৈন্যদল।

দেবল চুপ করে রইল। কিন্তু আবার প্রশ্ন শুরু হল,—উঁহু, অকজিলিয়ারী ফোর্স এমনকি 'চিনডিট'দেরও এত দুরবস্থা হয় না।

জেনারেল উইনগেট বর্মা-সীমান্তে পাহাড়ের এলাকায় জাপানীদের নজর এড়িয়ে একদল বাছাই করা সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। লুকিয়ে-চুরিয়ে কষ্ট করে অনেক খোঁজখবর তারা এনেছিল বলেই বর্মাতে ইংরেজদের পাল্টা হানা দেওয়া ও যুদ্ধ জেতা সহজ হয়েছিল। পাহাড়ী চীন অঞ্চলের ব্যাণ্ডিট অর্থাৎ ডাকাত, এইজন্য ওদের নাম দেওয়া হয়েছিল চিনডিট।

কিন্তু এসব নাম আর খবর যে জানে, এত বুদ্ধি যার, সে ত সাধারণ গেঁয়ো মেয়ে নয়। তাছাড়া সিপাইটাকে খুন করার ব্যাপারে মেয়েটিও এক হিসাবে জড়িয়ে পড়েছে। দেবলের মাথায় বুদ্ধি গজাতে লাগল।

—ও, বুঝেছি, আপনি তা হলে আই. এন. এ.।

আর চুপ করে থেকে লাভ নেই। মনে মনে দেবল তৈরি হয়ে নিল। মেয়েটি কী বলে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

—আচ্ছা, তা হলে আপনার বিপদ বাড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি গাঁয়েই ফিরে যাচ্ছি। আপনিও আপনার পথ দেখুন। সাবধানে থাকবেন।

চট্‌ করে দেবল তার পাশে বসে পড়ল,—দেখুন, আপনি এখন গাঁয়ে ফিরে যাবেন না। গেলেই বিপদ হবে। জানেন ত সিপাইরা এরকম একটা অবস্থায় কী ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে।

কেন? কাল সকালে আমিই খোঁজ করে ওদের ক্যাপটেন-এর কাছে গিয়ে সব জানিয়ে আসব। এম. পি. (মিলিটারী পুলিশ) ত কলকাতায় ওদের কত অত্যাচার বন্ধ করেছে।

—কিন্তু এখানে রক্ষকই যে ভক্ষক হয়ে গেছে। আপনি কলকাতায় ছিলেন, সে অন্য ব্যাপার। কিন্তু আপনি কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস করবেন কি করে?

-- ডাঙ্গায় ত বাঘ ছাড়া কিছু নেই।

—তার মানে?

—ছিলাম ইম্ফলে। কলকাতায় বোমা পড়বে এই ভয়ে কলেজ ছাড়িয়ে বাবা নিয়ে এলেন দেশে। ইম্ফলে ওরা গাড়ল আস্তানা। আপনারাও দিলেন হানা। অন্যান্য অনেক অবস্থাপন্ন লোকের মত আমরাও গ্রামে জঙ্গলে বাসা বাঁধলাম। সেখানেও চড়াও হয়েছে সিপাই। আপনারাও যখন হাজির হয়েছেন, এখানেও লড়াই হবে। যাব কোথায় বলুন?

—আমিও সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি। তবে আর যেখানেই যান, গাঁয়ে ফিরবেন না। তা হলে আর আশা নেই।

—পথেই বা ভরসা কি?

—ভরসা নেই, তবে ভাবনা কম। এ অঞ্চলে ওরা এখনও ছড়িয়ে পড়েনি। তা হলে আমি আসতে পারতাম না। বোধ হয় জানেন যে কোহিমা আর ইম্ফল দু জায়গাতেই আমরা ওদের প্রায় ঘেরাও করে ফেলেছি। মাঝখানে এই একশো মাইল জায়গায় আপনি কোথাও না

কোথাও লুকোবার বন্দোবস্ত করতে পারবেন। সিপাইয়ের লাশটা খুঁজে পেলেও, আপনার সঙ্গে তার মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাবে না। কাজেই আপনি সরে পড়লেই নিরাপদ।

—আর আপনি ?

—আমি ত বিপদের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়েছি। আমার কথা আলাদা, দেবী—

—উত্তমা, আমার নাম উত্তমা সিংহ। তা দেখুন, আপনিও চলুন-না আমার সঙ্গে। আপনারও ত একটু নিরাপদে থাকা দরকার।

—বহু ধন্যবাদ, উত্তমা দেবী। তবে তার আগে আপনার আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাবুন। আমাদের পথ আমি নিজেই করে নেব। শুধু আপাততঃ আমার পোশাকটা বদলানো দরকার।

উত্তমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বলল,—ঠিক কথা। এপর্যন্ত আমি আপনার কথাই ভাবিনি। আমার সঙ্গে চলুন। সব বাড়ীই প্রায় খালি। কোন-না-কোন বাড়ীতে একটা ধুতি আব জামা নিশ্চয়ই পড়ে আছে। যোগাড় করে নিলেই হবে।

দেবল প্রশ্ন করল,—আর আপনার বাড়ীতে ?

ব্যাকুল কণ্ঠে উত্তমা বলল,—না, না, সেখানে নয়। বাবা বিকেলে বাইরে গেলেন, এখনো ফিরলেন না। আমাদের কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যাবার কথা ছিল। আজ রাতে এই কাণ্ড হলো—কী যেন বিপদ আমাদের ঘিরে এসেছে।

একটু থেমে বলল,—বাবাকে না খুঁজেই বা চলে যাই কি করে ? তাব চেয়ে আপনি পোশাক বদলিয়ে চলে যান। আমি বাবার খোঁজ করে পরে সরে পড়ব।

তা হলে ত দেবলের নতুন তৈরি প্ল্যান সবটাই ভেস্তে যায় !

সে তাড়াতাড়ি উত্তমাকে বোঝাতে লাগলো,—না, না, উত্তমা দেবী। স্বপ্নেও তা করবেন না। আপনার বাবা নিশ্চয়ই নিরাপদে আছেন। ওরা যদি লাশ খুঁজে বের করতে পারে তবু আপনার বাবাকে ঘাঁটাবে না। কোন কারণ নেই, কোন প্রমাণ নেই। ওঁর এই ব্যাপারে কোন হাত থাকলে নিশ্চয়ই গ্রামে ফিরে আসতেন না।

—যখন উনি ফিরে আসবেন, এই সিপাইটার সম্বন্ধে ওঁকে বড় জোর কিছু 'ইণ্টারোগেশন' করবে। আর কিছু করতে সাহস পাবে না। কিন্তু আপনি যদি ওদের নজরে আবার পড়েন তা হলেই বিপদ। আপনার ত বটেই। আপনার বাবারও হতে পারে।

ম্লানভাবে উত্তমা বলল,—তা সত্যি। কিন্তু ওঁকে ত জানানো দরকার যে আমি চলে যাচ্ছি। আমি নিরাপদে যাচ্ছি।

তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেবল আশ্বাস দিল,—সেজন্য ভাববেন না! উনি নিশ্চয়ই বাড়ীর সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখেই বুঝে নেবেন যে আপনি কোন ভাল লোকের সহায়তায় নিরাপদে সরে পড়তে পেরেছেন। কাজেই ভাববেন না। বরং আপনি সঙ্গে না থাকলে ওঁর পক্ষেও সরে পড়া সহজ হবে।

দেবল গ্রামের প্রান্তে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল।

উত্তমা তাড়াতাড়ি একটা খালি বাড়ী থেকে একটা মণিপুরী তাঁতের ধুতি আর তাঁতের কাপড়ের পাঞ্জাবি যোগাড় করে আনল। পাঞ্জাবিটা মণিপুরী ছাটের। অবশ্য ঠিক গায়ের মাপে হল না।

কিন্তু উত্তমা প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অভয় দিল,—এই লড়াইয়ের বাজারে ক'জন লোক আর ঠিক মাপমত দরজির কাটা জামা পরতে পারে। এই বেশ হয়েছে।

দেবল হেসে বলল,—ঠিক-মণিপুরী-মণিপুরী দেখাচ্ছে ত? একটু চন্দনের ফোঁটার ব্যবস্থা থাকা দরকার শুনেছিলাম।

এক ধমকে এই অসময়ের ঠাট্টাকে উড়িয়ে দিল উত্তমা,—আজকালকার ছোকরারা চন্দন-টন্দনের ফোঁটা পছন্দ করে না। আপনার অবস্থা হচ্ছে সেই যাকে বলে—খেতে নেই, শুতে রাঙা পাটী।

ইতিমধ্যে জঙ্গলের ওপরে রকমারী আলো, টর্চের রেখা, একটু-আধটু মশমশ আওয়াজ বুঝিয়ে দিল যে একটা দল খুব বেশী দূরে নেই। এখনি উর্দ্ধশ্বাসে গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে হবে।

এত বছর ধরে যত্ন করে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পরা ইউনিফর্মটা পর্যন্ত লুকোবার সময় হল না। জলাতে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে পালাতে হল।

হাত ধরে যেতে যেতে উত্তমা দেবলকে বলল,—মনে রেখো, তোমায় আমি কলকাতায় পড়বার সময় চিনতাম। তুমি কলকাতার লোক। যুদ্ধের সময় কোন কনট্রাকটারের কাছে কাজ পেতে পার এই আশায় মণিপুরে এসেছ। আর মিনতি করে বলছি—আমাকেও তোমার কাজে, দেশের কাজে, সাহায্য করতে একটু সুযোগ দিয়ো।

—কিন্তু চলেছ কোথায় তা ত বললে না?

—যেখানেই যাই, সেটা, যেতে যেতে ঠিক করতে হবে। রাসলীলা হচ্ছে এমন কোন গ্রামে যেতে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব। সে-সব গ্রামই আজকাল নিরাপদ। লোকে সন্দেহ করবে কম। অনেক লোক থাকে, অনেক ফালতু লোকও আসে মজা দেখতে, টাকা কামাতে। মণিপুরী নাচ জান ত? খুব ভক্তি-রসের নাচ। একেবারে তন্ময় হয়ে গলে যেয়ো। তা হলে কেউ ধরতে পারবে না।

বিপদ ওদের দুজনকে হাতে ধরে 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' এগিয়ে আনল। আই. এন. এ.র কর্ণেল ও মণিপুরী তরুণী।

চৌদ্দ

কোন গুপ্তচরের ঘাঁটি নাকি?

অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে ওরা থমকে দাঁড়াল।

গুপ্তচর না হলেও কোন সন্ধানী ঘাঁটির লোক নিশ্চয়ই ওখানে গোপন আড্ডা গেড়েছে। চারিদিকেই বৃটিশ আর মার্কিন সৈন্যদের ছাউনি, না হয় আনাগোনা। সে সব এড়িয়ে দেবল আর উত্তমা নির্জন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু পথে এই যে একটা উজাড়-করা গ্রামের মধ্যে টিলার আলো দেখা যাচ্ছে, এটার একটা হদিশ হওয়া দরকার।

দেবল অবশ্য গা-ঢাকা দিয়ে আছে। তবু যুদ্ধের কাজ করে যেতেই হবে। সে এমন একটা নির্জন ঘাঁটি খুঁজছে যেখানে শত্রুপক্ষের একটা বেতারযন্ত্র হঠাৎ হামলা করে যোগাড় করে নিতে পারবে। তা হলেই সবচেয়ে ভাল করে নিজের হেড কোয়ার্টার্সে খবর পাঠানোর সুবিধা হয়। চাই একটা আধুনিক জোরালো বেতারযন্ত্র।

শত্রুর হাতিয়ার দিয়েই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

কাজেই সে টিলার উপরে উঠে কুঠরিটা খানাতল্লাশ করতে চাইলে। কিন্তু হুট করে পাহাড় চড়াই করলেই চলে না। একা প্রায় নিরস্ত্র। এমন কি, যে ইউনিফর্ম পরা থাকলে খানিকটা সাহস আপনা থেকে জাগে, সেই ইউনিফর্মটা পর্যন্ত নেই। তবু স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক কি পিছিয়ে থাকবে?

স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক!

অন্ধকার রাতে হঠাৎ দূর থেকে দেখা তারার মত একটু আলোর কণা দেখা গিয়েছিল। শালগাছের জঙ্গলের আড়ালে বসে দেবল আর উত্তমা আলোটাকে খুব ভালো করে খেয়াল করল। ভয়ে আর লড়াইয়ের উৎপাতে সবাই এই এলাকা থেকে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়েছে। কাজেই শত্রুর আরেকটা ঘাঁটি নিশ্চয়ই হবে।

কাছাকাছি জায়গাগুলিতে যেরকম সৈন্য-চলাচল হয়েছে তাতে শত্রুর দলের লোক ছাড়া আর কারো এখানে মাটি কামড়িয়ে পড়ে থাকা সম্ভব নয়।

উত্তমা একা টিলাতে উঠে ব্যাপারটা দেখে আসতে চাইল। যদি ওখানে অনেক সিপাই থাকে, একটি মণিপুরী মেয়েকে দেখলে সন্দেহ করবে না। ভাববে কাছাকাছি কোন গ্রামের মেয়ে।

কিন্তু দেবল কি করে উত্তমাকে ওইরকম একটা সম্ভাবনার মুখে ছেড়ে দেয়? বিশেষ করে লড়াইয়ের আগুয়ান এলাকায়? যেখানে মরবার জন্য তৈরি হয়ে থাকতে থাকতে মানুষ সহজাত সভ্যতা, মনুষ্যত্ব সহজেই ভুলে যায়?

কিন্তু উত্তমাই বা কি করে দেবলকে একা টিলাতে উঠে যেতে দেয়? সে তর্ক করল—যদি ওখানে সৈন্যেরা থেকে থাকে, তোমায় একচোখ দেখেই বুঝে নেবে যে তুমি এই তল্লাটের লোক নও। মণিপুরী পোশাক পরলেও মণিপুরী উচ্চারণ ত মক্শ করতে পারনি। সে ত আর সহজে হয় না। যদি তুমি বিদেশী হও, কোথায় তোমার পরিচয়পত্র (আইডেন্টিটি কার্ড)? সেটা যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত সৈন্যদের মাঝখানে গিয়ে পড়া তোমার উচিত হবে না।

—কিন্তু ওখানে মণিপুরী নিরীহ লোকেরাও ত থাকতে পারে!

—তা হলে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। বরং তোমাকেই ওরা সন্দেহ করতে পারে, জেরা করতে পারে।

—তা আমি সামলাতে পারব। সিপাই হোক, আর সাধারণ লোকই হোক, ওদের সামনেই যে গিয়ে হাজির হব তার কোন মানে নেই। আমি আড়ালে-আড়ালে থেকে ব্যাপারটা বুঝে আসব। এত দিনই ত এরকম করেছি। কাজেই ভাবনার কিছু নেই।

—তোমার নিজের অবশ্য নেই।

কথাটা শুনে দেবল একবার উত্তমার দিকে তাকাল। উত্তমা, হায় উত্তমা! সে সম্ভবতঃ কী বলতে চায় তা দেবল বুঝতে পারছে। কিন্তু বুঝলে চলবে না।

তাই দেবল কথাটা যেন কানেই আসেনি এমন ভাব দেখাল। তাড়াতাড়ি নিজের দায়িত্ব জাহির করল। সে যে একজন সামরিক অফিসার।

দেবল ওই টিলার উপর শাল গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে উঠে যাবে

উত্তমা নীচের জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে চারদিকে খেয়াল রাখবে। যদি কোন শত্রুপক্ষের সিপাই কাছে-পিঠে দেখা যায় তা হলে সঙ্কেত করতে হবে। যদি কোন গ্রামের লোক দেখা যায় তা হলে নিজেকে আড়ালে ঢেকে রাখলেই হবে। কিন্তু যদি গ্রামের লোক কেউ টিলায় উঠতে থাকে তা হলে সঙ্কেত পাঠাতে হবে।

কিন্তু কী সঙ্কেত দেওয়া যায়! টিলাটা ছোট, জায়গাটাও নিঃঝুম। কিন্তু তা বলে টর্চ দেখান বা চেঁচান চলবে না। এক সম্ভব মুখে জোরে সিটি দেওয়া! কিন্তু তাতেও লোকে টের পাবে। তবে?

শেষে দেবল বলল,—কোন পাখীর ডাক নকল করতে পার? ঘুঘু বা তিতিরের ডাক?

—কাকের ডাক নকল করতে পারি।

—কিন্তু কাক ত এমন সময় ডাকে না।

– পারি, পারি। পাপিয়াব ডাক নকল করতে পারি। এদেশে খুব শুনতে পাওয়া যায়।

দেবল পাপিয়ার ডাক শোনেনি। কলকাতায় কোথায় আর পাপিয়া ডাকে? হয়ত ডাকে, কিন্তু দেবল খেয়াল করেনি। তাই সে শুনতে চাইল।

'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা'....

উত্তমাকে তাড়াতাড়ি দেবল বুঝিয়ে দিল যে দু'বার ডাকলে হবে না। কারণ, হয়ত কোন সত্যিকারের পাপিয়াও ডেকে উঠতে পারে। কাজেই যদি হুঁসিয়ার করে দিতে হয় তা হলে তিনবার ডাক দিতে হবে। আধ মিনিট পরে আবার তিনবার। যদি সাংঘাতিক জরুরী হয় তা হলে তিনবার নয়, চারবার। অন্য কোন লোকে পাপিয়ার ডাক গুণতে বসবে না। অতএব একটু বেশী ডাকলে কেউ সন্দেহ করবে না।

ছোট্ট রিভলভারটা ট্যাকে গুঁজে শার্টের সামনের দিকটা ভাল করে ছড়িয়ে ফুলিয়ে নিল দেবল। তারপর গাছের আড়াল দিয়ে টিলার গা বেয়ে উপরে উঠে গেল।

কোন আনাড়ী চিত্রকর হবে। ছবির পর ছবি আপন মনে এঁকেছে আর দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। দেওয়াল আর কী? হাল্কা-পল্কা ইকড়ার অর্থাৎ বেতের উপর পলস্তারা দেওয়া বাড়ী। মাথার উপর ছনের বদলে টিনের ছাদ। অর্থাৎ বাড়ীর মালিকের দু'পয়সা আছে।

দরজা-জানালাগুলো অবশ্য চোরের জন্য ঢালাও নেমন্তন্ন। শুধু কাঁচের শার্শি বসানো। চুরি বা রাহাজানির হাঙ্গামা উশুল হবে কিনা তা চোরকে কষ্ট করে যাচাই করে দেখতে হবে না।

লোকটা একেবারে বদ্ধ পাগল, নয় কবি। কিন্তু গুপ্তচর যে নয় তারই বা প্রমাণ কি? দেবল যখন ঘরে ঢুকে রিভলভার উচিয়ে চেঁচাল—'হ্যাণ্ডস্ আপ'—তখনো—তার মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। শুধু তাকিয়ে রইল। শুধু চেয়ে রইল। যেন চোখই মুখের হয়ে কথা কইবে।

কিন্তু দেবলের নষ্ট করবার মত সময় নেই! সে আবার তেড়ে উঠল,—হ্যাণ্ডস্ আপ, না হলে এখনি গুলী করব।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক খুব শান্তভাবে ইজেলটার সামনে বসে থেকেই বললেন, —আমার হাতে এই তুলি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। হাত তুলেই বা আপনাকে কি দেখাব?

কিন্তু সামরিক শিক্ষায় হাত পাকিয়েছে দেবল। এসব কথায় সে ভুলবে না। তন্ন তন্ন করে সে সারা বাড়ীটা খুঁজলে- সব ক'টা তোরঙ্গ, টেবিলের টানা দেরাজ প্রভৃতি।

তারপর জিজ্ঞেস করল,—এই লড়াইয়ের এলাকায় আপনি একা পড়ে আছেন কেন? আমি যে 'প্লেন ক্লোদস্' পরে কী কাজ করছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ব্রিগেডের এম. আই. (মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স) বিভাগে আপনার সম্বন্ধে খবর দেওয়া দরকার।

আহত অভিমানের সুরে প্রৌঢ় বললেন, আমি নিরীহ শিল্পী লোক। মাঝে মাঝে এই টিলার বাড়ীতে এসে কয়েকদিন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে যাই। নিজের মনে থাকি, ছবি আঁকি। গুনগুন করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। আমার খবরে বৃটিশ আর্মির কি দরকার বুঝলাম না।

দৃঢ়স্বরে দেবল বলল,—সবাই গ্রাম ছেড়ে ভেগেছে, আপনার চাকররাও।

আপনি একা বসে আছেন কী মতলবে ? কোন ভাঁওতায় আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে জাপানীদের খবরাখবর দিচ্ছেন ?

ভদ্রলোক বিচলিত হলেন না। বললেন,—আপনার চেহারা আর কথার টানে মনে হচ্ছে আপনি বাঙালী।

রাগে লাল হয়ে উঠল দেবল,—আমি বাঙালীই হই আর যে দেশীই হই, আমার কথার সাফ জবাব চাই। না হলে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হব। চান দেখতে আমার ঢালাও গ্রেপ্তার করবার মিলিটারী ওয়ারেন্ট ?

প্রৌঢ়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—মশাই, আপনি বাঙালী। যে কথা আপনি বুঝবেন তা অন্য লোক বুঝবে না। একজন শিল্পীর মনের কথা সিপাইয়ের বুঝবার কথা নয়।

এতদিন ধরে যে জীবন কাটিয়ে এসেছে দেবল তা থেকে অনেক দূর, অনেক মধুর এই পরিবেশ—এই শিল্পীর ঘরটুকু। তার নিজের জীবনেও এসেছিল মধুর পরশ, কিন্তু সে জগৎ থেকে সে নির্বাসিত। পিপাসিত।

তাই দেবল বলল,—আচ্ছা বেশ, বলুন। আমি বুঝবার চেষ্টা করব।

একটু থেমে উনি বললেন,—ইম্ফলে মাধুর্যময় সিংহের নাম অনেক গুণী লোকই জানে। আমি যে এখানে নিরিবিলিতে নিজের বানানো বাড়ীতে প্রায়ই এসে নিজের মনে ছবি আঁকি তাও জানে। কিন্তু এখানে চারিদিকে সৈন্য-আনাগোনা, বিমানহানার মাঝখানেও কেন যে একা বসে আছি তার কারণ কেউ জানে না। আর মিলিটারীরা ত বুঝবেই না। তবু আমার ভাগ্য ভাল আপনি বাঙালী। আপনি বুঝবেন।

নিজের শিল্পী-জীবনের কথা বলে চললেন মাধুর্যময় সিংহ। তারপর··· তারপর···

—আপনার মতই সে রাতে ঘরের একেবারে ভিতরে হাজির হলেন একজন মহিলা। আপনি এসে দাঁড়ালেন উদ্ধত অসহিষ্ণু। তার ভঙ্গিতে ছিল অসহায় মিনতি।

নামটি তার আপনাকে বলে কোন লাভ নেই। তবে তিনিও আপনার দেশের লোক। কোহিমার আই. এন. এ. হানায় তার স্বামী নিখোঁজ। মারা গেছেন না পালিয়ে গেছেন, কেউ জানে না।

দলে দলে বিদেশী লোকেরা কোহিমা থেকে ইম্ফলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অথচ পাকা রাস্তাটা মিলিটারী আর মাল-চলাচলে ভর্তি হয়ে আছে। তাই বেসামরিক লোকেরা গ্রামের মধ্য দিয়ে হেঁটে পালাচ্ছে।

তাদেরই একজন হলেন এই নারী।

হ্যারিকেনের আলোয় ঝড়ের মুখে পালিয়ে আসা বনহরিণীর মুখ দেখলাম। তার কানের কানফুলে তুলছিল শুধু একটি অক্ষর—ম। পদ্ম-ফুলের দেশ মণিপুরে জলস্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে যে তাকে মনে মনে নাম দিলাম মণিপদ্মা।

—তার আসল নাম জানেন না, অথচ এমন একটি তাব নাম দিলেন। তাকে বলেছিলেন সে কথা আশা করি—একটু অবিশ্বাসের সুর দেবলের কথায় ফুটে উঠল।

মাধুর্যময় কিন্তু তাতে বিচলিত হলেন না। বললেন,—নীচে গ্রামে জায়গা নিয়ে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। তাই তিনি অন্ধকারে সাহস করে একা টিলায় উঠে এলেন। ইম্ফলে রেসিডেন্সী পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়ত সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী হিসাবে তাঁকে এরোপ্লেনে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা হবে এই আশা ছিল। শুধু একটা রাতের আশ্রয় চাইলেন তিনি। পরদিন আবার হাঁটা-পথে ভিড়ের সঙ্গে চলে যাবেন।

নিজের সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বললেন না। করলেন না ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ। বললেন না কোন অসুবিধার কথা। তাঁর নিজের মনের মহিমা মৌনভাবে আমার এই কুটীরে ছড়িয়ে পড়ল। সার্থক আমার এই ঘর, এই আশ্রম-বাস। কোন দান্তে বা লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি এতখানি পেয়েছে কিনা জানি না।

আমার এই বৈঠকখানা বলুন, স্টুডিয়ো বলুন, স্টাডি বলুন,—এই ঘরখানা তাঁকে সে রাতের মত ছেড়ে দিলাম। পাশের ঘরে রইলাম জেগে। যেন তাঁকে পাহারা দিতে হবে। কিন্তু ভাবতে লাগলাম শুধু তাঁর কথাই। ভাবতে লাগলাম আমি। মাঝখানে এই ইকড়ার দেওয়াল। কিন্তু ইহকালের ব্যবধান আমার ঘুচে গেল।

দেবল এখনো একটু অবিশ্বাস করতে চাইছিল। চারিদিকে প্রাণ নিয়ে

টানাটানি। নিজেও যে-কোন সময় ধরা পড়তে পারে! তা হলেই এ জীবনের মত সব শেষ। এখন এসব গল্পে কান দেওয়ার সময় কোথায়?

কিন্তু শুধু কি গল্প?

না। শুধু গল্প না-ও হতে পারে। শোনাই যাক না।

খুব সহানুভূতি দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল,—আপনার কি প্রথম দর্শনেই প্রেম হল নাকি?

উদাস কণ্ঠে মাধুর্যময় বললেন,—প্রেমের বয়স আমার নেই। অন্ততঃ সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক রাতের দেখা কোন বিদেশিনীর সঙ্গে। প্রেমে আমি পড়িনি, কিন্তু পড়েছিও ত বটে। ভেবেছিলাম যে, সে সিংহদ্বার বহুদিন পার হয়ে চলে এসেছি। এখন দেখছি যে সে স্বর্গের দুয়ার মানুষের জন্য চিরকালই থাকে খোলা।

—তাকে কি আপনি বলেছিলেন আপনার নূতন-জাগা গোপন প্রেমের কথা? দিয়েছিলেন কোন আভাস? পেয়েছিলেন কোন আশ্বাস?

যেন মহাসাগরের ওপার থেকে প্রৌঢ়ের গলা ভেসে এল,—ইশারাই দিইনি, তার সাড়া পাব কি করে?

—বাঃ, সারা রাত ত তিনি ছিলেন আপনার বাড়ীতে।

—সে কথা আপনি যুবক, আপনি বুঝবেন না। আপনাদের কি? যাকে ভালবাসেন তাকে দিনে দিনে, মাসে মাসে, ঋতুর পর ঋতুতে ধীরে ধীরে কখনো জানিয়ে, কখনো গোপন মনের আগুনে রাঙিয়ে নিয়ে ভালবাসবেন। আর আমি? সারাটা জীবনকে একটি ছোট্ট রাতের মধ্যে ভরে নিতে হল।

একটু ইতস্ততঃ করে দেবল বলল,—ভোরবেলা বিদায়ের সময় একটু আভাস ত দিতে পারতেন।

মাথা নেড়ে তিনি উত্তর দিলেন,—তা কি পারা যায়? আমার আশ্রয়ে যে তার একটা রাতও ভালভাবে কেটেছে সে লাভটুকু শুধু আমারি। তার বদলে কি তার মনকে আমি ভারি করে তুলতে পারি নিজের কথা বলে?

—সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক। আপনি খুব ঠিক বলেছেন। কিন্তু তার

নাম ঠিকানা ত আপনার রাখা উচিত ছিল। হয়তো তাকে আবার কোন সাহায্য করতে পারতেন।

সে সমস্যা ত আমার নয়। তার জন্য তার সমাজ আছে, সংসার আছে। প্রার্থনা করি স্বামীও আছে। আমি নিজে যা পেলাম তার অজানতে, তা আমরাই নিজের।

একটু থেমে বললেন,—তবু সেই আশাতেই এখানে ঘবটা আঁকড়িয়ে বসে আছি। ইম্ফলেও আই. এন. এ. হানা দিয়েছে বলে শুনেছি। তা হলে ত ওকে এই পথেই আবার ফিরতে হতে পারে।

অন্ধকার আকাশের বুক চিরে দূর থেকে একটা চাপা গুম গুম আওয়াজ আসতে লাগল। কোন বোমারু বিমান বোধ হয় আসছে। তার আওয়াজ শুনতে শুনতে দেবলের মন একটু কঠিন হয়ে উঠল। একলাফে ছুটে গিযে লণ্ঠন নিভিয়ে দিল সে। ফিসফিস করে নিষ্ঠুর গলায় সে জিজ্ঞেস করল, — সেইজন্যই বুঝি বসে আছেন এখানে? করুন অপেক্ষা তার জন্য।

কিন্তু মাধুর্যময়ের গলায় কোন পরিবর্তনই এল না। তিনি শুধু বললেন, আপনি নেহাত ছেলেমানুষ। এসব কিছুই বোঝেন না। যাব শুরুতেই সব সারা হয়ে গেল, তাকে কি রাস টেনে ফিরিয়ে আনা যায় নাকি? এই যে পরদিন থেকেই তার রাশি রাশি ছবি এঁকে যাচ্ছি তাতে আমার মনের মধ্যে যে-ছবি আঁকা আছে তার রূপ ফুটেছে নাকি? তার চেহারাটাও যে ঠিক মত ভাল করে দেখে রাখা হয়নি। তবুও সবটুকুই দেখা হয়ে গেছে আমার। শুরুতেই যে সব সারা করে নিতে পেরেছি সেটাই আমার কত বড় ভাগ্য।

গুম গুম গুম। ঝাঁকে ঝাঁকে আমেরিকান লিবরেটার প্লেন মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে যুদ্ধে শুধু একটা ফলই হতে পারে এখন থেকে। যাদের মাথার উপর এরোপ্লেনের ছাতা মেলে ধরা নেই তারা কোহিমা দখল করে থাকলেও দখলে রাখতে পারবে না। তবু, তবু শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। বীরের শাস্ত্রে পিছু-হটা নেই।

দেবলেরও পিছু-হটা নেই। সেই রাতেই সে আর উত্তমা চলেছে যে গ্রামে রাস হচ্ছে সেদিকে। পথে যেতে যেতে মাধুর্যময়ের কাহিনী ওরা যাচাই করে আলোচনা করতে লাগল। মরণে ভরা সংসারে প্রেমের মধ্যে নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়ার কাহিনী।

দেবলের কান কিন্তু আকাশের দিকে পাতা। যেন আবার আরো এক ঝাঁক এরোপ্লেন এসে পড়বে। যতগুলো প্লেন গেছে, তার সংখ্যা আন্দাজ করে নিয়েছে সে। খবরটা যদি এখন পাঠানো যেত ত ভাল হত।

অন্যমনস্কভাবে সে বলল,—ভদ্রলোক স্পাই নয় সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। তবে শুধু শিল্পীই নয়। কবিও। আর একটু অজীর্ণ রোগও বোধ হয় আছে।

কিন্তু উত্তমা রেগে উঠল এই অজীর্ণের কথাতে। বলল, তোমার মনটা একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। কেন, লড়াইয়ে গেলে মানুষ অন্য লোকের মনের দিকে সমবেদনা নিয়ে তাকাতে পারে না নাকি ?

দেবল একটু লজ্জিত হল। তবু তর্ক করল,—শুধু একটি রাতের আধখানা দেখা।

গম্ভীর স্বরে উত্তমা বলল,—তাই, তাই যথেষ্ট হতে পারে। কাউকে কাউকে নিমেষের মধ্যেই যে নিঃশেষ করে ভরে নিতে হয় ভালবাসা, তা তুমি জানবে কি করে ? আশা করি তোমার ভাগ্য খুব ভাল। কিন্তু যাদের সৌভাগ্য ক্ষণকালেই ফুরিয়ে যায় তাদের কথা ভুলো না।

বলতে বলতে উত্তমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। দেবলের নজর এড়াল না।

অন্ধকার ভোর হয়ে আসছিল। একটা পাখী কোথায় ডেকে উঠল—'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা'······

কান খাড়া করে দাঁড়াল দেবল। গত রাতে এই ছিল সঙ্কেত। মনে পড়ল সব কথা। এই ডাকটার একটা মানে আছে! উত্তমা, আশা করি, নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু ভেবে সঙ্কেতটা তৈরি করেনি।

দেবলের মণিবন্ধে হাতঘড়িটা এখনো টিক টিক করে বেজে যাচ্ছে।

পনরো

মণিপুরী রাস। নাচ আর গানের আত্মহারা উৎসব।

কি হবে উপায়,

প্রিয় সজনী !······

না। দেবল অসহায় অবস্থায় পড়ে উত্তমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছিল না।

প্রশ্ন করছিল শ্রীরাধার সখী বৃন্দা-ললিতা এবা তাদের প্রিয় সজনীকে। মুখের ভঙ্গি, আঙুলের ইঙ্গিত, মিঠে সঙ্গীতে এই আকুল প্রশ্নটা প্রত্যেকের মনের উপর যেন ছড়িয়ে পডছিল।

মণিপুরী রাসের গোপন কথাই হচ্ছে এখানে। যাবা নাচে, যারা গায়, শুধু তারা নয়—যারা দেখে, যাবা শোনে, সবাই রাসের ভাবে বিভোর হয়ে যায়। এক পাশে শ্রীকৃষ্ণ অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য পাশে শ্রীরাধা বঙ্কিম ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন।

কোন কিছুই হয়নি। বাইরে শ্রীবাধার খুব শান্ত ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চলে যাবেন, তা যান না কেন ? আমার তাতে কি-বা যায় আসে ? মনে মনে কিন্তু তিনি অস্থির। ব্যাকুলা ! মৃদু মৃদু চরণ নাচনে সেই অধীরতাই ধরা পড়ছে।

মাঝখানে পাঁচ-ছ'জন সখী। তারাই দেখাচ্ছে ব্যাকুলতা। তারাই এই মান-অভিমানের অভিনয়ে বিহ্বল। তারাই গানের মধ্যে, নাচের মধ্যে দুজনের এই মানভঞ্জনের জন্য চেষ্টা করছে। পরস্পরকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করছে,

--কি হবে উপায়,

প্রিয় সজনী ?······

দেবল তন্ময় হয়ে কি দেখছে ? কি শুনছে ? বাঙলাদেশে যে রাসলীলা হয়, তাতে মান-অভিমানের এত হেঁয়ালী, এত পরতে পরতে ঢাকা মনস্তত্ত্বের বালাই থাকে না। সেখানে যে মোটে দু'ঘণ্টায় সবটা নাচ দেখিয়ে শেষ করতে হবে। মণিপুরের মত সারা রাতের কারবার ত নয়।

তাই কি দেবল সবটা মন ঢেলে মজে গিয়েছে নাচে ?

কিন্তু সে ঠিক কোন্ জিনিসটা দেখছে? এই আবেগে উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল মুখের ভঙ্গি? না, হালকা ভাবে মিঠে সুবাস ছড়িয়ে যাওয়া চাঁপাফুলের মত আঙুলের মুদ্রা? না, নূপুরে জড়ানো সুন্দর চরণের চঞ্চলতা?

দেবল সবই দেখছে সহজ সোজা চাহনিতে। কিন্তু চারিদিকে দলে দলে ভিড় করে বসে থাকা সিপাইদের উপরও যদি হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে চোখ গিয়ে পড়ে তা হলে কি-ই বা করা যায়?

চট করে দেবলের হাঁটুতে একটা আঙুলের টোকা পড়ল।

মণিপুরে মেয়েদের মধ্যে পর্দা নেই। তবু ছেলেরা আর মেয়েরা আলাদা দল করে বসেছে। অনেক ভিড় হয়েছে। এত ঠেসে বসতে হলে কোন একটা জায়গায় মেয়ে-পুরুষের আলাদা লাইন মিশে যাবেই। সেখানে বসে ছিল উত্তমা আর দেবল।

কথায় বলে রাসমণ্ডলী। ঠাট্টায় বলে রসমণ্ডলী। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম একটা মণ্ডলী তৈরী করে তোলে। সবাই যেন এক-মন-প্রাণ হয়ে ভাব-রসে ডুবে যায়। এ ত শুধু নাচ নয়, গান নয়—এ যে পূজা।

আর তৈরী হয়েছে সেনামণ্ডলী। নানাশ্রেণীর সৈন্যরা রাসমণ্ডলীর চারদিক থেকে ঘিরে বসে আছে।

অবশ্য কোন খারাপ মতলব ওদের নেই। গ্রামের লোকেরাও নির্ভয়ে বসে আছে। গ্রামের মেয়েরাও। সবাই মিলে এক সঙ্গে থাকলে বিপদ কম।

সিপাইরা বড়জোর হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে সবার সামনেই। তা ছাড়া ওদের ছাউনিও আছে কাছে-পিঠে। কাজেই সবাই মোটামুটি ভদ্রভাবে নিয়ম মেনে চলে। কারো জিনিসপত্রে হাত দিতে পারে না; পারে না ঘর-বাড়ীতে চড়াও হতে। যুদ্ধের বাজারে যুদ্ধ করছে না এমন লোকেদের পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভালো বন্দোবস্ত।

তা ছাড়া এতে খেতে পাওয়ার, দু-পয়সা উপায় করবার পথটাও খোলা থাকে। বাইরে থেকেও আসে অনেক ফালতু ভিন্‌দেশী লোক। মিস্ত্রী, কন্‌ট্রাক্টর, রসদ যোগানদার ইত্যাদি।

এ-হেন জায়গায় দিনের পর দিন, মানে রাতের পর রাত রাসনাচের মহড়া দিচ্ছে মণিপুরীরা। সিপাইরা টাকা খরচ করে দেখতে আসে। খুশীও

থাকে গ্রামের লোকদের উপর। কাজেই রাস দেখতে আসা বেশ নিরাপদ। বিশেষ করে যখন সঙ্গে কোন মহিলা আছে।

মেয়েদের সম্মান মণিপুরে খুব বেশী।

প্রথমে যখন ভঙ্গি-নৃত্য দিয়ে নাচ শুরু হল —সবাই গান ধরল—"নাচত নাগর নাগরী সঙ্গে", তখনই আসর বেশ জমে উঠল। দেবল আর উত্তমা এসে চুপ করে বসে পড়ল। কেউ নজর করল না।

উত্তমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। দেবল মনে মনে ভাবছিল যে কেমন চমৎকার ভাবে সব রকম সন্দেহ এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রাতটা কাটাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল এখন।

প্রথমে সে এই রাসের উৎসবে আসতে চায়নি। কিন্তু উত্তমা তাকে বুঝিয়েছিল যে এমন একটা উৎসবে না এসে ঘরে বসে থাকলেই লোক সন্দেহ করবে। এসব জায়গায় কোন সন্দেহ না জাগিয়ে থাকা সহজ।

কিন্তু একবার সন্দেহ সৃষ্টি হলে ভয়ানক বিপদ হবে। পালাবার কোন পথ থাকবে না। একটু দূরেই রাস্তায় জঙ্গলে অঘাটায় মিলিটারী ঘাঁটি বসানো আছে। বাইরে যেতে বা ভিতরে আসতে অনেক হাঙ্গামা। অনেক জেরা তদন্ত চলে। বৃটিশের সিংহের দল ঘাঁটি আগলাচ্ছে।

কিন্তু একথা বলেই উত্তমা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল—খবরদার যেন ওরকম ভারী আর ভয়ানক কথাগুলো মনেও ঠাঁই দিয়ো না। তা হলেই কখনো বেফাঁস কিছু করে বসবে। না হয় লোকে মনে করবে তোমার পরিচয়ে কোন গলদ আছে।

—তা, চাঁদেও ত একটু গলদ থাকে।—খুব একটা নিশ্চিন্ত ভাব দেখাবার জন্য উত্তর দিল দেবল।

—থাকুক. কিন্তু চাঁদকে নিয়ে কারবার করে শুধু কবি।

বাধা দিয়ে দেবল হেসে বলল,—আর কে বল ত?

উত্তমা বলল,—তুমিই বল না। তোমরা ত হচ্ছ কবি আর প্রেমিকের জাত। পাগলেরও বটে। তায় বিশেষ করে প্রেমিক।

মাথা নাড়ল দেবল ;—উঁহু মানলাম না। তুমি যখন কলকাতায় ছিলে

কবি এন্তার দেখেছ মানলাম। কবিরা পাগল. তাও না হয় ধরে নিলাম। কিন্তু প্রেমিক ? কোথায় পেয়েছ বল ত ?

—কেন, হিংসা হচ্ছে নাকি ? শুনেই ?

—না, দেবী। আমার হিংসা শুধু যাদের উপর তারা প্রেমে পড়ে মরিয়া নয়। তারা লড়নেওয়ালা, দুশমনের সিপাই।

চুপ, চুপ। গাছপালারও কান আছে।

—তারা নিশ্চয়ই প্রেমের আলাপ শুনবার জন্য আড়ি পাতে না। বোধ হয় তাদের মনোযোগ এড়াবার জন্যেই এই ক'দিন ধরে তোমার আলোচনাগুলো রোজই একটু কাব্য-ঘেঁষা হয়ে থাকছে।

উত্তমা সায় দিল,—তা ছাড়া আর কি কথাই বা হতে পারে ? 'ওয়েদার ডিস্কাস' কি চব্বিশ ঘণ্টা করা চলে ?

দেবল হেসে বলল,—তাই বুঝি তুমি এমন একটা বিষয় বেছে নিয়েছ যাতে কোন বিপদ নেই। হয়ত সেটা কলকাতায় থাকার সময় খুব ভাল করে মক্স করতে পেরেছিলে ! ভাগ্যবতী তুমি। কলেজী জীবনটা তোমার কলকাতায় ভাল কেটেছিল দেখতে পাচ্ছি।

—তোমায় নিরাশ করতে হল, দেবল। মোটেই তা নয়। কো-এডুকেশন কলেজে পড়েও কোন লাভ হল না। তোমাদের বাঙালী ছেলেরা কবিতা পড়তে পারে, কিন্তু কবিতা করতে পারে না।

—কথাটা বড় হেঁয়ালী হয়ে উঠল।

—না। বড়ই পরিষ্কার। মাথা নেড়ে উত্তমা প্রতিবাদ করল—কলকাতায় এত লক্ষ বাঙালী। কিন্তু ক'জনকে চোখে পড়ে যাদের সঙ্গে প্রেমে পড়তে ইচ্ছা হবে ? অন্ততঃ ডেকে নিয়ে কাব্য আলোচনা করতে ?

এত ভাবনার মধ্যেও হেসে উঠল দেবল। বলল,—তোমার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয় উত্তমা। কলেজে ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়েও তেমন একজন তরুণ আবিষ্কার করতে পারলে না ? তবে আমার দুঃখ অবশ্য তাদেরই জন্য। তোমার জন্য নয়।

—কেন ? কেন ?

—বাঃ তোমার মত এমন তরুণীরত্নের কাছে এল অথচ তাকে আবিষ্কার করতে পারল না।

তার মানে, দেবল উত্তমার মধ্যে এমন কোন নারীর সন্ধান পেয়েছে যে সাধারণ নয়। যার সঙ্গ পাওয়া, মনোযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা বলে মনে করা চলে।

উত্তমার মনে যেন জোয়ার এল। সে-ও তা হলে সাধনার ধন, আবিষ্কারের যোগ্য রত্ন। কিন্তু কার কাছে সে আবিষ্কৃত হতে চায়?

কিন্তু সে কথা শুধু মনে-মনেই থাকুক।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবল আবার বলল, —কি, তুমি আমার কথায় সায় দিতে পারছ না?

নীরবতা ভেঙ্গে উত্তমা বলল—দেখ, তোমাদের মনে যতটা মধু, বুকেও ততটা পাটা থাকা উচিত ছিল।

সিপাইদের গোঁফের বহর দেখতে দেখতে দেবল ভাবছিল। আজ সকালেই উত্তমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নিয়েছিল যে এই গ্রাম থেকে আবার সামরিক খবর যোগাড় করার কাজ শুরু করতে হবে। এখানে এদের বেশ বড় ঘাঁটি! ঠিক লড়াইয়ের এলাকায় নয় বলে সিপাইরা একটু যেন নিশ্চিন্ত। অথচ প্রায় রোজই সৈন্যদলের যাতায়াত চলেছে। গোয়েন্দাগিরি করে খবর বের করার খুব সুবিধা।

ওদিকে কোহিমার পরে ইম্ফলে আজাদ-হিন্দ দল আরো কতদূর এগোল কে জানে?

চারদিক ঘিরে পুরো ধড়াচূড়ায় সাজা সেনাবাহিনী। তারা সবাই তন্ময় হয়ে রাস-নাচ দেখছে। যে জীবনটা তারা লড়াইয়ে উৎসর্গ করেছে তা যেন সার্থক হচ্ছে এই নাচ দেখে।

কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এর মধ্যে ফিসফাস করে কথাবার্তাও চালাচ্ছে। ঠিকাদারদের মধ্যে জিনিসপত্রের দামের, আমদানীর কথাও চলেছে এই সঙ্গে। শুধু দেবলই চুপ।

তার হাঁটুতে একটা আঙুলের টোকা পড়ল।

চমকে উঠে দেবল উত্তমার দিকে তাকাল। যেন এতক্ষণ সে চুপ করে বসেছিল তা শুধু নৃত্যরস ভাল করে উপভোগ করবার জন্য।

উত্তমাই ফিসফিস করে বলল,—লোকে অবাক হয়ে দেখছে যে একটা বাঙাল হাইকোর্ট দেখছে।

দেবল জবাব দিল,—কিন্তু তার বদলে ওরাই যদি বাঙালকে দেখতে শুরু করে দেয়? তখন হাইকোর্টই কি আর ছেড়ে কথা কইবে?

মাথা নাড়ল উত্তমা,—না, সে ভয় নেই। অনেককেই জানিয়ে দিয়েছি যে তোমার সঙ্গে কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় চেনা ছিল। তুমি কনট্রাক্টের আশায় এখানে ঘোরাফেরা করছ, তাই দেখা হয়ে গেছে। সবাই নিজের হরেক চিন্তায় পাগল। তাই বেশী কেউ তলিয়ে দেখবে না। আর দেখ. দু'চারটে পদাবলী ঝেড়ে যাও কথাবার্তায়।

—নিশ্চয়ই; আহা যদি এখন ওরা গাইত—

"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।"

আশ্বাস দিয়ে উত্তমা বলল,—হয়ত গাইবে। দেখো, রাসের রসে ডুবে থেকো, কিন্তু ভেসে যেও না।

—ডুবেই থাকব—জবাব দিল দেবল।

কিন্তু ভেসে উঠেছে এক শিখ সুবেদার-মেজরের ভুঁড়ি। মণ্ডপের ঠিক ওধারেই।

বলতে গেলে দেবলের সামনা-সামনি বসে আছে সে। তার মুখের উপর শোভা পাচ্ছে এক ইয়া-বড় জাঁকাল চাপদাড়ি গোঁফ। মহাসুখে তাতে তা দিতে দিতে সে নাচের তারিফ করছে। অন্য হাতে হাঁটুতে তাল দিচ্ছে। তাল আবার কখনো কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হাঁটু ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ে গিয়ে পড়ছে।

তার চোরা চাহনিও মাঝে মাঝে নাচের সখীদের সুন্দর মুখগুলি ছেড়ে অন্য কোন কোন জায়গায় গিয়ে পড়ছে।

গোটাদশেক ডে-লাইট বাতির আলোয় সমস্তটা মণ্ডপ একেবারে ঝলমল করছে। মণ্ডপের কাঠের থামগুলির উপর সুন্দর চিকন করে নক্সা-কাটা সাদা কাগজের ফুলের কারুকার্য। আলোয় আলো সবটা জায়গা। তাতে

সাদার শোভা এসে মিশেছে। নাচের আসরটা লতাপাতা-কাটা কাঠের রেলিং দিয়ে গোল করে ঘেরা। তার বাইরে চারদিক ঘিরে বসে আছে সব লোক।

একেবারে ভক্তিতে ভরাডুবি।

মণ্ডপের মাঝখানে সাথীরা নাচছে। কাঠের বেড়ার ওপারে দুই প্রবীণা বসে গাইছে। পাশে 'রাসধারী' নেচে নেচে বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ।

—আচ্ছা মৃদঙ্গ কেন?—ফিসফিস কবে উত্তমাকে জিজ্ঞেস করল দেবল।

—বাবে, জান না, মৃদঙ্গ ছাড়া হয় না রাস। ঠিক যেমন চন্দন ছাড়া হয় না কনের সাজ।

—কিন্তু তোমাদের দেশে দেখছি যে ছেলেবাও ফোঁটা চন্দন কাটতে কসুর করে না।

—আঃ হাঃ। আমাদেব এখানে যে ছেলেরা মেয়েদের ডাকে সাড়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের মত নিষ্ঠুর হয়ে বা অবুঝ সেজে বসে থাকে না।

—বড়ই আশার কথা, সন্দেহ নাই—বলল দেবল!

বলতে বলতে ওই সুবেদাব মেজরের দিকে আবার একটা চেরা চাহনি পাঠাল।

উত্তমা তাড়াতাড়ি দেবলের আবেকটু কাছে সবে এল। বলল,—আশা অবশ্য বিশেষ থাকে না। ওই নাচের আসরটুকুই সার। তারপর যে যার পথ দেখে সরে পড়ে।

—তাই ত ভাল। তুমি কি চাও যে কেউ পথেই বালুচরে আটকিয়ে থাকুক।

—আহা বালুচর হবে কেন?— পাকা সড়কের উপর দিয়ে চলছে যে—

তার মানে সড়ক ছেড়ে সাজানো-গোছানো ফটক দেখলে তার মধ্যে আশ্রয় নেওযাই ভাল। কিন্তু ভবঘুরে যাবে কোথায়?

—কেন ঘুরে যাবে, ফটকের মধ্যে।

—ফটকটা ত ফাটকের গেট হতে পারে।

উত্তমার কানে খট করে বাজল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘণ্টার

পর ঘণ্টা লম্বা নাচের আসরে মাঝে মাঝে দেবলের সঙ্গে এক-আধটা কথাবার্তা কয়ে একভাবে ভাবটাকে সে কমিয়ে রাখছিল। একঘেয়ে ত নিশ্চয়ই। কারণ সে না পারছে রাসের রসে মজে সিপাইদের ভুলতে, না পারছে দেবলের মন থেকে সিপাইদের সরিয়ে রাখতে।

দেবল আবার লক্ষ্য করল যে সুবেদার-মেজরের তাল দেওয়াটা মাঝে মাঝে বেতালায় চলছে। তার মানে কি? নেহাত নাচের মৌতাতে মশগুল? না, অন্য কোন মতলব আছে? না কোন সঙ্কেত?

চোরের মন বোচকার দিকে।

দেবলের মনও সেই রকম এক দিকেই ঝুঁকছে। সুবেদার-মেজর ছাড়া অন্য কোন সিপাই বা অফিসারই তার দিকে লক্ষ্য করছে বলে মনে হয় না। নিজের মুখেও ত বেশ একটা লেপা-পোঁছা ভাব। তাই সে-ও সাহস করে সুবেদার মেজবের দিকে একবাব ভাল করে পুরো নজরে তাকাল।

একটু হেসে উত্তমাকে বলল,—দেখছ, আমাদের সুবেদার-মেজর সাহেবের নাচটা বড়ই ভাল লেগেছে। কেমন তারিফ করতে করতে তাল দিচ্ছে। আচ্ছা, হঠাৎ অতগুলি লোক উঠে গিয়ে কান্নাকাটি করে গড়িয়ে পড়ল কেন?

উত্তমা পবামর্শ দিল,—যাও, তুমিও চোখ মুছতে মুছতে ওই স্ূত্রধারীদের (বুড়ী গায়িকাদের) কাছে গিয়ে পেন্নাম ঠুকে এস।

দেবল এ-হেন উপদেশের মানে খুঁজে পেল না। কে জানে তখনি হয়ত সবার নজর ওর দিকে এসে পড়বে।

তাই অন্য কথা তুলল,—এমন ফার্স্ট-ক্লাস নাচের সঙ্গে এত থার্ড ক্লাস গান গাইছে। ব্যাপার কি? বুড়োরা ত মনে হচ্ছে নেহাত ন্যাকামি করেই কাঁদছে।

একটু রুক্ষভাবে উত্তমা বলল,—যা বলছি কর গিয়ে। তোমার মনে এত ভক্তি আর বাইরে সেটা দেখাতেই লজ্জা। আর ফিরে এসে একটু দূরে সরে বসো।

তার শেষের কথাগুলি শেষ হবার আগেই দেবল মাথা নীচু করে গোল বেড়ার পাশ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে গেল। অত্যন্ত ভক্তিভরা

একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণামে নিজেকে 'রাসধারী' বুড়ীদের সামনে একেবারে লুটিয়ে দিল।

ফিরবার পথে আবার সে ভাল করে চোখ মুছতে শুরু করে দিল। শুধু কি চোখ? ভাবের ঘোরে সমস্তটা মুখই মোছার চোটে অস্থির।

ফিরে এসে উত্তমার কাছাকাছি আবার বসা কি ঠিক হবে? যখন প্রথম এসে বসেছিল তখন অতটা কেউ নজর করেনি। ভঙ্গিনৃত্যে তখন সবাই ছিল মশগুল। এখন নেশা একটু ফিকে হয়ে এসেছে।

অনেক মেয়েই উত্তমার মত আধুনিকা নয়। শাড়ীর বদলে 'ফানুক' পরে ছেলেদের কাছ থেকে একটু আলাদা হয়েই বসেছে। ওই বুক থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা রঙীন ডুরেকাটা কাপড়ে মানাচ্ছে খুব সুন্দর, কিন্তু দেখেই মনে হয় যে ওই অজন্তা ষ্টাইলের সুন্দরীরা হালফ্যাশানের কাছে ঘেঁষে বসাকে পছন্দ করবে না।

এসে বসবামাত্র একজন মণিপুরী ভদ্রলোক দেবলের সঙ্গে কথা জুড়ে দিলেন।

বললেন,—এই ভদ্রমহিলাটি আপনার পরিচয় দিচ্ছিলেন। আপনি বাংলাদেশ থেকে কিছুদিন হল এসেছেন, আর 'বাস' ফেল করে এখানে থেকে যেতে হল। বড় আফসোসের কথা! তবে ভাববেন না আমাদের এই গ্রামে আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। আমি বাংলা জানি; যখন দরকার হবে আপনার সাহায্য করব।

দেবল তাড়াতাড়ি বলল, না না, কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। এদিকে সব জায়গাই ত বেশ ঠাণ্ডা আছে। লড়াইয়ের হাঙ্গামা নেই।

ভদ্রলোক বললেন,—না, তা নেই বটে। কিন্তু বনে-জঙ্গলে খুব জোর খানাতল্লাশি হচ্ছে। একটা জাপানী, না তাদের দলের হিন্দুস্থানী কে একটা দুশমন সিপাই এই তল্লাটে ঢুকে পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তা এর মধ্যে হয়ত ধরাও পড়ে গেছে। জাপানী দুশমন কি আর মণিপুরে লুকিয়ে থাকতে পারবে? চেহারাতেই মালুম দেবে। আসামী বা বাঙালী হলে চেনা যেত না।

ঠিক বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা। কিন্তু আশ্চর্য, মোটে একটা লোক—গাঁয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কি করে?

—না, জন-মনিষ্যির মধ্যে থাকতে পারবে না। ও নিশ্চয়ই জঙ্গলে-টঙ্গলে শেয়ালের মত তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। তা তাতে আপনার আমার আর ভাবনা কি, মশাই। আমি মণিপুরী, আপনিও গোবেচারী বাঙালী। কলম-পেশা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারেন। শুনলাম, লোকটার ইউনিফর্মটা মাপ-জোক করে ওরা নাকি আন্দাজ করেছে যে বাঙ্গালীর চেয়ে সে বেশী লম্বাই হবে।

দেবলের মন কিন্তু গানের দিকে।

সে বলল—যাক গে মশাই, ও সব হাঙ্গামার কথা ভেবে আজকের রাতের নাচটা নষ্ট করে লাভ নেই। 'প্রিয় সজনী' কী মিষ্টি কথাটি মশাই! একেবারে মর্মে দোলা দিয়ে গেল। আর কী সুন্দর নাচ! আপনাদের দেশের গৌরব।

বলেই দেবল একটু সামলিয়ে নেবার চেষ্টা করল। আপনাদের দেশ—তার পরেই নিজের দেশ, তারপর ঠিক কবে সেখান থেকে এসেছি এসব নানা কথা উঠে পড়তে পারে।

তাই তাড়াতাড়ি যোগ করে দিল,—উদয়শঙ্কর ত এই নাচ দেখেই অনেক নাচ তৈরী করেছেন।

ভদ্রলোক যেন ভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন। বন্ধ-করা চোখ একটু খুলে বললেন,—আপনি উদয়শঙ্করকে দেখেছেন বুঝি। হ্যাঁ, তা ত দেখবেনই। কলকাতার বাঙালী আপনি। উদয়শঙ্কর, রবিঠাকুর, শরৎচন্দ্র এঁদের ত নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। মায় একেবারে বড় বড় বাঙালী—চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস এই রকম আর কি—এঁদেরও দেখে থাকবেন।

কিন্তু দেবল যেন এসব কথা শুনতে পায়নি।

সে বলে চলল,—উদয়শঙ্করের নাচ—সে একেবারে ওয়াণ্ডারফুল। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে যে তিনি আপনাদের নাচকে একটু কেটে-ছেঁটে বদলিয়ে নিয়েছেন। তবে এই দেখুন, আপনাদের চন্দ্রাবলী যে রকম লীলাভরে হাতের আঙুলগুলি ঘুরিয়ে গেল এইমাত্র—এটা কি আর উদয়শঙ্করের দলের

কোন মেয়ে পারবে? আর এই যে এত লোকের ভক্তি, এটাই ত নাচে আরো বেশী প্রাণ এনে দিচ্ছে। স্টেজের উপর কি আর এমনটি হতে পারে?

ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন।

আবার জিজ্ঞেস করলেন,—তা মশায়, আপনি বোধ হয় বিদেশেও গিয়েছেন, অবশ্য হিন্দুস্থানের বাইরের কথা বলছি। বল-ডান্সের কথা ছেড়ে দিন। ওদের ফোক-ডান্সেই বা কী আর এমন জিনিস আছে? কিন্তু ধরুন, বালিনিজ ডান্স, বর্মী মেয়েদের ডান্স, মালয়, শ্যাম--কত কী চমৎকার চমৎকার নাচ আছে ওদের। শুনেছি ওগুলি নাকি মণিপুরীর চেয়ে বেশী তফাত নয়। আবার রাধাকৃষ্ণ নিয়েই নাচ হয়। দেখছেন সে সব?

না, দেবল কিছুই দেখেনি সে-সব। কেবল এই নাচের আসরের ওপারে ঠায় বসা সুবেদার-মেজরের ভুঁড়ি আর হাঁটুতে টক্কাটরে টরেটক্কার মত তালের নাচ ছাড়া কিছুই সে দেখছে না।

তবু সে খুব সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল,—আমি, মশাই, সাধারণ ঘরের লোক। ও সব বার্মিজ, বালিনিজ নাচ কোথায় দেখব? এক উদয়শঙ্করের নাচ দেখতেই কলকাতায় তিন দিন কিউ করে দাঁড়াতে হয়েছিল।

ভদ্রলোক খুবই ভদ্র আর দরদী। বললেন,—তা ত হবেই, তা ত হবেই। সেজন্যেই মনে হয় আপনার এমন চমৎকার গায়ের রঙটা রোদে জ্বলে পুড়ে গেছে। তা না হলে কলকাতার গঙ্গা-মাটির দৌলতে অরিজিন্যাল গায়ের রঙটা বেশী পুড়তে পায় না। এসব পাহাড়ী জংলী দেশের রোদের কথাই আলাদা। তবে দেখুন, বাঙালীর মত ফুলহাতা শার্ট পাঞ্জাবি পরলে অন্তত: হাতের অনেকখানি বেঁচে যায়।

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন,—তার উপর দেখুন না, দুঃখের কথা কাকে বলে? আপনি টুপি পরতেন নিশ্চয়ই। তা কেন পরবেন না? চাকরির জন্য লোকে পরে থাকে। কিন্তু আপনার টুপি-পরার দাগ কপালে ছাপের মত লেগে আছে। আর এখন পরে বেড়াচ্ছেন মণিপুরী পোশাক। মাথায় নিশ্চয়ই রোদে বড় কষ্ট হয় আপনার। তা ছাড়া কাপড়ের কনট্রোলের

দিনে তাঁতের মণিপুরী কাপড় ছাড়া হঠাৎ এই বিদেশে মিলের কাপড় পাবেনই বা কোথায় ? রাধে, রাধে, তোমার ইচ্ছাই সব।

শ্রীরাধার কথা ওঠাতে দেবলের একটু সুবিধে হয়ে গেল।

সে বলল,—দেখুন, দেখুন, আবার কত নতুন নতুন সঙ্গী এসে গেছে। কেমন চমৎকার নাচের 'পল্লেই'-এর (মণিপুরী পোশাকের) ঘাগরাখানা বাঁচিয়ে বেতের মোড়ার উপর বসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের নাচের পালা না আসবে ততক্ষণ 'কুমির'খানা (গোল ফোলানো ফ্রেমে আঁটা ঘাগরা) ত মুড়ে নষ্ট হয়ে যেতে দেয়া চলে না। আর দেখুন 'পশোয়ান'গুলিও কী সুন্দর! এমন সুন্দর সাদা জরির কাজ-করা 'খাওয়ান' (চাদর) 'পল্লেই-এর' সঙ্গে কী চমৎকারই না ম্যাচ করে।

ভদ্রলোক সমঝদার ব্যক্তি। হেসে বললেন,—আপনার মণিপুরে আসা সার্থক হয়েছে মশায়। এই এত অল্পদিনেই এমন সব পোশাকের টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি নামগুলি পর্যন্ত শিখে নিয়েছেন। ব্যাপার কি বলুন ত ?

তারপর গলার স্বর আরেকটু নীচু করে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞেস করলেন,—কি ? কোন তরুণী নাকি ? না, নতুন দেশের পথ-ঘাট আচার-ব্যবহার এসব সম্বন্ধে বই লিখবেন ফিরে গিয়ে ? অ্যান্থ্রপলজি, না জিয়োগ্রাফী ?

দেবল যেন প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি। পাল্টা বলে বসল,—দেখুন দেখুন, মশায়। এইসব হোমরা-চোমরার দলও কেমন জুত করে বসে নাচ দেখছে। ওদেরও ইউনিফর্মগুলো ত ওই নৃত্যসখীদের পোশাকের মতই যত্নে রাখতে হবে। 'ক্রাশ্‌ড' হয়ে গেলে ত চলবে না।

—আর মশায়, ইউনিফর্ম ! শুনলেন ত, কোন্ অভাগা জাপানী, না আই. এন. এ. তার টুটো-ফুটো ইউনিফর্মটা জঙ্গলে ফেলেই পালিয়েছে। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—একেবারে গীতার বচন, মশাই।

দেবল অত সহজে ফাঁদে পা দেবে না। হেসে বলে উঠল,—না মশাই, আপনি একেবারে বেরসিক। গীতগোবিন্দ ছেড়ে গীতা ? আর এই মণিপুরে ? আপনার বুঝি—শূন্য মন্দির মোর ?

রাধে, রাধে। আপনার বুঝি শ্রীমন্দিরের দিকে নজর আছে ? মানে,

শ্রীঘর নয়। ওই যাকে বলে—অসারে খলু সংসারে সারং···। কি মশায়, শ্বশুর-মন্দির না শ্রীঘর ? কোন্‌টা ?

পাশে তাকিয়ে দেখল যে উত্তমা যেন এতক্ষণে একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এসে বসেছে। নাচের দিকে তার বিশেষ মন নেই। তার পাতলা ঠোঁট দুটি গুনগুন করে কি যেন গাইছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে মাঝে মাঝে বোধ হয় বাংলা বের হচ্ছে।

নিশ্চয়ই কোন বিশেষ মানে আছে।

দেবল জিজ্ঞাসা করল,— কি, বাংলা কথা মক্‌শ করছ নাকি ?

হেসে উত্তর দিল উত্তমা, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কলকাতায় আছি, বাঙালী বন্ধুর পাশে। তোমার পাশে গত বছর-দুই যেরকম ভাবে কলকাতায় থেকেছি। তোমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়িয়েছি আর গান শুনিয়েছি। মনে পড়ে, সেই যখন জাপানী বোমা পড়ল খিদিরপুর ডকে দিনের বেলা ? সবাই পালাতে লাগল, আর আমি এ. আর. পি. ট্রেঞ্চে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে কি করি ? তাই তোমাকে গান শোনালাম। তুমি এমন ভাবে শুনছিলে যে সাইরেনটা কখন 'অল ক্লিয়ার' জানিয়ে গেল তা-ও টের পেলে না।

দেবলও যেন পথ দেখতে পেল। সব কথাতে সায় দিয়ে গেল।

আরো বলল,—শুধু তাই নয়। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে কলকাতা আমার এত ভাল লেগেছে যে আমি আর কোনদিন কলকাতা ছেড়ে দূরে থাকতে কিছুতেই পারব না। সেজন্যই ত দিল্লীতে একটা চাকরি পেলাম, তবু নিলাম না।

সেই ভদ্রলোক চুপ করে গেল। দুজন তরুণ-তরুণী ঘনিষ্ঠভাবে কথা কইছে। তার মধ্যে মাথা গলানোর চেয়ে বেশী জরুরী কাজ তার আছে।

এদিকে নাচ খুব জমে উঠেছে। যত বেশী এগোয় রাত, ততই বেশী জমে ওঠে নাচ। ততই আসে ভিড়, আর আসে চোখের জল। ভক্তিতে দিশেহারা হয়ে বয়স্করা কেঁদেই ফেলে। উত্তমাও গুনগুন করে কত কিছু যে গেয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। সবটা যে গান শুধু তাই নয়। কত গান, কত কথা।

ওদিকে বৃন্দা-চন্দ্রাবলীরা গেয়ে চলেছে—

সাজল সাজল ধনি
মনোহর বেশে।

উত্তমার উপর একটা করুণ মমতায় দেবলের মন ভরে গেল। এই প্রথম মনে হল যে দেবল যদি ধরা পড়ে তা হলে উত্তমাও রেহাই পাবে না। অবশ্য তা যদি হয়, দেশের কিছু যায় আসে না। সারা বাংলাদেশ জুড়ে সারা ভারতে এমন কত উত্তমাই নিজেকে বলি দিয়েছে।

কিন্তু তারা তা করেছে দেশকে ভালবাসে বলে। সব জেনে শুনে, ভেবে-চিন্তে, দীক্ষা নিয়ে। উত্তমা কেন এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল? ওই ত নিজের মনের খুশীতে গান গেয়ে চলেছে—যেমন করে গাছের ডালে বসে পাপিয়া গায়—'পিউ কাঁহা'।

না, না। শিউরে ওঠে দেবল। উত্তমার বিপদ হতে পারে এ ভেবে দেবল শিউরে ওঠেনি। দেবল কেঁপেছে শুধু মৃদঙ্গের তাল আরো বেশী দ্রুত হয়ে উঠেছে বলে। রাঙানো চরণগুলির নূপুর তালে তালে আরো মদির হয়েছে বলে। আরো অনেক সখী নাচের আসরে এসে ঢুকেছে বলে।

শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন হল এতক্ষণে। তাই এবার তিনি মোহনচূড়া মোহনতর করে হেলিয়ে দিয়েছেন। মুখে বাঁশী নিয়ে রাধার কাছে এসে প্রেম-বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু শ্রীরাধা?

এবার তাঁর পালা। পাছে তিনি আবার মান করে বসেন যেন সেজন্যই আগে থেকে বৈষ্ণব পদাবলী ছেড়ে জয়দেবের গানে চলে এল সখীরা। গান শুরু হল—

প্রিয়ে চারুশীলে,
মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

দমকা বাংলা থেকে সংস্কৃতে চলে যাওয়াটার তারিফ করে উত্তমাকে কিছু বলা দরকার।

উত্তমা ততক্ষণে ভাবের আবেশে দুলে দুলে একটু এগিয়ে গেছে। দেবলও এগোতে যাবে এমন সময় তার পিঠে কে একজন খুব শক্ত করে একটি হাত রাখল।

তার মানে খুব পরিষ্কার।

দেবল না এগিয়ে একটু একটু করে পেছিয়ে এল। পেছিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়ালো। খুব নীচু স্বরে হিন্দুস্থানীতে বলল, হাতকড়া এখানেই লাগাবার দরকার নেই। বেরিয়ে আসছি এমনিতেই। চল।

মোট কথা—উত্তমা যেন টের না পায়।

আসর ততক্ষণে আরো জমে গেছে। সবাই মেতে গেছে তাতে। কে আর খেয়াল রাখে পেছন থেকে কোথায় কারা উঠে চলে যাচ্ছে।

বর্ষীয়সী ভক্তিমতী রাসধারীরা গানের আখর দিতে দিতে ভাবাবেগে গলা প্রায় বুজে ফেলল। 'মুঞ্চ ম-য়ি-ই-ই করতে করতে এমন অবস্থা হল যে শুধু 'ইক ইক' এরকম ধ্বনি হতে লাগল। গান মিলিয়ে গেল কণ্ঠে। সুর মিলিয়ে গেল রেশে। আর রেশ আওয়াজে।

আর দেবল?—চারজন সঙ্গীনধারীর আড়ালে।

ষোল

কোর্ট-মার্শাল বসেছে।

সামারি জেনারেল ফিল্ড কোর্ট-মার্শালে দেবলের বিচার হবে।

জেনারেল কোর্ট-মার্শালে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া চলে। দেবলের অপরাধ এত সাংঘাতিক যে তা প্রমাণ হলে সবচেয়ে বড় শাস্তি দেবার দরকার হতে পারে। কাজেই কোন ছোট দরের কোর্ট-মার্শালে কাজ চলবে না।

সামারি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ব্যাপাব করতে হবে। চারদিকে এখনো লড়াই চলছে। জাপানী বা আই. এন. এ. দল এখনো পাল্টা হামলা দিতে পারে। অথচ এমন গুরুতর অপরাধের বিচার আর শাস্তি চটপট হয়ে গেলে অন্য লোকের পক্ষেও শিক্ষা হয়ে যায়। এই সব নাগা মণিপুরী কাছারীরা ভাবতে শুরু করেছে যে ইংরেজের রাজত্ব বুঝি এবার গেল।

তা ছাড়া ব্রিটিশ পক্ষে থাকা সত্ত্বেও যে-সব হিন্দুস্থানী সৈন্য আর অফিসারদের মন আই. এন. এ.-র দিকে ঝুঁকেছে তারা এই কোর্ট-মার্শালের বহর দেখলে একটু হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।

কাজেই খুব ঘটা করে ফিল্ড কোর্ট-মার্শাল বসানো হয়েছে। আর অসম্ভব তাড়াহুড়ো করে। এমন সাংঘাতিক সব চার্জ যে, মামলা আপনা থেকেই প্রমাণ হয়ে যেতে বাধ্য।

চারজন মিলিটারী অফিসার নিয়ে কোর্ট তৈরী হল। একেবারে যাকে বলে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ। তার সভাপতি একজন ফুল কর্নেল। অর্থাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল হলেও চলবে না। বাংলা জানে এমন বেছে বেছে বিচারকর্তা বসেছে। তাতে দোভাষীর দরকার হবে না। চটপট মামলা খতম হয়ে যাবে।

ফরিয়াদী অর্থাৎ নালিশ করছে ইংরেজ সরকারের জঙ্গী বিভাগ। তাদের কৌঁসুলী হলেন একজন বাঙালী লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল।

কর্নেল রায় এককালে কলকাতা থেকে আইন পাশ করেছিলেন কিন্তু মিলিটারী চটকে তাঁর মনে নেশা লেগেছিল। তাই তিনি যুদ্ধের প্রথমেই

কমিশন নেন। কিন্তু আইনবিদ্যার দৌলতে তাঁকে প্রথমে মালয়-সিঙ্গাপুরে যেতে হয়নি। এখন অবশ্য ফরোয়ার্ড এরিয়া অর্থাৎ লড়াইয়ের আগুয়ান এলাকাতে আসতে হয়েছে।

কিন্তু মিলিটারী মেসে ক্যাম্পে তাঁর মত দিলখোলা মজলিসী লোক বিরল। যেমন পালিশ করা আদবকায়দা, তেমনি ঝকমকে তাঁর তর্কের বাহাদুরী, আলাপের ক্ষমতা। লেঃ কর্ণেল হলেও কর্ণেল বলেই সবাই তাঁকে ডাকে।

নিয়মমাফিক জজ এডভোকেট সবাইকে হলফ করিয়ে নিলেন। তাঁর পর আসামী দেবলকে তার বিরুদ্ধে নালিশগুলি শুনিয়ে দেওয়া হল। নালিশগুলি খুব গুরুতর। ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লেফ্‌টেনাণ্ট দেবল সিংহ সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, রেঙ্গুনে, নাগা পাহাড়ে, মণিপুরে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ১২১ ধারা অনুসারে আর ইণ্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্টের ৪১ ধারা অনুসারে ভারতবর্ষের কিং-এম্পারারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়। সে মণিপুরে একটা সন্ধানী ঘাঁটিতে একজন সিপাইকে প্রহার করেছে আর তার কাছাকাছি একটা গ্রামে আর একজন সিপাইকে খুন করেছে।

রাজদ্রোহ সৈনিকের জীবনে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

কিন্তু দেবল প্রত্যেক অপরাধই অস্বীকার করল। মাথা উঁচু করে তুলে জোর গলায় ঘোষণা করল,—আমি দোষী নই।

তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে নিজের স্বপক্ষে কোন কৌঁসুলী দিতে চায় কিনা। চাইলে, খুব অভিজ্ঞ মিলিটারী কৌঁসুলী দেওয়া যেতে পারে। কাছে-পিঠেই লড়াই চলছে বলে কোন বেসামরিক উকীল বা ব্যারিষ্টার আনায় মুশকিল আছে।

দেবল উত্তর দিল যে, নিজের স্বপক্ষে যা বলবার বা জেরা করবার আছে তা সে নিজেই করবে।

তখন জজ এডভোকেট তাকে হুঁসিয়ার করে দিলেন যে ইণ্ডিয়ান আর্মি রুলের ৭০ ধারা অনুসারে বিচার মুলতুবি রাখা কখনো কখনো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এখানে লড়ায়ের এলাকা বলে কোর্ট-মার্শাল একবার বসলে আর মুলতুবি করা চলবে না। অতএব আসামী সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছে

কিনা তা খুব ভাল করে বিবেচনা করে এখনো ভেবে দেখুক। পরে সে সুযোগ আর না-ও হতে পারে।

দেবলের চোখের সামনে ভেসে উঠল তার মায়ের ছবি। মা! হ্যাঁ, দুঃখিনী মায়ের ছবি ত তার মন থেকে বলতে গেলে মুছেই গিয়েছ। এই চার বছর ত নয়, একটা যুগ, একটা জন্মান্তর।

আগের জন্মের মাকে এ জন্মে সে কি করে মনে রাখতে পারবে?

না, তবু সে ত ভোলেনি। সেইজন্যই ত সে বেঙ্গুনেব আজাদ-হিন্দ রেডিয়ো হাতেব মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও নিজে যে বেঁচে আছে সুস্থ আছে, সে খবরটুকু মার কাছে পাঠাতে পারেনি।

আর মা? ছেলে যুদ্ধের মধ্যে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে বলেই ত আর তিনি ছেলেকে খরচেব খাতায় তুলে দেননি। আশা কবেছেন যে তাঁর ছেলে, হ্যাঁ তাঁর ছেলে, আবার কোনদিন ফিরে আসবে। হয়ত – হয়ত—ইংরেজের বিপক্ষে হিন্দুস্থান আক্রমণ কবেছে, দেশে ঢুকে পড়েছে—সেই খবর পেয়ে মনে মনে নতুন করে আশা পোষণ করতে শুরু করেছেন। দেবল আবার ফিরে আসছে!

না, দেবল দেশে আর ফিরে যেতে চায় না। তার অপরাধ প্রমাণ হবেই। মৃত্যুদণ্ড হবেই। মিছিমিছি মাকে আর অন্যান্য সবাইকে জড়িয়ে ফেলে লাভ নেই।

মিতা?—হ্যাঁ, মিতার জন্যও বিচারটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়া দরকার। বলা যায় না, যদি ইংরেজরা মিতার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আবিষ্কার করতে পারে, মিতারও বিপদ হবে। অন্ততঃ তাকে সন্দেহ করবে। এমন কি প্রমাণ না পেলেও ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে আটক রাখতে পারে।

সেদিন রাতে টিলার উপরের ঘাঁটিতে মিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বের হয়ে পড়লে একেবারে সর্বনাশ! না, তার চেয়ে বিচারটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। সে যে আই.এন.এ., সে কথা খোলাখুলি আর বেপরোয়া ভাবে স্বীকার করবে। তা হলে হয়ত আর কোর্ট-মার্শাল চালাবার দরকার হবে না।

আ·······আরো একজন যে এই ছবির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। আরেকটি নতুন-চেনা মুখ। তার ত কোন দায়ও ছিল না, দাবীও ছিল না। দেবলই তাকে নিজে তার গোয়েন্দাগিরির সুবিধার জন্য গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। নিজের লুকোতে পারার সুবিধা হবে বলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরছে। সে বেচারীও নিজের বিপদ উপেক্ষা করেছে। কষ্ট ও বদনামের কথা ভাবেনি।

দেশের টানে অনেক মেয়েই এমনভাবে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এমনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছে ক'জন ? এমন কম সময়ের মধ্যে এমন আত্মভোলা ভাবে ? রাসের আসরে তাব সঙ্গে কথাবার্তা, ঘনিষ্ঠতা কি আর মিলিটারীদের নজরে পড়েনি ? না, উত্তমার মঙ্গলের জন্যও 'তাড়াতাড়ি এই বিচারটা শেষ হয়ে যাওয়া দরকার !

তা হলে অপরাধ স্বীকার করলেই ত সব চুকে যায়। কোন সাক্ষীসাবুদ, জেরা, সওয়াল জবাব কিছুরই দরকার হবে না। মা জানবেন না, মিতাকে টানবে না, উত্তমা টানাটানিতে পড়বে না। শুধু একটু পরেই একটা দেওয়ালের সামনে, সারি সারি বন্দুকের সামনে চোখবাঁধা একটা দেহ। আর ছোট্ট একটা হুকুম—'ফা-য়া-র'।

না। তাতে সে পেছপা হবে না। সে দোষ কবুল না করলেও দোষী প্রমাণিত হবে নির্ঘাত। সে ত সত্যি একজন সিপাইকে গুলী করেছে, আরেক জনের গায়ে হাত তুলেছে। কিন্তু···কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রাজদ্রোহ ?

না। সে রাজদ্রোহ করেনি। করেছে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। সে স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক। নেতাজীর আজাদ বাহিনীর একজন কর্ণেল। তার শপথ হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অ্যাক্ট অনুসারে। ইংরেজের ইণ্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্টের দায় ইংরেজই সিঙ্গাপুরে চুকিয়ে দিয়েছে।

ঠিক। দেশ বড়, সবার চেয়ে। পরিচিতা কোন তরুণী, এমন কি সারা জীবন ধরে ধ্যান করা প্রেয়সীর চেয়েও বড়। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এখানে জননীও চাইবেন না যে তাঁর মুখ চেয়ে জন্মভূমিকে অস্বীকার করুক দেবল।

দেবল ঘোষণা করল,—আমি কোর্ট-মার্শালের কোন মুলতুবী চাইব না। কারণ আমার উপর কোর্টের কোন এক্তিয়ারই আছে বলে আমি স্বীকার করি না। সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণের সময়কার ঘটনা আর প্রথা আমার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই কোর্টের বিবেচনা করতে আমি আহ্বান করছি। আমার বর্ণনা সত্য কি না তা আশা করি কোর্ট ভাল করেই জানেন।

হিজ ম্যাজেস্টিস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪২ সনের ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারী যুদ্ধের আইন ভেঙ্গে সমস্ত হিন্দুস্থানী সিপাই আর অফিসারদের এককাট্টা করে সিঙ্গাপুরে ফেরার পার্কে জমায়েত করল, আর সব ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়ে গেল অন্য জায়গায়। ১৬ই ফেব্রুয়ায়ী সকালে আমাদের সবাইকে খোলাখুলিভাবে আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার মেজর মেডাম বলে গেলেন,—"এই এখন থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।" ফেরার পার্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হয়ে কর্ণেল হাণ্ট আমাদের প্যারেড করালেন, আমাদের টান টান হয়ে দাঁড়াতে হুকুম দিয়ে বললেন,—"আজ ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে আমি তোমাদের জাপানী সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছি। এপর্যন্ত আমাদের হুকুম যেরকম ভাবে তামিল করে এসেছ, সে ভাবে এখন থেকে তোমরা এদের হুকুম তালিম করবে।"

তারপর মেজর ফুজিয়ারা আমাদের বললেন,—"জাপানী সরকারের তরফ থেকে আমি তোমাদের আমার জিম্মার মধ্যে নিলাম।" কর্ণেল হাণ্টের সামনেই তিনি আমাদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের হাতে দিয়ে দিলেন আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য আমরা যেন যুদ্ধ করি এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এর পর আমরা যদি জাপানী হুকুমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম তা হলেও কোন অপরাধ হত না। কিন্তু আমরা তা করিনি। আমরা যুদ্ধ করেছি নিজেদের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি-অ্যাক্ট অনুসারে। নেতাজীর কাছে শপথ নিয়ে। কাজেই আমার উপর তোমাদের এই কোর্ট-মার্শালের কোন এক্তিয়ার নেই।

আমায় তোমরা যুদ্ধ-বন্দী করতে পার, রাজদ্রোহের জন্য বিচার করতে পার না। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-আইনের বই খুলে দেখতে পার।

বিচারকের সভাপতির এ-হেন পাঁড় বিদ্রোহীর আস্পর্ধা সহ্য হবে কি করে? অনেকদিন আসাম-মণিপুরের জঙ্গলে লড়াই করে মুখের সাদা রঙ ঘোর লাল হয়ে গিয়েছিল। মুখ কালো করে তিনি টেবিলে হাতুড়ি ঠুকতে লাগলেন। আসামী এক বিদ্রোহী, তায় দুঃসাহস দেখিয়ে দুশমনের আইনের দোহাই দিচ্ছে।

অসহ্য, অসহ্য! এই বাঙালীগুলো এতদিন আইনের মার-প্যাঁচে আমাদের ঘোল খাইয়েছে। এখন আবার ধরেছে অস্ত্র, আওড়াচ্ছে ইণ্টার-ন্যাশনাল ওয়ার-ল'র বুলি।

রুল ব্রিটানিয়া, রুল দি স্লেভ্‌স। হাতুড়িও হাতে দুলতে লাগল—যেন ঢেউ-এর তালে তালে।

কিন্তু ইংরেজ কর্ণেল মনে মিলিটারী হলেও ব্যবহারে সিভিল। মেজাজ হতে পারে মারমুখো, কিন্তু মুখ তার মিঠে। হেসে বললেন,—তরুণ ক্যাপ্টেন, তুমি এখনো ইণ্ডিয়ান আর্মি-অ্যাক্টের অধীন। রাজদ্রোহীর মন-গড়া বানানো আর্মি-অ্যাক্টের কোন দামই নেই আইন অনুসারে।

প্রসিকিউটার বললেন,- মিষ্টার প্রেসিডেণ্ট এবং এই মাননীয় কোর্টের সভ্যগণ! এই বিচারসভা সম্পূর্ণ আইনসম্মত! মিষ্টার প্রেসিডেণ্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—(বলতে বলতে বুক পর্যন্ত নীচু হয়ে একটা বাও করে মাথা ঝাঁকিয়ে নমস্কারও সেরে নিলেন)—যেন তিনি নিজেই কোর্টের মানরক্ষার ভার নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ কিং-এম্পারারের অধীন। আসামী ভারতবাসী অতএব জন্ম থেকেই ব্রিটিশ প্রজা। তার উপর সে আইনসম্মত আর্মি-অ্যাক্টের অধীন হয়ে শপথ নিয়েছিল। তার সেই পার্চমেণ্ট কমিশনের নকল আমি এই কোর্টে দাখিল করছি। সদ্য দিল্লী থেকে এরোপ্লেনে করে আনানো হয়েছে।

অ্যাক্টের ৪১ ধারা অনুসারে আসামী ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়াতেই হোক বা দেশের বাইরেই হোক যে-কোন অপরাধ করলেই আর্মি-অ্যাক্টের সাজা পেতে বাধ্য। যে-কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সে কিং-এম্পারারের বিরুদ্ধে লড়াই করুক না কেন, উদ্দেশ্যটার কোন দাম নেই। কথা হচ্ছে যে তার কাজটা বে-আইনী কিনা।

সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকার কর্তব্য সব সময়ই আর সব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। যুদ্ধে বন্দী হলেও অথবা শত্রু অধীনে চলে গেলেও সে কর্তব্যের দায় চলে যায় না। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এখন আসামীর দোষের প্রমাণ দিতে শুরু করছি।

যুদ্ধের যে অবস্থা ততদিনে এসে গিয়েছিল তাতে আজাদ হিন্দ্ দলের বিরুদ্ধে প্রমাণের কোন অভাব ছিল না। বেতারে রাসবিহারী বসুর বক্তৃতা, নেতাজীর ভারতবর্ষকে উদ্দেশ করে গান্ধিজীর কাছে সম্মতি আর আশীর্ব্বাদ চেয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করার বক্তৃতা—এ সবেরই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল।

আজাদ হিন্দের নাগাপাহাড় ও মণিপুর চড়াও হবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার জাপানী এরোপ্লেন থেকে বাংলা, হিন্দী আর ইংরেজীতে ইস্তাহার আর ছবি ছড়ানো হয়েছিল। তাতে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে ডাক দেওয়া হয়েছিল।

আর খুলে বলা হয়েছিল নেতাজীর স্থাপিত আজাদ হিন্দ সরকারের উদ্দেশ্য। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মার্চ করে আসছে, তার নীচে লেখা—কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—এই ছবিটি কোর্টে দাখিল করা হল। নেতাজী পুরো সামরিক পোশাকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্যালুট নিচ্ছেন – এই ছবিটিও।

কৌঁসুলী নিবেদন করলেন এত সব হাতে-কলমের প্রমাণের পর আজাদ হিন্দ্ দলের প্রত্যেকেই রাজদ্রোহের অপরাধ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এবং আসামী স্বীকার করে যে সে আই.এন.এ.-র লোক।

লেঃ কর্ণেল রয় খুব বিচক্ষণ লোক। বাঁ-চোখের উপর একটা সোনার সরু চেনে আটকান পাঁশনে চশমা পরে নিলেন। আসামীর দিকে বেশ রসিক-গোছের একটা চাহনি হানলেন।

তারপর কোর্টকে সম্বোধন করে বললেন,—মিঃ প্রেসিডেন্ট, এবার আপনারা নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন যে আসামী কোন কারণে, মানে কাউকে ঢাকতে গিয়ে মিথ্যা স্বীকারও করে থাকতে পারে। সে-ই যে রাজদ্রোহীদের দলের লোক তার প্রমাণ কি? তা না প্রমাণ হলে অন্য

অপরাধগুলিও অনেকটা হালকা হয়ে যাবে কাজেই এবার একটি প্রমাণ-দাখিল করছি।

এই ব্যাটল-ড্রেসটি লামলাই গ্রামের এক কোণায় জঙ্গলের ধারে পুকুরের .তলায় পাওয়া গিয়েছে। আসামীর দ্বিতীয় আর তৃতীয় দফা অপরাধ এই পুকুরের কাছাকাছিই হয়েছিল।

আসামীকে উদ্দেশ করে জজ এডভোকেট বললেন,—আপনি কি স্বীকার করেন 'যে এই পোশাকটা আপনার? যদি স্বীকার না করেন কোর্টের পাশেই তাঁবুতে গিয়ে এটা পরে আসতে অনুরোধ করব।

—স্বীকার করি।

—স্বীকার কবেন যে এটা হিজ ম্যাজেস্টিজ ফোর্সের অফিসার হিসাবে আপনি পরতেন?

—করি।

—স্বীকার করেন যে এটা আপনি আপনার তথাকথিত আজাদ হিন্দ দলের নাম-কা-ওয়াস্তে কর্ণেল হিসাবেও ব্যবহার করতেন?

—করি, কিন্তু তথাকথিত নয়, সত্যিকারের স্বাধীনতার সৈন্যদল। আপনার মত পেটের দায়ে বিদেশীর ভাড়াটে সৈন্যদলের অফিসার নয়। এবং নাম-কা-ওয়াস্তে কর্ণেল যে নয় তার প্রমাণ এই যে আমরা আসছি এই শুনেই আপনারা পালাবার পথ পাচ্ছেন না। আপনাদের হয়ে লড়তে আসে মেশিন, মানুষ নয়। কারণ আপনারা মরদ নন।

—"অর্ডার, অর্ডার"—প্রেসিডেণ্ট টেবিলে হাতুড়ি ঠুকতে লাগলেন। অর্ডার, অর্ডার, আসামীকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে এটা কোর্ট, রাজনৈতিক বক্তৃতার আসর নয়।

দেবল জবাব দিল,—মিঃ প্রেসিডেণ্ট, প্রসিকিউটার এজন্য দায়ী। তিনিই শুরু করেছেন।

কর্ণেল রায় পাঁশনেটা আবার নাকের উপর সাজিয়ে রেখে বেশ মোলায়েম ভাবে জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, আই.এন.এ-র কর্ণেল সিন্‌হা, আপনার এ সময়ে বেঘোরে প্রাণ হারাবার রিস্ক মাথায় নিয়ে মণিপুরে

আসার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কি? তা হলে আর কষ্ট করে সাক্ষী-সাবুদ ডাকতে হয় না। আশা করি মণিপুরে হাওয়া খেতে আসেন নি?

—এসেছি হাওয়া গরম করে তুলবার জন্য। আপনাদের জন্য হাওয়া গরম করে তুলতে।

—সাবাস, সাবাস। তা, রাস নাচটা অবশ্য মণিপুরের নামকরা বস্তু। আমেরিকানরাও দেখে দিল্ খুলে তারিফ করেছে। আপনি বোধ হয় নাচ-গানের খুব সমজদার? ওরিয়েণ্টাল? না, আমার মত বলরুম ডান্সও চলে।

প্রেসিডেণ্ট বাধা দিলেন। কৌঁসুলীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, এত হালকা ঠাট্টায় কোর্টের দামী সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না।

কর্ণেল রয় আবার 'বাও' করে বললেন,—নো মি লর্ড, আমি চাই যে আসামী নিজের জবানবন্দীতেই স্বীকার করে নিক যে সে গোয়েন্দাগিরি করেছে; সে যোদ্ধা নয়। তা হলে আর কোর্টের সময় নষ্ট করার কোন কথাই উঠবে না। স্পাই-এর শাস্তির জন্য বিচারের ব্যবস্থা খুব ছাট-কাট।

কিন্তু পুরো কর্ণেল ইংরেজ বীরের জাতের লোক। আধা কর্ণেল প্রসিকিউটারের যুদ্ধের গণ্ডীর বাইরের ছাঁট-কাট ব্যবস্থা তার চোখে আনস্পোর্ট্সম্যান-লাইক। অর্থাৎ খেলার নিয়মে অন্যায় হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে যে-সব চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে, সেগুলিই বিচার করা হবে। অবশ্য প্রমাণ হাজির করতে করতে যদি অন্য কোন ব্যাপার বেরিয়ে পড়ে সে অন্য কথা।

কর্ণেল রয় তখন একে একে সাক্ষী ডাকতে শুরু করলেন। সময় অল্প; জবানবন্দী আরও অল্প।

প্রথমেই সাক্ষী দিল একজন নন-কমিশন্ড অফিসার অর্থাৎ এন. সি. ও. নায়েক। সে যখন দূরের নূতন ঘাঁটি থেকে ফিরে এল টিলার ঘাঁটিতে, সেন্ট্রির সাড়া অর্থাৎ হুকুমদার না পেয়ে, তার গুমটি ঘরে গিয়ে ঢুকল। শান্ত্রী তখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। তার কাছে দুশমনের যে বর্ণনা শুনেছিল তার সঙ্গে আসামীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। শান্ত্রীও সাক্ষী দিয়ে বর্ণনা দিয়ে গেল। সেটাও দেবলের সঙ্গে মেলে।

দেবল তাকে জেরা করতে শুরু করল,--জিজ্ঞেস করল,—তুমি কি তোমার দুশমনকে মুখোমুখি দেখেছিলে ?

—হ্যাঁ।

---তার মানে তোমার দুশমন এত বোকা যে সে একটা শত্রুর ঘাঁটিতে ঢুকে ক'জন সান্ত্রী গুমটি-ঘরে আছে তা না জেনেও তোমার মুখোমুখি হয়েছিল ? মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই কথাটা আমি আপনাকে বিশেষভাবে লিখে নিতে অনুরোধ করছি।

—আচ্ছা, তোমার গুমটি-ঘরে কি বাতি জ্বলছিল ? কত পাওয়ারের ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব ?

—কোন বিজলী-বাতি ছিল না। শুধু কেরোসিনের কুপী।

—মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি আপনাকে এ ব্যাপারটাও লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি—কেরোসিনের কুপীর আলোয় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার গুমটি-ঘরের সামনা-সামনি ধস্তাধস্তির মধ্যেও এই সান্ত্রী তার শত্রুকে এমন ভাল করে নজর করেছিল যে তার অবিকল বর্ণনা দিতে পেরেছে।

—আচ্ছা সাক্ষী, তোমার দুশমনের গায়ে তোমার চেয়ে কম জোর থাকতে পারত। সে কেন তোমার সঙ্গে হাতাহাতি করল ? তার হাতের রিভলবার দিয়ে গুলী করলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

—তা আমি জানি না। বোধহয় রিভলবার চালাবার সুবিধা পায় নি।

—কিন্তু হাত-পা বেঁধে ফেলার পর সে কেন তোমায় মেরে ফেলল না ? নিজের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীকে কি শত্রুসৈন্য বেঁচে থাকতে দেয় ?

প্রসিকিউটর কোর্টকে সম্বোধন করে তার উত্তর দিয়ে দিলেন। দুশমন একা, সে নিশ্চয়ই চুপচাপ লুকিয়ে সব তালাশ করে দেখবার মতলবে ছিল। শত্রুর এলাকায় এসেছে একা ; একটা সিপাইকে মেরে তার কোন লাভ হবে না। সে হচ্ছে স্পাই ! অতএব এখন এই মামলায় এখানে দাঁড়ি টেনে সামরিক গোয়েন্দার জন্য ব্যবস্থা করাই ঠিক হবে।

প্রেসিডেন্ট তাতে রাজী হলেন না। রায় দিলেন যে গোয়েন্দাগিরির মত কোন জিনিস এখনো কোর্টের নজরে পড়েনি।

এর পরের সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রকাশ হল যে দেবলের ইউনিফর্মটা

যে গ্রামের পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল, সে গ্রামেরই ভিতরে আরেকটা পুকুরে একজন সিপাহির লাশ পাওয়া গিয়েছে।

দেবল প্রশ্ন করল,—ইউনিফর্মটা না হয় আমার, কিন্তু এই এলাকাতে যত গুম-খুন হয়েছে বা জাপানী হাওয়াই হামলাতে লোক মরেছে, তার সবগুলিরই দায়িত্বও কি আমার ?

সাক্ষী প্রশ্নটার ভিতরের কথা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

—আচ্ছা, লাশের গায়ে কোন বন্দুক বা রিভলবারের দাগ আছে ?

— আছে। টমিগানের গুলী মারা হয়েছিল।

– বেশ বেশ। কত নম্বর 'বোর' ? ফুটোটা কত বড় ?

সাক্ষী তার জবাব দিল।

—ভাল কথা। এই টমিগানের ফুটো আর এই ইউনিটকে যে সব টমিগান দেওয়া হয়েছিল তাদের ফুটো কি একই নম্বরের ? যদি হয়ে থাকে, আমি আই. এন. এ-র অফিসার, আমি সে 'বোরের' বন্দুক কোথায় পাব ?

জজ এডভোকেট বাধা দিয়ে উত্তর জুগিয়ে দিল,—মিঃ প্রেসিডেন্ট, সিপাইয়ের ইউনিফর্মে হাতাহাতির প্রচুর চিহ্ন আছে ; আসামী নিশ্চয়ই ওর টমিগান দিয়েই ওকে খুন করেছিল। তা ছাড়া সে টিলায় উঠে একটি মহিলা অফিসারের ঘরে ঢুকেছিল ; তার আতিথ্য গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিল।

প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন,—এটা এ পর্যন্ত শুধু অনুমান। অনুমান প্রমাণ হতে পারে না। এখন শুধু খুনের ব্যাপারটা হচ্ছে।

প্রসিকিউটার বিনীত নিবেদন করলেন,—তা হলে আসামীকেই জিজ্ঞাসা করছি সে কেন লাশের গায়ে বন্দুক বা রিভলভারের গুলির দাগের কথা তুলছিল ? সিপাই ত অন্য কোন ভাবেও খুন হয়ে থাকতে পারে ? এই কথাটা হচ্ছে যাকে বলে : ঠাকুরঘরে কে ? আমি কলা খাই নি।

এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নেও দেবল বিচলিত হল না। বলল,—সেটা আমার অনুমান। কে মেরেছে কে জানে ? তা আমি কোন মহিলার ঘরে যাইনি। গিয়ে থাকি ত তার প্রমাণ কি ?

কর্ণেল রয় প্রশ্ন করলেন,—আমি জানতে চাই যে আসামী কেন এখনো ইঙ্গিত করেছ না যে ব্যাপারটা নারীঘটিত এবং সম্ভবতঃ আমাদের সিপাইরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করায় একজন খুন হয়েছে। এরকম ইঙ্গিত করা সহজ।

দেবল তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল,—আমি অনধিকার চর্চা করি না। ইঙ্গিত করা আমার কাজ নয়।

'কিন্তু আমার কাজ'—হেসে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে বললেন কর্ণেল রয়। আমি বলছি যে ব্যাপারটা নারীঘটিত। আমাদের আসামীর একজন মণিপুরী গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। একেবারে জলজ্যান্ত 'মাতাহরি'। আসামী তাকে ডিফেন্স পক্ষের সাক্ষী হিসাবে হাজির করবে না। আমাদেরও তার বিরুদ্ধে এখনো কোন মামলা দাঁড় করানো হয়নি। কাজেই তাকে আমাদের সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়ে তার জবানবন্দী নিতে হবে। তার আগে সুবেদার-মেজরের সাক্ষী নেওয়া হবে।

সুবেদার-মেজর সাক্ষী দিতে এসে বলল যে, একজন সিপাই হাত-পা-বাঁধা ও আরেকজন গুম-খুন হওয়াতে গোটা এলাকাতেই খুব কড়া নজর রাখা হয়েছিল। প্রত্যেক বেসামরিক লোককে নজরে রাখা হয়েছিল আর বাইরে থেকে আসা প্রত্যেকের পরিচয় (আইডেন্টিটি) পরখ করে দেখা হচ্ছিল।

ওই রাসলীলার গ্রামে অনেক নতুন লোক এসে থাকে। তাদের সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই। কিন্তু একজন নতুন লোক মণিপুরী মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে না অথচ রাস দেখতে এসেছে এটা একটু তদন্ত করবার কথা।

মেয়েটির খবর নিয়ে জানা গেল যে সেই গ্রামে সে-ও নতুন এসেছে। এই আসামীও নতুন এসেছে। তখনই আমাদের ঘাঁটিতে টেলিফোনে খবর নিয়ে লামলাই গ্রামে যে বাড়ীতে মৃত সিপাইর বন্দুক পড়েছিল, সে বাড়ীর মেয়েটির বর্ণনা যাচাই করে নেওয়া হল। মেয়ের বাপকেও আটক করা হয়েছে, অবশ্য সন্দেহ করা হয়নি। তার কাছ থেকেই মেয়ের বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল। এই নিখোঁজ মেয়ের সঙ্গে যে অচেনা পুরুষ এসেছে তার গতিবিধি নজর করা হয়েছিল।

সে দিনের বেলা কোন লোকের নজরে পড়েনি, এটাও সঙ্গে সঙ্গেই গাঁওবুড়াদের কাছে জানা গেল। আমি রাসের আসরে যেখানে বসেছিলাম -সেখান থেকেই সন্দেহ করে হাঁটু চাপড়াতে চাপড়াতে ইঙ্গিত করে তার পিছনে একটা মিনিচেয়ার টেপ রেকর্ডার বসিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা নিমেষের জন্যও আসামীকে চোখের আড়াল করিনি। অথচ সব কাজেই কারো সন্দেহ না জাগিয়েই হাসিল করেছি।

শুধু তাই নয়। 'প্লেন ক্লোদস' অর্থাৎ সাধারণ বেশ পরিয়ে একজন সামরিক গোয়েন্দাকে ওর পাশে বসিয়ে বাংলায় কথাবার্তা কইয়েছি। তার সঙ্গে কথাবার্তায়ও কিছু প্রমাণ বের হয় কিনা. বা কী মনের ভাব হয় তাও নজর করেছি।

এই পর্যন্ত জবানবন্দী দিয়ে সুবেদার-মেজর নিজের মনের খুশীতে একবার গোঁফে মোচড় দিয়ে নিল। যেন রাসের আসরে তার সমঝদারীর আর আখরের চোটেই সব নাচ-গান উতরে গিয়েছিল। একবার তেরছা চোখে সে দেবলের দিকেও তাকিয়ে নিল। যেন শুধাতে চায়—কেমন বাছাধন ?

কর্ণেল রয় এখন নিবেদন করলেন যে, সে আরেকটি সাক্ষীর সামনে টেপরেকর্ডিং কোর্টে দাখিল করবে ও শুনিয়ে দেবে। বিচারপতি সে নিবেদন মঞ্জুর করলেন।

দেবল সুবেদার-মেজর বা তার গুপ্তচরকে জেরা করতে চাইল না। বলল,—আমি যে বাঙালী ও আই. এন. এ.-র লোক তা যখন অস্বীকার করছি না—তখন এদের জেরার কোন দরকার নাই। তবে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার নাম ভুল করে জড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বলব।

এবার বিচারপতি প্রশ্ন করলেন রয়কে— কিন্তু রাসের আসরের লোকটিই যে সন্ধানী ঘাঁটিতে টিলায় অপরাধ করেছিল তার প্রমাণ কি ? সে না হয় লামলাই গ্রামের অজানা লোকটি হল, কিন্তু তার বেশী এখনও প্রমাণ হয়নি।

কর্ণেল রয় খুব মোলায়েম ভাবে আবার নীচু হয়ে 'বাও' করলেন। হেসে বললেন,—মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমাদের শাস্ত্রে বলে—মধুরেণ সমাপয়েৎ।

দুটি তরুণী মহিলার সাক্ষ্য দিয়ে আমি এই ক্রাউন-কেস (সরকারী মামলা) শেষ করতে চাই। তারাই দেবে মোক্ষম সাক্ষ্য।

একটু অন্তরঙ্গতার আমেজ গলায় এনে কর্ণেল রয় বললেন—মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার সম্মতি নিয়ে আমি শুধু এটুকু মন্তব্য করতে চাই যে এই দুই তরুণীর সাক্ষ্য এত মজার ও চটকদার হবে যে এই মামলাটা সেভেন স্পাই ট্রায়াল্‌স অব দি ওয়ার্ল্ড-এর অন্যতম বলে প্রমাণিত হবে।

প্রেসিডেন্ট একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তবু গাম্ভীর্য যতটা সম্ভব বজায় রেখে বললেন - মিষ্টার প্রসিকিউটার, আপনি একটি শুষ্কং-কাষ্ঠং কোর্ট-মার্শালকে সরস করে তুলেছেন। সেজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন দেখছি আপনি এই বিচারটিকে একেবারে অমর করে তুলবেন।

—বহু ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আমার নতুন সাক্ষী হচ্ছে একজন তরুণী ওয়াক.আই. জুনিয়ার কম্যাণ্ডার, আইডেন্টিটি কার্ড নম্বর এক্স্ বি. জিরো জিরো থ্রি। বেতারের কাজে আছে বলে তার নাম বা পরিচয় পাঠানো হয়নি। তার লিখিত জবানবন্দী দেখেই তাকে সমন দেওয়া হয়েছে গোপনে। অর্ডারলি, নেক্সট উইটনেস প্লিস।

একি, একি··· হঠাৎ দেবলের মুখ দিয়ে কী একটা কথা বের হতে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিল। এদিকে রয়ও ব্যাটল-ড্রেসের আস্তিনটা যে একটু ঝুলে পড়েছে সে দিকেই হঠাৎ দিলেন তাঁর যত নজর। তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। কোন নতুন নিষ্ঠুর তর্কের পথ যেন তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

আর দেবল ?

তার গলা শুকিয়ে উঠলো। হায় বিধাতা, একি পরিহাস ! মিতা যেন না জড়িয়ে পড়ে সেজন্য সে তাড়াতাড়ি নিজের আই. এন. এ. হিসেবে অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এখন শুধু মিতা নয়, উত্তমাকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় টানা হবে। উত্তমা হয়ত বেঁচে যাবে। কারণ তার উপর আক্রমণ হয়েছিল, এ কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। কিন্তু মিতা ? মিতার কি হবে ?

কিন্তু মিতা ? সে ওরকমভাবে জজ-এডভোকেটের দিকে তাকিয়ে আছে কেন ? একি শুধু বিস্ময় ! একি প্রত্যাশা ! একি !

বেদনায় দেবলের মন টন টন করে উঠলো।

প্রেসিডেণ্ট সাক্ষীর জবানবন্দী তাড়াতাড়ি শুরু করতে হুকুম দিলেন। বিকেল গড়িয়ে এলো।

একটু গলা কেসে কর্ণেল রয় প্রশ্ন করলেন,—এই আসামী আপনার খুপরীতে রাতে লুকিয়ে ঢুকেছিল ?

—না। আমি কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখিনি।

—কিন্তু আপনার খুপরীতে যদিও মাত্র একটি ক্যাম্বিশের ফোল্ডিং-চেয়ার থাকে, দুটো চেয়ার ছিল সে রাতে ?

—আমিই হয়ত খেয়াল না করে এনেছিলাম।

—অসম্ভব নয়। আপনার অজানতে অবশ্য আর কেউ এনে থাকতে পারে। আচ্ছা, আমাদের ও. পি. ইউনিটের লোকেরা অতগুলি কার্টন আর টিন আপনার ঘরে কাটা অবস্থায় পেয়েছিল কেন বলুন ত ? আপনি তন্বী তরুণী, আপনার ত অতিভোজনের জন্য কোন বদনাম নেই।

—অজ্ঞাত অতিথি-সৎকারের জন্যও কোন বদনাম নেই।

কর্ণেল রয় একবার পূর্ণদৃষ্টিতে মিতার দিকে তাকালেন। তার পরই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মুকুট আর তারা মার্কা কর্ণেলের ব্যাজটার বোতামগুলি অন্যমনে নাড়তে লাগলেন।

—ছি, ছি। আমরা সেরকম কোন কথা বলছি না। শুধু বলছি যে আপনার অজানতে কোন শত্রুপক্ষের স্পাই এসে আপনারই খুপরীতে ঢুকেছিল। আপনি হয়ত জানতেও পারেন নি। অথবা জানলেও বাধা দিতে পারেন নি। কিন্তু ও. পি.-র লোকেরা সব ঘরগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজবার সময় দেখেছিল যে, সাউণ্ড লেভেল মিটার মেশিনটা বেশ গরম হয়ে আছে। অনেকক্ষণ চলছিল কিনা। অথচ আপনার 'লগ বুকে' সে কথা লেখা নেই।

মিতা চটে উঠল। কোর্টের শরণ নিল, আবেদন করল,—মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমি আপনার কাছে সুবিচার চাই। এই মামলার সম্পর্কে এনকোয়ারী করবার সময় আগাগোড়া অন্যায় ইঙ্গিত হয়েছিল। কোন অজানা লোক আমার খুপরীতে এসেছিল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিল একথা যে আমি

অস্বীকার করছি তার কারণ নাকি এই যে, আমি কাউকে আড়াল করতে চাই, পালাতে সাহায্য করতে চাই। এখন লার্নেড প্রসিকিউটারও···

প্রসিকিউটার বাধা দিয়ে উঠলেন,—মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি কোন ইঙ্গিতই করছি না। শুধু এনকোয়ারী রিপোর্টে এরকম একটা প্রায় খোলাখুলি সন্দেহ দেখেছি। তাতে বলছে যে, কোন একজন ইনট্রুডার অর্থাৎ অনধিকারী আগন্তুক নিশ্চয়ই সাক্ষীর ঘরে ঢুকেছিল। সন্দেহটা সম্পূর্ণ আসামীর উপর, সাক্ষীর উপর মোটেই নয়।

আমি চাই যে সাক্ষী নিজেকে সাফাই করে নিন, সঙ্গে সঙ্গে আসামীর মামলাও ফয়শালা হয়ে যাক। তাই এসব প্রশ্ন করছি।

আচ্ছা বলুন ত, সাক্ষী, আপনি এই আসামীকে কখনো দেখেছেন কি না? আপনার ঘরে? বা অন্য কোথাও? ধরুন, লড়াই বাধবার আগেও হয়ত।

—তার মানে?

—মানে শুধু এই যে নীচের সান্ত্রীরা বলেছে যে আসামী তার হাত-পা মুখ বেঁধেছিল। টিলাতে আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না সে রাতে। ঘরে খাবার জিনিসপত্র ছড়ানো, মেশিন ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ আপনি কিছুই জানেন না। ব্যাপারটা হেঁয়ালী ঠেকছে কিনা।

—সেটা খোলসা করবার দায়িত্ব আমার নয়।

রয় ব্যাকুলভাবে মিতা আর দেবলের দিকে একটু তাকালেন।

—সম্পূর্ণ সত্য কথা, মিস। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, আসামী হচ্ছে স্পাই। যুদ্ধের সম্মানজনক অফিসার নয়, স্পাই। যাকে লোকে ঘৃণারও অযোগ্য মনে করে।

মিতা একমুহূর্ত ভেবে নিল। দেবলের সব শেষ হয়ে যাবে। তারই প্রিয়ের ধারালো ওকালতির ফলে দেবলের দোষ প্রমাণিত হবে। মৃত্যুবরণ নির্ঘাত! কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধের সৈনিক হিসাবেই না-হয় সে মৃত্যু বরণ করুক। তা বলে গুপ্তচর? আর্মি-য়্যাক্টে যার কোন রেহাই নেই, লোকের চোখে যার মর্যাদা নেই—সেই স্পাই? আর সেই প্রমাণ হবে কার হাতে?

যাকে মিতা···মিতা ভালবাসে, যার জন্য দুঃসাহসে ভর করে সে এত বিপদের এলাকায় এসেছে, তারই বিশেষ ওকালতিতে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে রয় দেবলকে স্পাই বলে প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। রয় অবশ্য এনকোয়ারী রিপোর্ট পড়ে বুঝতে পেরেছে যে দেবলের সম্বন্ধে মিতা কোন সাক্ষ্যই দেবে না, বরং তাকে বাঁচিয়ে চলবে। এটাও বুঝছে যে, দেবল মিতার ঘরে এসেছিল। সেজন্যই কি সে দেবলকে সম্মানজনক মৃত্যুর হাত থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করতে চায়?

কিন্তু তাতে রয়ের লাভ কি? সে কেন দেবলের উপর এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে? এর মূলে কি জেলাসী? প্রিয়ার প্রেমে ভাগীদার হতে যাচ্ছে এই সন্দেহের জন্য ঈর্ষ্যা?

না না। সেটুকু সৌভাগ্যই কি মিতার হবে দেবলের নামহীন মরণের মধ্য দিয়ে? এতদিন পরে কি তবে রয়, তার সকল স্বপ্নের রয়, সাড়া দিতে যাচ্ছে? এই ভাবে?

ওগো দয়াময়, তোমার দয়া যে বড় দায়! বড় নিষ্ঠুর তোমার প্রেম।

সতেরো

কোর্ট-মার্শাল এখনো চলেছে।

—কই মিস, আমার কথার উত্তর দিন।

নাছোড়বান্দা কর্ণেল রয় আবার প্রশ্ন করলেন।

মিতা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সে চোখে অন্তহীন উত্তর, আদিহীন প্রশ্ন। একই সঙ্গে ফুটে রয়েছে। মুখে আর কি উত্তর দেবে?

শেষ পর্যন্ত অতি ম্লানমুখে মিতা বলল,--আপনি ত আমায় কোন প্রশ্নই করেন নি?

—এই যে বললাম যে আসামী সিপাই নয়, স্পাই।

—এটা ত প্রশ্ন হল না। আমি যতদূর জানি কোন ব্যক্তিগত অভিমতকে প্রমাণ বলে চালানো যায় না।

—ঠিক, ঠিক। আমার নিজের ভুল স্বীকার করছি। কিন্তু আসামী যে গুপ্তচরের কাজ করতে এসেছিল তার প্রমাণ আপনার কিউবিকুলে (খুপরীতে) পাওয়া গেছে।

সেগুলি যদি প্রমাণ হয় তা হলে এটাও আন্দাজ করে নিতে পারেন যে, আমারও যোগসাজগ আছে। কেমন, এই কথাই ত প্রসিকিউটার সাহেবের মনের কথা? আর, এত বড় বিশ্বজোড়া এলাইড আর্মির অফিসারদেরও তা হলে ঘরভেদী বিভীষণ বলে সন্দেহ করা হয়?

বলতে বলতে মিতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাঁবুর মধ্যে বিচার হচ্ছিল। সাক্ষী ও আসামী কারো জন্য আলাদা কাঠগড়া ছিল না। মিতা এগিয়ে এসে রয়ের সামনে দাঁড়াল। একেবারে মুখোমুখি। মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইল তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে।

রয় সেই দৃষ্টি যেন সইতে পারলেন না। প্রথমে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলেন। যেন সমুদ্রের ঝড় উঠবে। তাই খুঁজছেন কোন্ দিকে একটুখানি আশ্রয়, একটুখানি নিষ্কৃতি।

শেষ পর্যন্ত রয় আবার মিতার দিকে তাকালেন।

তাকাতে তাকাতে চোখ ফিরে গেল সমস্তটা অতীতের দিকে। এই সেই

মিতা যে তার হতে চেয়েছিল। যে সমাজে মেয়েরাই প্রেমের কথা কান পেতে শোনে আর মন দিয়ে করে যাচাই, সেই আধুনিক সমাজের মেয়ে। কিন্তু সে সেই শোনার জন্য করেনি অপেক্ষা। নিজে থেকে এসেছে এগিয়ে, দিয়েছে হৃদয়ের কথা আগে থেকে জানিয়ে।

কিন্তু যে সহজে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তার উপর কি আর টান হয় ?

রয়ের হয়নি। কিন্তু না হওয়াটা কি ঠিক হয়েছিল ?

তবু এই নারী তার জীবনপথে আবার এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি শুধু তাকে অনুসরণ করে ?

কিন্তু সে ত বড় দুঃসাহসের কাজ। বাঙালী জীবনে একেবারেই ভাবতে পারা যায় না। তবে কি সে এসেছে এই আই. এন. এ. কর্ণেলের জন্য ? কিন্তু তাই-বা কেমন করে সম্ভব ? এমনভাবে যোগাযোগ হবেই বা কেমন করে ? যে মিতা তার হতে পারত, যে মিতা···

রয় আর কোন দিকে তাকাতে পারলেন না। শুধু অতীতের দিকে তাঁর মন, শুধু দেবলের দিকে তাঁর চোখ। মিতা নেই তাঁর সামনে। কোর্ট-মার্শালের নেই কোন অস্তিত্ব। শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেবল।

শেষ পর্যন্ত রয় আবার মিতার দিকে তাকালেন। শান্তভাবে বললেন,—আপনার জায়গায় ফিরে যান সাক্ষী। কোর্ট-মার্শালের সাক্ষীতে নিশ্চয়ই খুব স্ট্রেন (পরিশ্রম) হয়। কিন্তু আপনার মত পদস্থ অফিসার নিশ্চয়ই বিচলিত হবেন না।

তারপর কোর্টের দিকে তাকিয়ে বললেন,—মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে শত্রুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর উৎসাহে আমি একটু মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছিলাম। না-হলে জেরার মধ্যে আমি এমন কোন প্রশ্ন বা ইঙ্গিত করতাম না যাতে কমিশনড্ অফিসার এই সাক্ষীর কোন অসম্মান হয়।

মিঃ প্রেসিডেন্টও মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

রয় আবার 'বাও' করে কোর্টকে সম্মান দেখালেন। তারপর বললেন, —কোর্টের অনুমতি নিয়ে আমি সাক্ষীকে আরো প্রশ্ন করতে চাই।

মিতার দিকে লক্ষ্য করে বললেন,—কোন গুপ্তচর, কি শত্রুপক্ষের যে-কোন লোক টিলায় হঠাৎ চড়াও হয়ে আপনার খুপরীতে এসে হাজির হলে আপনি কি করতেন?

—অবশ্য গুলী চালাতাম। রিভলভার আমার সঙ্গেই ছিল সে রাতে। সব সময়ই থাকে।

—যদি পেছন থেকে হঠাৎ সে নিজে রিভলভার তুলে দাঁড়াত?

—তা হলে এত খাবার খাওয়া বা মেশিন চালানো, কোনটাই আমায় না বেঁধে বা না মেরে ফেলে সম্ভব হত না। তা ছাড়া আমার ট্রান্সমিটিং মেশিন আমেরিকায় তৈরি, একেবারে আধুনিক। আমি নিজে না চালালে জাপানী বা আই. এন. এ. কারো চালানো সম্ভব নয়। আমায় বেঁধে রাখলে আমি রিপোর্ট করতাম সবার আগে। মিলিটারী অফিসার হয়েও আমি সহ্য করে যাব গায়ে হাত-তোলা?

—কিন্তু মেশিনটা গরম ছিল কেন?

—সেটা মেশিনের গরম, না, যে রিপোর্ট করেছে তার মনের গরম তা আমি কি করে জানব?

হো হো করে হেসে ফেললেন প্রেসিডেন্ট।

অবশ্য হাসিটা শুরু করেছিলেন প্রসিকিউটার নিজেই। তার উপর প্রেসিডেন্টকে হাসতে দেখে সবাই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। সারাদিন গুমোটের পর সন্ধ্যাবেলার বৃষ্টির মত হল সেই হাসি।

প্রসিকিউটার আবার শুরু করলেন, তা হলে অত খাবার সাবড়ে দেওয়া একা আপনারই কাজ?

—চুপচাপ অন্ধকারে একা বসে থেকে এ ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত? শত্রুপক্ষের লোক ডেকে ভাগ দেওয়া চলত?

—তাও ত বটে। কিন্তু শত্রুপক্ষের কোন লোক টিলার নীচে সান্ত্রীকে বেঁধে রাখল অথচ উপরে উঠে এল না, তাই বা কিরকম কথা?

সেটা প্রমাণের ভার আপনার ; সাক্ষীর নয়। আমাদের টিলাতে বা এলাকাতে কোন গুপ্তচর আসেনি। লগ-বুকে তার প্রমাণ আছে।

কোর্টকে সম্বোধন করে রয় বললেন,—সম্পুর্ণ সত্য কথা। মিঃ প্রেসিডেন্ট,. এই বিষয়ে আমরা কোন প্রমাণ এখনো পাইনি। সাক্ষী এখন সরে বসতে পারেন। আমার শেষ সাক্ষী একটি মণিপুরী মেয়ে ও মাইক্রোফোন-রেকর্ডিং-এ তার সঙ্গে আসামীর কথাবার্তার টুকরোগুলো এখন হাজির করা হবে।

মিতা সরে এসে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসল। মনে বিরাট উত্তেজনা, কিন্তু মুখে নির্বিকার প্রশান্তি। উত্তমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

দেবল মনে মনে খুব অস্থির হয়ে উঠল। নির্ঘাত মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে গেলেও বুঝি এত অস্থিরতা হয় না। মিতা, তার স্বপ্নের মিতা, হয়ত বেঁচে যাবে। জজ এডভোকেট মিতাকে জেরা করতে গিয়ে শেষের দিকে এমন ভাবে সব কথা গুলিয়ে দিয়েছেন যে, মিতার ঘরে সে গিয়েছিল সে সন্দেহ বোধ হয় আর উঠবে না। অন্ততঃ কোন প্রমাণ যে নেই তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে একরকম।

কর্ণেল রয়ের অদ্ভুত ধারালো বুদ্ধি।

ভাবতেই দেবলের রয়ের কথাও মনে হল। ঠিক, এই কর্ণেল রয়ই যে সেই লোক, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই। মিতা, তার মিতা রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু দেবলের চেষ্টায়, দেবলের সাধনায় নয়। বরং তার সঙ্গে এই ক্ষণিকের সম্বন্ধের জন্যই মিতা বিপদে পড়েছিল। আর সেই বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছে কে? যার জন্য নিজে মিতার মনে ঠাঁই পেল না—সে। প্রিয়ার প্রিয়তম।

এটা কি মিতাকে না পাওয়ার জন্য বেদনা? না, মিতার পাওয়ার জন্য? না. মিতাকে আরেকজন যে এতদিনে আবিষ্কার করল সে জন্য?

দেবল কি শুধু রণক্ষেত্রে লড়াই করতেই শিখেছিল? মনের ক্ষেত্রে আজ বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাউণ্ড মিস্টের (মেঠো কুয়াশার) মত। শত্রুর খুব কাছে অলক্ষ্যে এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ার জন্য নকল কুয়াশা তৈরি করা হয়। কোন্‌খান থেকে উঠেছে, কোন্ দিক থেকে

বইছে, তার কিনারা করা যায় না। কিন্তু হুঁশিয়ার অপর পক্ষ ঠিকই বুঝে নেয় যে, শত্রুর অভিযান আসছে কুয়াশা-ঢাকা হয়ে।

মাইক্রোফোনের রেকর্ডের গান আর কথা আর নূপুরের আওয়াজ কানেই ঢুকছে না। তারা বাজাচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের আগমনী।

আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দেবলের মনে ফিরে এসেছে বেদনার কুয়াশা।

তার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে একটি মাথা-উঁচু, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুঃসাহসী নারীমূর্তি। এ যেন সেই কলেজে-পড়া কিন্তু নিরীহ মণিপুরী মেয়েটি নয়। সে ততক্ষণে জোর গলায় বলছে :

—আপনারা ওই রেকর্ডেই শুনেছেন যে আমি আসামীকে কলকাতায় চিনতাম। তখন আমি কলেজে পড়ি। জাপানীরা কলকাতায় বিমানহানা দিল ১৯৪২-এ ডিসেম্বর থেকে। তখনো দেবল সিংহ কলকাতায় আছে। কলকাতার লোক। কী করে সে আই. এন. এ.-তে যাবে?

গম্ভীরভাবে প্রসিকিউটার বললেন,—কিন্তু আসামী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে যে সে আই.এন.এ.-র লোক। সে হিজ ম্যাজেস্টিস সৈন্যদলে এমার্জেন্সী কমিশনের ক্যাপ্টেন হয়ে মালয়-সিঙ্গাপুরে গিয়েছিল।

এ সম্বন্ধে প্রমাণটা উত্তমাকে পড়ে শোনান হল।

কিন্তু উত্তমা অত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। সে একটুকুও না ভড়কিয়ে বলল,—কিন্তু আসামী যে ১৯৪২-৪৩-এ কলকাতায় ছিলেন, আমার সঙ্গে সে সময় জাপানী বিমানহানার সময় ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিলেন সে কথা রেকর্ডে পাচ্ছেন। তা হলে বুঝতে হবে যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী যদি অন্য কথা কিছু বলেন বা মেনে নেন তার মূলে আছে আপনাদের অত্যাচার। জোর করে মিথ্যা স্বীকার করিয়ে নেওয়া। যাকে বলে থার্ড-ডিগ্রী মেথড।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তমা প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে আরো ফোড়ন দিল,—মি লর্ড, দিস ইজ ব্রিটিশ জাস্টিস (এই হচ্ছে ইংরেজের ন্যায়বিচার)!

প্রেসিডেন্ট চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিলেতের ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত লোক, "ন্যাশনাল সার্ভিস" করবার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু অন্যায় বা অসত্য মেনে নেওয়া ধাতে নেই।

দেবলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,- সাক্ষীর এই নালিশটা কি সত্যি ?

দেবলের উভয়-সঙ্কট। উত্তমাকে শত্রুরা ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী হিসাবে এনেছে। তার সঙ্গে আসামীর এই বিচার সম্বন্ধে কোন পরামর্শ হতে পারে না। কাজেই কিছু বললে সেটা উত্তমাকে আরও বেশী জড়িয়ে ফেলতে পারে। অন্য দিকে সে কি করে বলবে যে সে আই. এন. এ. নয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি-অ্যাক্ট অনুসারে সে যে নেতাজীর কাছে, দেশের কাছে শপথ নিয়েছে। তাকে অস্বীকার করা ? না না, তা সম্ভব নয়।

কিন্তু তাকে স্বীকার করলে উত্তমার বিপদ নির্ঘাত। প্রমাণ হবে যে উত্তমাও শত্রুপক্ষের লোক। শুধু তাই নয়, সে স্পাই। তা না হলে এত বানানো কথা কি করে বলত রাসের আসরে ? পাঁচজনের মধ্যে বসে ?

কী করবে দেবল ? কোন্‌টাকে সত্য বলে মানবে ?

রয়ই তাকে রেহাই দিলেন। বললেন-- মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আসামী যদি হ্যাঁ বা না কিছুই না বলতে চায় সে দায়িত্ব তার। আমি এখন পরের প্রশ্নে যেতে চাই। আচ্ছা সাক্ষী, আপনি গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলেন কেন বলুন ত। আপনাকে ব্যাপারটার সব ব্যাক-গ্রাউণ্ড খুলে বলছি—যাতে আপনি সত্যি কথা বলতে বাধ্য হন। বুঝতে পারেন যে, কোন কথা লুকিয়ে আপনার লাভ নেই।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে উত্তমা বলল—আমি কোন কথাই লুকোই না। শত্রুর ভয়ে আপনাদেরই নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেছে বলে চারিদিকেই শত্রু, গুপ্তচর এসব দেখেছেন।

সাক্ষীদের মাঝখানে বসে সুবেদার মেজরের আর সহ্য হল না। হাঁটু চাপড়িয়ে -কি করবে, টেবিলটা যে বিচারকের হাতের নীচে—খাস উর্দ্দুতে চেঁচিয়ে উঠল, খামোশ, খামোশ (চুপ চুপ)।

পাল্‌টে ওরই উপর প্রেসিডেণ্ট হুকুম জারী করলেন চুপ করতে। বেচারীর উৎসাহ চুপসিয়ে গেল।

রয় ব্যাপারটা সংক্ষেপে বললেন,—দেখুন উত্তমা সিংহ, আপনার বাড়ীর মধ্যে কিছু ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন আছে। সেখান থেকে কিছু একটা জিনিস

টেনে পুকুর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন আছে। পুকুরে পাওয়া গেছে একজন সিপাইর লাশ। আপনার বাড়ীর কাছে জঙ্গলে ডোবাতে পাওয়া গেছে আই. এন. এ. ইউনিফর্ম। এই আসামী স্বীকার করছেন যে সেটা তাঁর।

জঙ্গলের মধ্যে টিলার নীচে যে সান্ত্রী পাহারায় ছিল তার হাত-পা-মুখ বাঁধা হয় সেই ঘটনার রাতেই। সান্ত্রী আসামীকে সনাক্ত করেছে। আসামীর সঙ্গে আপনাকে একসঙ্গে কাছাকাছি বসতে আর খুব চেনা-পরিচিতের মত কথাবার্তা কইতে দেখা গেছে। আপনাদের কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়েছে। তা ত অনেকটাই শুনলেন।

মাথা নেড়ে উত্তমা বলল,—শুনলাম, কিন্তু যোগাযোগ দেখতে পেলাম না। একে বলে কাকতালীয়। আকাশে কাক গেল উড়ে, আর তাল পড়লো এসে ভুঁয়ে। অতএব কাকই তাল ঠুকরিয়ে মাটিতে ফেলেছে। আপনাদের টিলা আর আমাদের বাড়ী এ-দুটোর কোন ঘটনার সঙ্গেই আমার কোন সম্বন্ধ নেই। কাজেই দেবলেরও নেই।

সিপাইদের ভয়ে আমরা গ্রাম ছেড়ে সরে গিয়েছি। কিন্তু লুটের লোভে বা অন্য কোন বদ মতলবে যদি ওরা গ্রামে ঢুকে নিজেদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি করে, সেটার ফল কী হল তা প্রমাণ করার ভার কি তাদের উপর, যারা আগে থেকে ভয়ে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে?

প্রেসিডেন্ট অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কর্ণেল রয়ের মুখে কথা সরে না।

সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হল দেবল। এই সরলা কিশোরী! গ্রাম্যবালিকা বলা চলে। তার মনে কোথা থেকে এল এত জোয়ার? মাথায় যোগাল এত ক্ষুরধার বুদ্ধি? শুধু কলেজে পড়ে ত এত হয় না।

উত্তমা আবার বলল,— যে সিপাই মারা গেছে সে ফিরে এসে সাক্ষী দেবে না। যারা লোভে লোভে গাঁয়ে এসেছিল তারাও মুখ খুলবে না। কথা বলার মধ্যে আছে এক টিলার সান্ত্রী। ধরে নিন আপনারা যে, সে অন্য সিপাইদের সবাইকে বারণ করেছিল বা বাধা দিতে গিয়েছিল। তখন তারা যদি ওকে বেঁধে রাখে, কেউ কি এখন স্বীকার করবে? সেই সান্ত্রীই বা

কি করে নিজের দলের কীর্তি ফাঁস করে দেবে? তাকে কি ইউনিটের মধ্যেই থাকতে হবে না? এবার আপনারা নিজেরাই ব্যাপারটা বুঝে নিন। আই. এন. এ.-র ছেঁড়া ইউনিফর্ম কি এত দিনেও আপনারা গোটাকয়েক যোগাড় করতে পারেননি? তার মধ্য থেকে একটা আসামী দেবলের মাপ-মাফিক খুঁজে পাওয়া কি শক্ত কাজ হবে?

উত্তমার প্রশ্নের তোড় কোর্টকে একেবারে দিশেহারা করে তুলল।

বয় উত্তমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখে কী যে লেখা আছে—প্রশ্ন, না প্রশংসা—তা বোঝা শক্ত।

প্রেসিডেন্টই উত্তর দিলেন,—ঠিক কথা। এরকম একটা আপসে যোগসাজশ দাঁড় করানো অসম্ভব নয় স্বীকার করি। কিন্তু এতখানি সাজানো ব্যাপার সামান্য সিপাইদেব পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

—কার পক্ষে সম্ভব তার বিচার বা মীমাংসা করা আমার দায়িত্ব নয়। আসামীর ত নয়-ই।

—কিন্তু সাক্ষী, আপনি ত ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী। আসামীর দিকে এত টেনে কথা বলছেন, ব্যাপারটা কি?

—সুবিচার চাই। আমি কোন পক্ষেরই সাক্ষী নই। যে সুবিচারের জন্য বৃটিশের এত সুনাম, মি লর্ড, আমি সেই সুবিচারই শুধু চাই। দেবল সিংহ দোষী নয়, আপনারা ওকে মিথ্যা সন্দেহে আসামী করেছেন।

—কিন্তু আসামী নিজেই স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া তিনি ত এ কথা বলছেন না যে তাঁর কাছ থেকে কেউ জোর করে কনফেশন (স্বীকারোক্তি) আদায় করে নিয়েছে।

এতক্ষণ প্রেসিডেন্টই কথা বলে আসছিলেন। এবার প্রসিকিউটার শুরু করলেন, -আচ্ছা উত্তমা দেবী, আপনি কি বলতে চান যে আসামী কাউকে ঢাকবার জন্য নিজেই মাথা পেতে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তিনি আই. এন. এ.?

প্রশ্ন করলেন বটে। কিন্তু উত্তরের জন্য রয় কার দিকে তাকাবেন? একবার চান উত্তমার দিকে, আর একবার চান মিতার দিকে? দুজনেই

তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে—ইংরেজ পক্ষের মুকুট আর তারা-মার্কা লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেলের ঝকমকে পোশাক-পরা রয়ের দিকে।

সইতে পারলেন না রয় তাদের সেই দৃষ্টি। নাক থেকে পাঁশনে চশমাটা কখন যেন খসে গিয়েছিল। সোনার সরু চেন টেনে সেটাকে হাতে তুলে কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

আঠারো

বোমারু বিমানের গুম গুম আওয়াজ।

এ আওয়াজে এখন আর মন চঞ্চল হয়ে উঠে না। পিলে চমকানো ত দূরের কথা। সবাই জানে যে জাপানীদের এরোপ্লেনের ঘাটতি পড়েছে তার উপর আমেরিকান প্লেনের গুরু গুরু ডমরু রব খুব চেনা হয়ে গেছে এ তল্লাটে।

সে-আওয়াজ ভেসে ভেসে মিশিয়ে গেল দূরান্তরে। অমনি শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট,—আমাদের লার্নেড প্রসিকিউটার কি এখনো দুশমনের হাওয়াই হামলার সম্ভাবনার কথা ভাবেন নাকি?

হেসে রয় জবাব দিলেন,—না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। মাথার উপর হাওয়াই জাহাজ দেখলেই আমি নতুন নতুন টিন-বোঝাই খাবারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। কে জানে, হয়ত হাভানার তাজা সিগার, হয়ত কোন মিঠে আঙুলের বোনা মোজা। আচ্ছা, যাক সে কথা। বলুন ত সাক্ষী, দেবল সিংহ যদি এতই আপনার হারানো দিনের পুরোনো বন্ধু হয়ে থাকেন, তিনি এই যুদ্ধের গরমাগরম বাজারে ওই গ্রামে কী করছিলেন? তাঁর গতিবিধির একটা হিসাব চাই ত?

উত্তমা তাতে ঘাবড়াল না। বলল,—গতিবিধি যদি সন্দেহজনক হয়ে থাকে তা প্রমাণ করতে হবে ফরিয়াদীকে। আসামী কি করে তা প্রমাণ করবেন এখানে? তাঁর হয়ে সাক্ষী দিতে আসবে লোকে কোন্ সাহসে? আপনারা যে ভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘটা করে কোর্ট-মার্শাল বসিয়েছেন, তাতে কোন্ বেসামরিক লোকের ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে সে দেবল সিংহের পক্ষে সাক্ষী দিতে আসবে?

ঘাড় উঁচু করে তাকাল উত্তমা। সে এখন শুধু সরলা মণিপুরী তরুণী নয়। সিংহী জেগে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে। শত্রুকে রুখতে হবে। লড়তে হবে। বাঁচাতে হবে একজনকে।

রয় তাড়াতাড়ি স্বীকার করলেন সে কথা। স্বীকার করলেন যে আসামীর পক্ষে বিচারের আইন-কানুন অনুসারে কোন সাক্ষী বা সাফাই

দেওয়া বলতে গেলে একেবারে অসম্ভব। কেউ সাক্ষী দিতে সাহস পাবে না। অভয় দিলেও না।

জজ-এডভোকেটের ফরিয়াদী গভর্নমেণ্ট বা আসামী পক্ষ দু' পক্ষকেই দরকারমত সাহায্য করার কথা। তিনি বললেন,—কিন্তু লড়াইয়ের এলাকায় সব সামারি কোর্ট-মার্শালেই এরকম হয়ে থাকে। তা বলে বিচার বসে থাকে না, শাস্তিও কম হয় না।

রয় বললেন,—আমি নিবেদন করছি যে সে-কথা ঠিক। কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষকে অকাট্য প্রমাণ দিতে হয়। আমার মুশকিল হচ্ছে যে সাক্ষীদের জবানবন্দীতেই দেখা যাচ্ছে যে প্রমাণের মধ্যে রয়েছে অনেক ফাঁক।

একজন বিচারক হেসে ফেললেন,—সাক্ষীরা মানে দু'জন তরুণী সাক্ষী।

মাথা নুইয়ে রয় বললেন,—সত্যি মি লর্ড। তরুণী অর্থাৎ সংসারের ঘোরপ্যাঁচ এখনো তাদের সত্যকথা বলার ইচ্ছাকে নষ্ট করে ফেলেনি।

বিদ্রূপে ভরা উত্তর এল,—কর্ণেল রয় ভুল পেশাতে এসে পড়েছেন। কোর্ট-মার্শালের প্রসিকিউটর হওয়ার চেয়ে নীতিবাগীশের বক্তৃতার টুল যে তাঁর পক্ষে অনেক বেশী স্বাভাবিক হ'ত এরকম একটা বাঁকা ইঙ্গিতও হয়ে গেল।

রয় তাতেও পেছ-পা হলেন না। এখানে আগেকার মতই কায়দা-মাফিক পালিশ করা একখানা 'বাও' (মাথা ঝাঁকিয়ে নমস্কার) করে বললেন,—মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমরা বাকী জবানবন্দীটুকুর দিকে এখন নজর দিচ্ছি। আচ্ছা সাক্ষী, রেকর্ডের এই জায়গাটাতে মন দিয়ে শুনুন।

রেকর্ডটা চালানো হ'ল। রাসে প্রিয়-প্রসাধনের বর্ণনা হচ্ছে :

সাজল সাজল ধনি মনোহর বেশে
ধনি সখিগণ মাঝে—সাজে,
সাজে মনোহর বেশে

এখানে দূর থেকে ভেসে-আসা গানের চেয়ে কাছে-বসা উত্তমার গলার অনেক বেশী পরিষ্কার রেকর্ড শোনা যাচ্ছে। সেই গানের সঙ্গে মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে সে বাংলাতে বলছে—"তোমায় তোমার কবির ভাষায় আমি কিছু বলতে চাই। ওগো, তুমি কি কৃষ্ণ হয়ে আমার ঘরে এসেছিলে?"

আবার রাসের গান উত্তমার গলাকে ছাপিয়ে শোনা গেল :

সাজে মনোহর সাজে
ধনি কতরূপে সাজে

তারই মধ্যে শোনা গেল উত্তমার গলায়—

হৃদয়পুর মাঝে
মহারাজ একি সাজে
এলে হৃদয়পুর মাঝে।

তারপর শোনা গেল উত্তমার নিজের মনে-মনে বলে যাওয়া কথা : "একি সাজে তুমি এলে ! তুমি ত সাধারণ বাঙালী নও। লাখো লোকের মধ্যে মানুষের মত মানুষ তুমি। ইউনিফর্মটা ছেঁড়া, তবু বীরের বেশে তুমি এসেছ !"

সেই বিচারকটি এখানে রেকর্ড থামাতে বললেন। রয়কে উদ্দেশ করে বললেন,—আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই শেষের কথাটাকে আসামী যে সত্যই আই. এন. এ. আর গুপ্তচর সে বিষয়ে "করোবোরেটারী এভিডেন্স" অর্থাৎ প্রমাণের সমর্থন করে নতুন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুবেদার-মেজরের টেপ-রেকর্ডার বসানো সার্থক হয়েছিল।

—আমি সে কথা বলি, মিঃ প্রেসিডেন্ট,—আরো বেশী মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন রয়। এই মাইক্রো-রেকর্ডেই প্রমাণ হচ্ছে যে আসামী কেন এত বেপরোয়া ভাবে শত্রুপক্ষের লোক বলে নিজের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট একটু সামনের দিকে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে এলেন। নতুন কোন প্রমাণ কোর্টের সামনে হাজির করা হচ্ছে ; নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত মামলাটা দেখানো হচ্ছে।

রয় বলে চললেন,—এই রেকর্ডটুকু শুনলে কোন সন্দেহ থাকে না যে সাক্ষী উত্তমা আসামী দেবলকে গভীরভাবে ভালবাসেন। একেবারে আত্মভোলা সব উজাড় করে দেওয়া ভালবাসা।

সেই বিচারক বাধা দিলেন,—ঠিক কথা। সেইজন্যই আসামী সাক্ষীর ঘরে এসেছিল আর সিপাইকে খুন করেছিল। হয়ত অন্য লোককে সাক্ষীর ঘরে দেখে হিংসা হয়েছিল। অবশ্য সিপাইটার কোন খারাপ মতলব দেখে

তাকে মেরে থাকতে পারে। সেটা খুন (মার্ডার) না হলেও ন রহত্যা (ম্যান-শ্লটার) অবশ্যই হবে।

রয় বললেন,—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা প্রমাণ পাইনি যে কোথায় কোন্ ঘরে আসামী সাক্ষীর কাছে এসেছিলেন। বাঙালী অবশ্য প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু অনেক আধুনিক ইংরেজনবীশ লোক আজকাল ধুতিটা তেমন পছন্দ করে না। কাজেই কলেজে-পড়া সাক্ষী তাঁর মনের বাসনা প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রেমাস্পদকে ধুতির বদলে বীরেব বেশে দেখতে চেয়ে। মি লর্ড, এখানে আমি বর্তমান বাঙালী তরুণ-তরুণী মহলের একটা ঠাট্টা উল্লেখ করতে চাই। বেসামরিক তরুণরা বলছে যে, যুদ্ধের দৌলতে বিয়ে বা প্রেমের বাজারে তারা মারা গেছে। অর্থাৎ তরুণীরা ইউনিফর্ম-পরা মাস্কেটধারী সামরিক তরুণদের গলাতেই বরণমালা পরাতে পছন্দ করে।

এই পর্যন্ত বলে রয় একবার সবার নজর এড়িয়ে মিতার দিকে তাকালেন। দেখলেন মিতাও রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। একেবারে অনিমেষে।

উত্তমাও রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। বুঝতে পারছে না রয় কোন্ দিকে মামলাটার মোড় ঘোরাতে চাচ্ছেন। তবে তাঁর জেরা এবং ঠাট্টা কোনটাই এখন আর খুব বেশী শত্রুতার ঝাঁজে ভরা বলে মনে হচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট হাঁকলেন,—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ অতি পরিষ্কার, মিঃ প্রেসিডেন্ট। সাক্ষী আসামীর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যাকে ভালবাসে তাকে বীরের বেশে দেখতে চাওয়া বিশ্বসুদ্ধ মেয়ের সাধনা। সাক্ষীর মনের বাসনা স্বাভাবিক।

সবাই দেখলে যে সুবেদার-মেজর তার জোড়া গোঁফের প্রান্ত-দুটিতে বেশ তারিফ ক'রে মোচড় দিচ্ছে। বীরপূজার কথা শুনে তার বুকের ছাতি একটু ফুলে উঠেছে। মাথার উপর উঁচু সোনালী টোপরের (কুলা) চারপাশে গজ-দশেক মলমলের পাক দেওয়া পাগড়ীখানা ওকে আরো লম্বাই করে তুলেছে।

রয়কে জিজ্ঞেস করা হল,—তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু এতে কী প্রমাণ হচ্ছে ?

—কিছুই হচ্ছে না, মি লর্ড। আমার পক্ষ থেকে মামলাটা বড় কাঁচা

মালুম হচ্ছে। অথচ আর কোন নতুন সাক্ষী বা প্রমাণও নেই। কাজেই আজ যদি মামলা মুলতবী করার হুকুম হয়, কাল সকালে আমি সরকারের তরফ থেকে শেষ সওয়াল জবাব দেব। তারপর কোর্ট নিজের রায় ঠিক করে নেবেন। আমি শুধু শেষ একটি প্রশ্ন করে এই শেষ সাক্ষীকে ছেড়ে দেব।

চোখে আবার পাঁশনে চশমা এঁটে কর্নেল রয় উত্তমাকে প্রশ্ন করলেন, —সাক্ষী, আপনি সত্যি করে বলুন, আপনি আসামীকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছেন। সেজন্যেই তাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন ?—না, তার অতীত ইতিহাস কিছু জেনেশুনেই তাকে ভালবেসেছেন ? আসামী শত্রুপক্ষের লোক কিনা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনিই দিতে পারবেন।

উত্তমা একবার করুণভাবে চারিদিকে তাকাল। তার সেই দুঃসাহসী বেপরোয়া বুদ্ধিতে ভরা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব আর নেই। সে তাকাল রয়ের দিকে, তার চোখ অনুসরণ করে মিতার দিকে। মিতার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেবলের দিকে।

তারপর আর তাকাল না। আস্তে আস্তে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

উনিশ

রাতারাতি এ কী রূপান্তর !

পরের দিন কোর্ট-মার্শালে সকলেই রয়ের চেহারা দেখে চমকে গেল। মাথার চুল উষ্ক-খুষ্ক। চোখ বসে গেছে এক রাতেই। নিজের পোশাকের সবচেয়ে ছোটখাট খুঁটিনাটিতে পর্যন্ত যিনি এত নজর দিতেন, তাঁর এত এলোমেলো চেহারা। এত অগোছাল বেশভূষা।

প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে প্রসিকিউটারের শরীব খারাপ লাগলে মামলা মুলতবী রাখা যেতে পারে।

রয় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন যে, তাঁর শরীর খুব ঠিকই আছে। মামলাটা এত জটিল যে সারারাত জেগে আইনের বই আর নথীপত্র পড়তে হয়েছে। যে রকম যুদ্ধের জরুরী অবস্থা তাতে এটা আজই শেষ করে ফেলা দরকার।

মিতা, মিতা ! চারদিকে যেন তার চোখ রয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বক্তৃতা দিতে উঠেও রেহাই নেই। রয় একবার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছার ছলে চোখ ঢেকে নিলেন। তারপর একবার সোজাসুজি সাহস করে মিতার দিকে তাকিয়েই ফেললেন।

তারপর শুরু হল বেসামরিক জীবনের ড্রয়িং-রুম ও সামরিক জীবনে মেস-রুমের বীরপুরুষের বক্তৃতা। সে এক নতুন লোক। নতুন বিদ্যার আলোতে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে।

বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি এক জায়গায় স্বীকারই করে ফেললেন,— মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই মামলায় সরকার পক্ষের প্রমাণ আর বক্তব্য মনে মনে যাচাই করতে করতে আমি নতুন আলো পেয়েছি। তাতে শুধু মনের নয়, নীরস পাথুরে আইনেরও বহু আঁধার কোণায় এখন নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি। আপনাদেরও তার অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি এতক্ষণ সব সাক্ষীদের জবানবন্দী সরকারী পক্ষের চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করেই যাচাই করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আসামীই যে টিলায় বাঁধা সান্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছিল তার কোন প্রমাণ পাইনি। সান্ত্রীর সাক্ষ্যের কোন সমর্থন নেই। এমন কি ওয়াক. আই. জুনিয়ার কম্যাণ্ডারের সাক্ষ্যতেও কোন প্রমাণ নেই। তিনি একজন দায়িত্বপূর্ণ অফিসার। মিলিটারী পক্ষে অতি গোপনতম কাজ

তিনি করেন। তিনিও যখন আসামীকে দেখেননি বা তার কোন আওয়াজ প্রভৃতি তাঁর সাউণ্ড লেভেল মিটার যন্ত্রে ধরা পড়েনি তখন দ্বিতীয় দফা চার্জ আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হল না।

এখন তৃতীয় অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই। কেউ আসামীকে গ্রামে ঢুকতে দেখেনি, সাক্ষী উত্তমার বাড়ীতে দেখেনি, মারামারি করতে দেখেনি। এ বিষয়ে আমাদের ভরসা ছিল উত্তমা। কিন্তু সে স্পষ্ট বলেছে যে একটা পুকুরে লাশ ও আরেকটাতেই আই.এন.এ. পোশাক কিছুই প্রমাণ করে না। কাজেই আসামীকে এই দফাতেও আমরা ঠিক জড়াতে পারলাম না। গুপ্তচর হিসাবে কোন চার্জ আনা হয়নি। অতএব সে সম্বন্ধে আলোচনা করে কোর্টের সময় নিতে চাই না।

এখন বাকী প্রথম দফা—রাজদ্রোহ। সবচেয়ে বড় অপরাধ। মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই অপরাধ যদি প্রমাণ হয় তা হলে আসামীর কোন রেহাই নেই। নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড আমি চাইব। হ্যাঁ, প্রাণদণ্ড। প্রাণদণ্ড। —বলেই রয় তাকালেন মিতার দিকে। একটি পাংশু মুখ এখনো আশায় ভরা। এখনো।

বৃটিশ প্রেসিডেন্ট বাধা দিলেন,—লার্নেড প্রসিকিউটার, আপনি বিচলিত হয়ে উঠবেন না। শাস্তির কথা বার বার বলছেন। আগে ত দোষ সম্বন্ধে বলুন।

· সেই কথাই বলছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে রাজদ্রোহ কাকে বলে তা খুলে লেখা আছে। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধ। রাজ্য কার? ইংরেজের।

কিন্তু আমরা দেখছি যে ইংরেজের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেই ঘোষণার অনেক প্রমাণ আমি কোর্টে প্রথমেই দাখিল করেছি।

আন্তর্জাতিক আইনের খুব বড় পণ্ডিত ওপেনহাইম লিখেছেন যে—যদি আইন-মাফিক যুদ্ধঘোষণা হয় তা হলে যারা এক হিসাবে বিদ্রোহী হতে পারত তারা আন্তর্জাতিক নিয়মের আওতায় পড়বে। ১৯১৭-তে পোলিশ ন্যাশনাল আর্মিকে তখনকার মিত্রপক্ষ বেলিজারেন্ট অর্থাৎ যোদ্ধা-পক্ষ বলে স্বীকার

করেছিলেন। ১৯১৮-তে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী প্রভৃতি সবাই চেকোশ্লোভাক বিদ্রোহীদের যোদ্ধা-পক্ষ বলে স্বীকার করেছিল।

প্রেসিডেন্ট এই নতুন ধরনের বিতর্ক দেখে অবাক হয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন,—তা হলে?

রয় বলে চললেন,—তা হলে মি লর্ড, আসামী বা আই.এন.এ-র কোন যোদ্ধা বিদ্রোহী নয়। ১৯৩৭-এর "বৃটিশ ইয়ার-বুক অব ইন্টারন্যাশনাল ল"তে এই দেখুন লেখা আছে যে যোদ্ধা বলে স্বীকার কবা মানেই একটা আইন-মাফিক যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে এই বলে স্বীকার করা। জাপানীরা আজাদ হিন্দ্‌কে গভর্ণমেন্ট বলে স্বীকার করছে। সব "অ্যাক্সিস"-পক্ষই স্বীকার করেছে। কাজেই আসামীকে কি করে রাজদ্রোহী বলে প্রমাণ করব ভেবে পাচ্ছি না।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর চেয়ে আরো বেশী রাগ দেখালেন সেই সহকারী ভারতীয় বিচারক। চেঁচিয়ে উঠলেন,—এই রকম বেইমানী, দিল্লীতে আর্মি-হেড-কোয়ার্টার্স-এর কাছে এখুনি রিপোর্ট করে দেব আমরা।

খুব বিনীতভাবে 'বাও' করে প্রসিকিউটার বললেন,—তা অবশ্যই করা উচিত, মিঃ লর্ড! তবে আইন চিরকালই আইন। আমাদের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বা সুবিধা-মাফিক না হলেও। আমি নিজেই প্রস্তাব করব এ সম্বন্ধে। কিন্তু তার আগে আমার যা বক্তব্য তা ঠিক, না বে-আইনী সেটা বিচার করতে হবে। সে অনুসারে আপনাদের রায় দিতে হবে এখন।

—আচ্ছা বেশ। বলে চলুন।

—মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি আসামীর মত মর‍্যাল বা ইমোশন্যাল কারণের কথা তুলছি না। কর্নেল হাণ্টের ভারতীয় দলকে জাপানীদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ তাদের সম্রাটের কাছে শপথের দায়িত্ব থেকে মুক্তি কিনা সে তর্ক করব না। তা করবে ডিফেন্স পক্ষ।

কিন্তু প্রসিকিউশনের দিক থেকে আমি মুশকিলে পড়েছি। বিরাট প্রামাণিক পণ্ডিত পিট কবেট লিখেছেন যে—আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হয় দুটো রাষ্ট্রের সেনাদলের মধ্যে অথবা একটা রাষ্ট্র আর যুদ্ধরত একটা সমাজের

মধ্যে। হুইটনের ইণ্টারন্যাশনাল ল বইতেও বলেছে যে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ যদি না থাকে তা হলে যুদ্ধকে ইণ্টারন্যাশনাল ল বে-আইনী বলে মনে করে না। এ সম্বন্ধে আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট আব্রাহম লিংকনের ঘোষণা পড়ে শোনাচ্ছি।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। কোর্টের একজন দেশী জজ বাধা দিতে গেলেন,—লিংকনকে সারা দুনিয়া ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য শ্রদ্ধা করতে পারে। কিন্তু তা বলে বৃটিশ কোর্ট-মার্শালে তাঁর অভিমত কতটা মানা উচিত হবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

মাথা নুইয়ে কোর্টের প্রতি সম্মান দেখিয়ে রয় বললেন, মি লর্ড, আইন চিরকালই আইন। সমস্ত জগৎ জুড়ে। তার উপর এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন। এর নজীর যদি বাতিল অথবা অগ্রাহ্য করার মতো খেলো না হয় তা হলে সব আদালতকেই তা মানতে হবে। বৃটিশ কোর্ট মার্শালও তার আওতার বাইরে নয়।

ব্রিটিশ প্রেসিডেণ্ট উসখুস করতে লাগলেন। সত্যি কথাই ত। তার উপর আমেবিকা হচ্ছে এই লড়াইয়ে ইংরেজদের বড় ভাই! বিগ ব্রাদারই শুধু নয়, বাঁচতে সাহায্য করল যারা তাদের প্রেসিডেণ্ট লিংকন।

তিনি প্রসিকিউটারকে লিংকনের ঘোষণা পড়ে শোনাবার জন্য বললেন।

রয় কিন্তু সেইখানেই থামলেন না। সেটা পড়ার পর বললেন, মি লর্ড, আপনাদের মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে যে আন্তর্জাতিক আইনের আমেরিকান ব্যাখ্যা ব্রিটিশ কোর্টের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা হলে এই আমি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ্যাণ্টনী ইডেনের নজীর দিচ্ছি।

তিনি নিজের পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে বৃটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুদ্ধ করেছিল, তখন আমেরিকান সৈন্যদের বিদ্রোহী নয়, যোদ্ধা বলে ইংরেজের আইন স্বীকার করেছিল। অর্থাৎ আমেরিকার লড়াই করবার আন্তর্জাতিক অধিকার মেনে নিয়েছিল।

সেই নজীর অনুসারেই আজাদ হিন্দ্ আর কর্নেল এই আসামীরও আন্তর্জাতিক হক এবং বাঁচোয়া দুই-ই জন্মে গেছে।

আর সইতে পারলেন না কঞ্চি। ফস করে বলে উঠলেন—বাট ইডেন ওয়াজ এ পলিটিশিয়ান।

মাথা নুইয়ে রয় হেসে বললেন,—সত্যি কথা, মি লর্ড। ইডেন হচ্ছেন রাজনীতিক। পলিটিশিয়ানের বাণী আদালত না মানতে পারেন। কিন্তু সেই পলিটিশিয়ান যদি হেড অব দি গভর্নমেন্ট হন, রাজ্যের হর্তাকর্তা হন তখন আইনের স্রষ্টা হন তিনি। ইডেনের কথায় যদি না হয় তবে এই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ঘোষণা।

চার্চিলের নাম করার সঙ্গে সঙ্গে জজরা থতমত খেয়ে একসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। যেন প্রধান মন্ত্রীর সারা-দুনিয়া-ভর চেনা চুরুটের ধোঁয়া তাঁবুর মধ্যে এসে পৌঁছেছে।

ওরা সামলিয়ে নেবার পর পার্লামেন্টের রেকর্ড হানসার্ড বই থেকে রয় পড়ে শোনাতে শুরু করলেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিলের পার্লামেন্টের বক্তৃতায় চার্চিল ঘোষণা করেছিলেন যে বিদ্রোহীরা হেরে যেতে পারে কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এমন একটি পক্ষের যে-সব বাঁচোয়া, যে-সব অধিকার আছে তার কোনটা থেকেই তাদের বঞ্চিত করা যায় না।

পড়তে পড়তে এক জায়গায় থামলেন রয়। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। দৃপ্ত ভঙ্গীতে বললেন,—এত সব মূল্যবান্ মত পড়ার পর আপনারা, মি লর্ড্স, নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আসামী দেবল সিংহকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করা যায় না।

মাথা ঘুরে গেল কোর্ট-মার্শালের বিচারকদের। জীবনে তাঁরা কখনো এমন বিপদে পড়েন নি। এত পাণ্ডিত্য, এত বুদ্ধি, এত আইনবিদ্যা! বন্দুকের গুলী যেখানে শেষ বিচার সেখানে···

করুণ নয়নে মিঃ প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাদের লার্নেড (পণ্ডিত) প্রসিকিউটার, এ অবস্থায় তা হলে কি করা উচিত? আসামীকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতে পারা যায় না। অথচ এদিকে···

—অথচ এদিকে ফায়ারিং স্কোয়াড বাইরে তৈরি আছে—ফস করে বলে বসলেন কঞ্চি জজ।

—অবশ্য, অবশ্য, মি লর্ড। কিন্তু ফায়ারিং স্কোয়াডের নাগালের অনেক বাইরে, অনেক দূরে আর উঁচুতে হচ্ছে ইণ্টারন্যাশনাল ল। আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে এই হচ্ছে প্রথম মামলা। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের অভিমত মেনে নিলে অবশ্যই আজাদ হিন্দকে বেলিজারেণ্ট অর্থাৎ যোদ্ধা-পক্ষ বলে স্বীকার করতে হবে। তা হলে মামলাটার রং একেবারে বদলিয়ে যাবে।

কাল রাতে আমি বেতারে দিল্লীতে আর্মি-হেড-কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছি। তাঁরাও এসম্বন্ধে সহজে কোন দিশা দিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

—তা হলে ? তা হলে ?

—আর্মি অ্যাক্টের ৯৮ ধারা অনুসারে এই বিচারের সব কাগজ আপনার দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবার অধিকার আছে। কাজেই এই মামলায় আসামীর এখনো কোন দোষ প্রমাণিত হয়নি, এই রায় দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রেখে দেন।

—সেই ভাল, সেই ভাল।—বললেন মিষ্টার প্রেসিডেণ্ট। খাস ইংরেজের মনে ইংরেজের প্রধান মন্ত্রী জীবনমরণ রণের শ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী চার্চিলের আইনের ব্যাখ্যা ঝড় তুলেছিল ভীষণ। এই যুদ্ধ হানাহানির গরম আবহাওয়ায় এত জটিল মামলা ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করা চলে না।

শেষকালে কি তিনি নিজেই পরম অবিচারের জন্য ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামী প্রমাণিত হবেন ?

কঞ্চি কিন্তু হঠবার পাত্র নন। বলে উঠলেন,—কিন্তু 'ডেসার্সন'। আসামী যে ইণ্ডিয়ান আর্মি ছেড়ে ভেগেছিল তারও কিছু প্রমাণ রয়েছে।

গভীরভাবে 'বাও' করে রয় বললেন,—তা আর হয় না, মি লর্ড। পিনাল কোডে লেখে যে, এক অপরাধের জন্য দু'বার বিচার হতে পারে না। কাজেই রাজদ্রোহ যদি না টেঁকে তা হলে সৈন্যদল ছেড়ে ভাগার কথা আর তোলা যাবে না নতুন করে।

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন রয়।

মিতা—আর মিতা, তার সম্বন্ধে এখন কি ভাববে ?

কুড়ি

দিল্লীর লালকেল্লা।

নেতাজী এর মাথায় তেরঙ্গা জাতীয়-পতাকা ওড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ধ্বনি তুলেছিল—'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।'

সেইখানেই এসেছে দেবল। কিন্তু জয়ী সেনানী হয়ে নয়। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আসামী। মামলা মুলতবী হয়ে যাওয়ায় তখনকার মত প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই আই.এন.এ.-এর তিন বড় অফিসারের বিচার শুরু হয়ে গেছে। শাহ্ নওয়াজ, সাইগল, আর খিলনের বিচারের ফলাফলের উপর দেবলের ভাগ্যও নির্ভর করছে। আসল অপরাধটা এদের সবারই একরকম।

লালকেল্লার কোর্ট-মার্শাল মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ, কর্নেল সাইগল, আর কর্নেল খিলনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছে। সেজন্য তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দিয়েছে। এখন প্রধান সেনাপতি অকিনলেকের কাছে মামলাটা পাঠানো হয়েছে। তিনি এই রায়ে সায় দিলেই শাস্তি পাকা হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে সারা দেশ জুড়ে বিরাট আন্দোলন শুরু হল। নেতাজী ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। আই.এন.এ. সেনাদল মণিপুর নাগা-পাহাড়ে দেশ স্বাধীন করবার জন্য এসেছিল এসব খবর পরাধীন দেশের সবাইকে উৎসাহের আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার ঢেউয়ের ধাক্কায় ইংরেজের সিংহাসন করতে লাগল টলমল।

আজাদ হিন্দ্ দল যুদ্ধে হেরে গেছে। কিন্তু পরাজয়েই তাদের জয় হল। বিজয়ী আই. এন.এ. কে হয়ত কিছু দেশের লোক কিছু হিন্দুস্থানী সেনা জাপানী শত্রুর বন্ধু বলে বাধা দিত। কিন্তু পরাজিত আজাদ হিন্দ্ সেনা দেশের সবাইকে করে নিল জয়।

সেই আজাদ হিন্দের কর্নেল দেবল সিংহ লালকেল্লার গোপন কারাগারে নিজের ভাগ্যের অন্ত অপেক্ষা করছে।

১৯৪৬ সনের ৩রা জানুয়ারী।

লালকেল্লার বাইরে মানুষের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্ছে। ব্যাপার কে জানে। এক নেতাজীর বাহিনী যুদ্ধ জিতে দিল্লীতে পৌঁছালে

এমন ব্যাপার হতে পারত। তা ছাড়া আর কোন কারণেই এত 'জয়-হিন্দ্' এত বিজয়ধ্বনি হতে পারে না। বন্দী দেবলের ধারণা ছিল যে, ১৯৪২-এর পর দেশের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গিয়েছে। 'ভারত ছাড়ো' এই আওয়াজ এত উঁচুতে উঠবে না! কিন্তু—

"দিল্লী প্রাসাদ-কূটে
হোথা বার বার
বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে টুটে।"

এমন জয়হিন্দ্ ধ্বনি হচ্ছে যে ব্রিটিশ বাদশারও তন্দ্রা টুটে যাবে।

লোহার গরাদের আর দেওয়ালে গাঁথা চৌকাটের সঙ্গে লাগানো শিকলের তালা ঘড়ঘড় শব্দে খুলে গেল। একজন নায়েক এসে দেবলকে জানিয়ে দিল যে, তিন তিন জন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে ছাড়পত্র পেয়েছে। তাদের সঙ্গে দেবল দেখা করতে রাজী থাকলে একে একে আলাদা করে তাদের আসতে দেওয়া হবে।

দেবল একবার নায়েকের মুখের দিকে তাকাল। তিন জন?

ওরাও তিন জন মিলে জীবনের সঙ্গে মরণ অভিসারে বেরিয়েছিল। উরায়মের মৃত্যু তার হাজার বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে নিয়ে গেল। রবিনের কী হয়েছে কেউ জানে না। তার নিজেরও সম্ভবতঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবে। কারণ, শাহ্ নওয়াজেরও দ্বীপান্তর হচ্ছে। এই জয়ধ্বনি নিশ্চয়ই শুধু তার প্রতিবাদে নয়। তা হলে এতক্ষণে রাস্তায় গুলী-চালানোর আওয়াজ হত। তিনজন লোককে তার সঙ্গে দেখা করতেও কি দেওয়া হত তা হলে? কারা তিনজন?

হয়ত এখন তার নিজের বিচারও আরম্ভ হবে। সেজন্য নিজের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করতে দেওয়া হচ্ছে কি?

না। আত্মপক্ষে আর কোন ওকালতীর দরকার নেই। মিতা কর্নেল রয়ের ওকালতীর মোড় সম্পূর্ণভাবে দেবলের স্বপক্ষে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কেন করেছিল তা কি দেবল মরণের পারে দাঁড়িয়েও বুঝতে পারবে না?

কিন্তু তার ফল মিতার উপর কি ভাবে আসবে তা-ও সে বুঝতে পারছে। তাদের কারো কোন খবরই দেবল জানে না।

আর রয়? তার ওই ঝকমকে পোশাক আর পদমর্যাদা কোনটাই কি তার বজায় থাকবে এর পর? রয় তাকে সবচেয়ে কাছের গাছ থেকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিলেন। সেই রয় আবার তার জন্যই নিজে ফাঁসের মধ্যে গলা এগিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। কার জন্য এ কাজ করলেন রয়?

নায়েক আবার বলল,—তা হলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কারো সঙ্গে দেখা করতে রাজী নন।

দেবল চুপ করে রইল।

নায়েকই ফিসফিস করে বলল,—'না' করবেন না। বাইরে অনেক কিছু ঘটছে।

ঘটছে। তার জীবনেও ঘটেছে। কিন্তু সে ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িয়ে পড়েছে তারাই হয়ত আবার দেখা করতে এসেছে। আরো বেশী করে জড়িয়ে যাবে।

দেবল ভাবতে সময় পেল না। বন্দীদের দেখা করবার ঘরে তাকে নিয়ে আসা হল।

প্রথমে যে সে-ঘরে ঢুকল তাকে দেবল আশা করেনি। অথচ প্রত্যাশা করেনি একথা সে নিজেই বলতে পারত না!

মিতা প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। দেবলের হাত তুলে ধরে বলল,—ভগবান, ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন, দেবল। তুমিও নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে।

মুক্তি? হ্যাঁ, ওই জয়হিন্দ্ ধ্বনি তার কানে মুক্তির মন্ত্রই শোনাচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে সে বলল,—নেতাজীর জয়! আজাদ হিন্দের জয়!

—হ্যাঁ, তোমাদেরই জয়, দেবল। দেশের সবাকার সম্মিলিত দাবি, গান্ধীজী পণ্ডিতজীর দাবি উপেক্ষা করে শাস্তি দেবার সাহস বা ক্ষমতা ব্রিটিশের আজ নেই। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ অকিনলেক শাহ্ নওয়াজদের

সমস্ত শাস্তির হুকুম নাকচ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তোমরাও বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। আজকালের মধ্যেই।

চুপ করে রইল দেবল।

—তোমাদেরই জয় হবে, দেবল! তোমাদেরই জয়। আজাদ হিন্দের জয়। তোমরাই ইংরেজের প্রতি প্রভুভক্তির বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছ। কোন দেশী সৈন্যই আর ইংরেজের দাস বলে নিজেকে মনে করে না। মাইনে দেওয়া মনিবের চেয়ে যাকে বড় বলে দেখতে শুরু করেছে। পুলিশ, সরকারী চাকুরে তাদেরও চোখ নেতাজী খুলে দিয়েছেন। ভয় হুমকি আর দেশী সৈন্যের হাতের বন্দুক দেখিয়ে ইংরেজ আর হিন্দুস্থানকে দখলে রাখতে পারবে না। ইংরেজ যুদ্ধ জিতেছে, কিন্তু ভারতকে হারাবে।

এতক্ষণ আবেগের তোড়ে কথা বলে থামল মিতা। বলল,—কই, চুপ করে রইলে যে?

—মিতা, তুমি কি করে এখানে এলে? আমি না হয় ছাড়া পেলাম। কিন্তু ওরা যে তোমায় সন্দেহ করবে।

—না, সে ভয় নেই। অত বিপদ আর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আগুয়ান এলাকায় গিয়েছিলাম বলে ওরা স্পেশাল ডেসপ্যাচে আমার নাম পাঠিয়েছে। সেজন্য আমায় সিনিয়ার কম্যাণ্ডার করে প্রমোশনও দিয়েছে।

—মন খুলে অভিনন্দন করছি, মিতা। তুমি কি সেইজন্যই দিল্লী এসেছিলে?

মিতা চুপ করে রইল।

—বুঝেছি। কর্নেল রয়ের খবর কি?

তবু মিতা নীরব।

—তিনি কি আমার পক্ষে ওরকম মত বদলানোর জন্য বিপদে পড়েছেন? তাই বুঝি আগে দেখা করতে আসনি?

এবার মিতা কথা বলল,—তাঁর কথা এখন থাক, দেবল।

—কেন? তাঁর কথা ত তোমার কাছেই কইব মিতা। অত বড় সাহস, অত বড় বুদ্ধি যাঁর তাঁর কথাই ত তোমার কাছে কইব। তোমার

একটুখানি ছোঁয়া পেয়ে যিনি অমনভাবে তাঁর মামলার মোড় ঘোরালেন তাঁর কথা।

মিতা চুপ করে রইল।

কিন্তু দেবল চুপ করে থাকতে পারে না।

—দেখ,—মিতা—এক নিমিষে এত পরিবর্তন সারা জীবন ধরে যে পরিবর্তন হয়ত হয় না, তা তুমি ঘটিয়ে দিয়েছ রয়ের মনে। তুমি যে ওঁর মনে কত বড় আসন পেয়েছ তার অব্যর্থ প্রমাণ। তোমায় কি আমি এখন অভিনন্দন করতে পারি?

মিতার মুখ পাংশু হয়ে গেল।

দেবল তবু বলে চলল,—তুমি বীরনারী মিতা। আমার শাস্তি, এমন কি প্রাণদণ্ড যদি হত তা হলেও আশা করে যেতাম যে তুমি সব সামলিয়ে নিয়ে একদিন নিজে সুখী হবে। আর এখন ত আমি মুক্তি পেয়েই যাব। তুমি আরো অনেক সহজে সুখী হতে পারবে এখন। তোমাদের মন্দির চিরদিন ভরা থাকুক, মিতা।

মিতার চোখ ছলছল করে উঠল।

—ওকি মিতা? ছিঃ, তোমার কাছে কোনদিন দুর্বলতা আশা করি না।

—না, না। আমি ত দুর্বল হচ্ছি না একটুও।—বাধা দিয়ে বলল মিতা। কিন্তু তার গলায় কোন আশ্বাসের সুর নেই।

—তা হলে, তা হলে তোমার…

—না, আমার, আমার চোখের দিকে তুমি তাকিয়ো না, দেবল।

দেবল বুঝতে পারল না। আশ্চর্য হয়ে মিতার দিকে তবু তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই দেবলই নীরবতা ভাঙল,—তবে আমার আশা কি তা হলে ঠিক নয়?

—আশা? কী তোমার আশা দেবল?

—আমার আশা যে কর্নেল রয় তোমায় চিনতে পেরেছেন। যে, তুমি এখন সুখী হবে।

—কিন্তু তোমার সুখের সমাধির উপর কি করে রচনা করব আমার স্বপ্ন, আমাদের ঘর?

—আপত্তি কি মিতা ? সংসারে সবারই আশা পূর্ণ হতে পারে না। কাজেই সবাই সুখী হতে পারে না। তুমি সেই টিলার ঘরে রাতে আমায় বলেছিলে যে ভালবেসেই সুখ। একজনের সুখের পক্ষে তাই যথেষ্ট— প্রতিদানে ভালবাসা না পেলেও। তোমার সেকথা আমি ভুলিনি।

কিন্তু আমি যে ভুলেছি, দেবল !

তার মানে ?

মানে এই যে, নিজে প্রতিদান পেয়ে আমি বুঝেছি যে শুধু দেওয়াই বড় নয়, তার বদলে পাওয়াও দরকার। দেওয়াতে যার শুরু, পাওয়াতে হয় তার সম্পূর্ণতা।

দেবল ম্লান হাসল। বলল,—জান মিতা, এই ক'দিন সেকথা কেবলই বসে বসে ভেবেছি। তোমার বাণী দিয়েছে আমায় নতুন শিক্ষা, নতুন সান্ত্বনা। সেই সান্ত্বনাতেই আমরা যুদ্ধে হেরে গেলেও আমার মনে কষ্ট হয়নি। ভেবেছিলাম যে দেশকে ত ভালবেসেছি, তার জন্য লড়েছি, মরেছি। ব্যস, আর কী আছে দেবার ? আর কী আছে পাবার ?

মিতা একমত হল না। বলল, —না দেবল ! দেশের বেলা সে-কথা খাটে না। কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতা, উন্নতি, সুখ সেখানে জড়িয়ে আছে। সেখানে শুধু ভালবেসে কষ্ট পাওয়ার মধ্যেই সব কিছু ফুরোলে চলে না। নিজের মনের বেলা সেখানেই ফুরোলে চলে। সেখানেই সব জুড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। তুমি এখন ছাড়া পেলে তোমার কাজের শুধু শুরু হবে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখনো তুমি লালকেল্লায় বন্দী আছ।

লাল কথাটা দেবলের মনে একটা ধাক্কা দিল। হেসে ফেলল সে।

মিতা তা লক্ষ্য করল। জিজ্ঞেস করল,—হাসছ যে ?

—হাসছি লাল কথাটা ভেবে। ছেলেবেলায় প্রত্যেক লাল খামের মধ্যে বিয়ের নেমন্তন্ন দেখতাম। লালকেল্লায় থাকতে থাকতেই তোমার লাল খামটি আমার কাছে যেন এসে যায় সেই প্রার্থনা করছি।

মিতা অনেকক্ষণ চুপে করে রইল।

মাথা নীচু করে বলল, আমি ঠিকই বুঝেছি, দেবল। তোমার মনের বেদনা আমার জীবনকে রঙিয়ে রাখবেই। তুমি সেকথা জানবে না।

জানলেও হয়ত মানবে না। কিন্তু তোমার ব্যথা তোমার রিক্ততা আমার মনে হঠাৎ হঠাৎ এসে আঘাত হানবে। সে শাস্তি আমার পাওয়াই উচিত। ভিত্তিহীন স্বপ্নে তোমার মনকে রাঙিয়ে দিতে দিয়েছিলাম— তারই এই শাস্তি।

দেবল অস্থির হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মিতার হাত দুটি চেপে ধরে বলল, -না, না, মিতা! আমার স্মৃতি তোমার কাছে যেন শাস্তির রূপ নিয়ে কখনো না আসে। আমায় সেটুকু সহানুভূতি তুমি নিশ্চয়ই করতে পারবে। তাতেই আমার শাস্তি হবে।

মিতা মাথা নাড়ল,- অত সহজে শাস্তি আসে না, দেবল। মানুষের মন অত সহজ ব্যাপার নয়। তিলে তিলে তা থেকে রক্ত ঝরে। হয়ত মন টেরও পায় না সব সময়। তবু রক্তঝরা হিয়া ঘুমোতে পারে না।

হেসে কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলে দেবল,—অর্থাৎ তুমি আমায় ঝিমোতে উপদেশ দেবে বোধ হয় এবার। হয়ত আফিমের বন্দোবস্তও করে ফেলেছ এরই মধ্যে।

—তুমি বড় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ, দেবল—ক্ষীণ অনুরোধ করল মিতা। আমি যা বলতে এসেছিলাম, সে সব কথা বলা তুমি বড় শক্ত করে দিলে এখন।

—মাপ করো মিতা, তোমায় একটুও আঘাত করতে আমি চাইনি। চেয়েছি একটু হাসাতে, হাওয়াটা একটু হাল্‌কা করে তুলতে। তাই। তা ছাড়া আমার অন্য কোন মতলব ছিল না। বলো, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে।

—শোন, আমার ইন্টারভিউ-এর সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। সংক্ষেপে সারতে হবে। বাইরে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আরো দুজন অপেক্ষা করছে। একজন হচ্ছে উত্তমা। আর একজন…

মিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবলই নামটা জুগিয়ে দিল। বলল,— বুঝেছি। কর্নেল রয়। তা সে-নামটা বলতে কোন দ্বিধা করো না, মিতা।

মিতা মুখটা নীচু করে রইল।

দেবলের নজর এড়াল না। সে বলল,—হার ত আমি স্বীকার করেই নিয়েছি। কাজেই তোমার ত আর সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

মিতা উত্তর দিল,—তুমি সেই অবুঝ ছেলেমানুষই রয়ে গেলে, দেবল। থাক সে কথা। ৩১শে ডিসেম্বর মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজদের দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়েছে দেখে সেদিনই আমি কাজের ছুতো দেখিয়ে দিল্লী রওনা হয়ে এলাম। ভয় হয়েছিল যে এবার তোমার পালা। ট্রেনে উঠে দেখি যে সে-ও চলেছে দিল্লী। উদ্দেশ্য একই। সে বলল যে তোমার ডিফেন্সের জন্য ভাল বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু তার কমিশন আর নেই ?

দেবল আশ্চর্য হয়ে গেল,—কেন ? গভর্নমেণ্ট তাকে শেষ পর্যন্ত আমার জন্য বরখাস্ত করল ?

উজ্জ্বল মুখে মিতা উত্তর দিল,—না, তা নয়। সে নিজেই পদত্যাগ করেছে। তোমার মামলা করতে করতে সে জীবনে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে।

খুশী মনে দেবল বলে উঠল,—তা আমি কোর্ট-মার্শালের সময়ই বুঝেছিলাম মিতা।

মিতার মুখ লাল হয়ে উঠল।

পুলকের ছোঁয়া সামলাতে সামলাতে সে বলল,—না না, তা নয়। সে নিজেকে আবিষ্কার করল তখন।

দেবল থামবার পাত্র নয়। তাকে যে দেখাতেই হবে যে, সে কত সুখী হয়েছে।

সে বলল,—কর্নেল সাহেবকে আমি কবির ভাষা দিয়ে অভিনন্দন করতে চাই :

"সেই চেনার আলোক দিয়ে
আমি চিনি আপনারে।"

মিতা বাধা দিল,—আঃ শোনই না একটু ছাই ! সে আবিষ্কার করল যে বিদেশের মোহ, বিদেশী মনিবের হুকুম, মিলিটারী পোশাকের জৌলুস—এদের চেয়ে কত বড়, কত সাধনার বস্তু হচ্ছে দেশ। সে তোমায় দেখে নিজেকে চিনল। তোমায় দেখে। সেটা আমার কত বড় সুখ, কতখানি গৌরব একবার ভেবে দেখ, দেবল।

অবশ্যই ভেবে দেখেছে দেবল। মিতা যদি একথা ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারে, প্রসন্নতা পায়, দেবল তাতে বাধা দেবে না। তার নিজের রক্তঝরা হিয়াকে সে আড়ালে লুকিয়ে রাখবে। সে যে সৈনিক, যোদ্ধা। আঘাত সওয়াই যে তার শিক্ষা।

সে শুধু বলল,—সেটা আমারও কম ভাগ্যের কথা নয়, মিতা। তোমার রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে, তোমার প্রতিফলিত মহিমায় আমিও তার চোখে বড় হলাম আজ। লাভ আমার অনেক।

মিতা বলল,—সে কমিশন ছেড়ে দিয়েছে। হাইকোর্টে নাম লিখিয়েছে। দেশের নেতারা বলেছেন তার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

হাসল দেবল,—নিজেকেও আমি অভিনন্দন করছি, মিতা। আমিই তাঁর প্রথম মক্কেল।

কিন্তু সময় বড় অল্প। নায়েক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিতা তাড়াতাড়ি বলল,—শোন, আমরা দুজনেই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে উত্তমা তোমায় কত ভালবাসে। জেরার সময়ই তা পরিষ্কার বুঝতে পারা গিয়েছিল। না হলে, সে ওরকম ভাবে মূর্ছা যেত না। দিল্লী এসে দেখলাম সে রোজ লালকেল্লার সামনে ঘোরাফেরা করে। কেন, তাও কি বলে দিতে হবে?

দেবল একদৃষ্টে মিতার দিকে তাকিয়ে রইল। কী প্রশ্ন সে দেখেছে সে মুখে, কী উত্তর সে পেয়েছে সেখানে তা দেবলই জানে।

মিতা বুঝল।

তাই বলল,—ভেবে দেখ দেবল, তোমার জন্য সে মণিপুরী গ্রামে গ্রামে যা করেছে তা না-ভালবাসলে কোন মেয়েই করতে সাহস পেত না। শুধু ভালবাসলেও পারে না। নিজের ঘরে বসে নিরাপদে নির্ভাবনায় ভালবাসা সহজ। কিন্তু প্রাণের মায়া ছেড়ে নিজে থেকে সব দুঃখ কষ্ট বিপদ মাথায় তুলে নিয়ে ভালবাসা—সে অন্য জিনিস, দেবল। তুমি নিজে বীর, তুমি এই বীর নারীর ভালবাসার মর্যাদা নিশ্চয়ই দিতে পারবে।

দেবলের মুখ একটু কঠিন হয়ে উঠল। মিতা তা লক্ষ্য করল।

একটু চুপ করে থেকে মিতাই আবার শুরু করল,—সরকার পক্ষের

সাক্ষী ; মহা তোয়াজে তাকে ওরা দিল্লীতে রেখেছে। মামলা হবে এই আশায়। কিন্তু বেচারীর মনের অবস্থার কথা ভেবে দেখ। তার মুখ দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, ভালবেসে সে মরেছে। তুমি যখন ছাড়া পাবে তাকে তুমি ভুলো না, তাকে তার প্রাপ্য দিয়ো এইটুকু আমার···

—থাক, থাক, মিতা। অন্য কারো জন্যে তোমার ওকালতী করতে হবে না।

দেবলের স্বরে বেশ একটু ঝাঁজ ছিল। কিন্তু তাতে পেছিয়ে গেলে মিতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। ভালভাবে কথাটা নেবার চেষ্টা করে এই ঝাঁজটুকু উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল।

বলল,—আমি সুখী হলাম, দেবল, উত্তমার উপর তোমার এই দরদটুকু দেখে। এটুকু আশা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব যে এই সহানুভূতি তোমার মনকে আবার স্নিগ্ধ করে তুলবে। সার্থক করে তুলবে।

কিন্তু দেবল তাতে ভুলল না। বলল,—খুব দুঃখিত, মিতা, যে আমি একটু মেজাজ দেখিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার মনের দিকে তাকিয়ে আমায় মাপ করো। আজ শুধু তোমার কথাই তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। অন্য কারো একটা কথাতেও এই অমূল্য সময়টুকু খরচ করলে চলবে না।

সান্ত্বনা-মাখা সুরে মিতা বলল,—জীবন অনেক বড়। তাকে ভরে তুলবার জন্য অনেক কিছুর দরকার হয়। অনেক মানুষের, অনেক মনের পরশ পড়ে তাতে। একজনকেই দিয়ে ভরে তোলা যায় না আজকাল। আচ্ছা, উত্তমার কথা উত্তমাকে বলতে দিয়ো। যদি না বলতে পারে, তার না-বলা কথাটুকুকেও উপেক্ষা করো না যেন।

পিছনে এসে নায়েক একটু গলা খাঁকারি দিয়ে কাসল। অর্থাৎ—আর দেরি নয়। এবার চলুন।

মিতা চলে যাবে।

দেবলের জীবনপথ থেকে শেষবারের মত চলে যাবে। কিন্তু সেই পথে সেইখানেই সেইক্ষণ থেকে দেবলকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অনড় থাকবে মন আর অসহ হবে ব্যথা। তবু যে সবই তাকে সহ্য করতে হবে। আর

মিতার সুখের জন্যই নিজের মুখকে করে রাখতে হবে হাসি-হাসি, মিতার চোখের সামনে সহনীয়।

অবশ্য সে যদি এই কোর্ট-মার্শালের বিচারে বেঁচে যায়। বেঁচে যে যাবে, তার যথেষ্ট আভাস মিতা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হায় এই বেঁচে থাকা—সর্বস্ব খুইয়ে মরে থাকা জীবন ধরে মৃত্যুদণ্ড।

তবু মিতাকে এখন হাসিমুখে বিদায় দিতে হবে। গারদের ওপারেই ওয়েটিং-রুমে অপেক্ষা করছে কর্নেল রয়। তার সামনে যদি মিতা ম্লান মুখে ফিরে যায়, তা হবে দেবলের নতুন করে পরাজয়। না, দেবল হেরে যেতে পারে। জীবনে, মনে, মনের ধনে। তবু সে হার মানবে না। মিতাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়ে নিজের হারকে হাসি দিয়ে দেবে ভাসিয়ে।

বীরের মত দেবল সোজা হয়ে দাঁড়াল। যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বন্দুকধারী সিপাই। দেওয়ালের সামনে এসে বুক পেতে দাঁড়াতে হবে দেবলকে।

ফা-য়া-র।

একুশ

বাঙালী ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোকটির মধ্যে একেবারে হালফ্যাশানের কেতাদুরস্ত কর্নেল রয়কে খুঁজে পাওয়াই শক্ত। কিন্তু ঠিক আগেকার মতই নিজের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল লোকটি এসে দাঁড়ালেন। আগেকার মতই খুব শোভন আর মিষ্টি তাঁর ভাবভঙ্গি। আন্তরিকভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন দেবলের দিকে। অতি ভদ্রতায় উদ্ধত নয়, কিন্তু সভ্যতায় বিনীত ভদ্রলোক।

দেবল একটু ইতস্তত: করল—নমস্কার করবে, না হ্যাণ্ডশেক করবে। রয়ই নিজে থেকে দেবলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। আপনার জয় হোক।

দেবল হেসে প্রতিনমস্কার করল। বলল,—জয় যদি হয়, সে হবে আপনার। আপনি শুধু কোর্ট-মার্শালে আমার সরেজমিনে ফাঁসি যাওয়ার হাত থেকেই যে বাঁচিয়েছেন তা নয়। আপনার আইনবিদ্যার কল্যাণেই সব আই.এন.এ.-র নির্দোষ প্রমাণ সম্ভব হবে। আপনার জয় হোক।

রয় একটু বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি নিজের কথা চাপা দিতে চাইলেন। বললেন,—শুনুন, আপনি হচ্ছেন আসল বীর, যোদ্ধা। আপনারা সব উৎসর্গ করলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। ওই শুনুন, বাইরে এখনো অবিরাম 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দেশ আত্মহারা হয়ে উঠেছে বীরপূজায়।

—আত্মহারা অবশ্যই। কিন্তু আত্মবিস্মৃতিও কি ঘুচবে এবার?

রয় একটু কেসে বাধা দিতে চাইলেন। বললেন,—আজ থাক সে সব কথা। আপনার সঙ্গে আমার যে কথাটুকু আছে সেটুকু বলে যেতে সময় দিন।

হায় রয়, বিজয়ী রয় কী করে বুঝবে পরাজিত দেবলের ব্যথা? কী করে বুঝবে, কেন দেবল এখন আর কারো সঙ্গে একান্তভাবে আপনার সুখদুঃখের আলোচনায় যেতে চান না?

তবু বীরের মত দেবল সোজা হয়ে দাঁড়াল। যেন সামনে দাঁড়িয়ে

আছে সারি সারি বন্দুকধারী সিপাই। দেওয়ালের সামনে এসে বুক পেতে দাঁড়াতে হবে দেবলকে।

খুব নরম সুরে রয় বললেন,- আপনার কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

দেবল আশ্চর্য হয়ে গেল,—আমার কাছে কৃতজ্ঞ? আপনি? কিন্তু আজ যে বেঁচে আছি সেজন্য আমরাই ত আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ থাকবার কথা।

—না, না। আপনি বুঝছেন না। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। পরম সম্পদের সন্ধান আমি পেয়েছি।

দেবলের রক্ষা নেই।

কোর্ট-মার্শাল থেকে সে বেঁচেছে। মনেব কাছ থেকে কিন্তু নিষ্কৃতি নেই। রক্তাক্ত আহত হৃদয় আবাব নিজেকে সামলিয়ে নিল।

সে বলল,—আমি আপনার চিরকালের জন্য সুখ-সৌভাগ্যের প্রার্থনা করছি। আপনাকে শুধু অভিনন্দন জানাচ্ছি না, পরম সুখ কামনা করছি।

কেন কামনা করছে সে কথা সে জানতে চায় না, জিজ্ঞাসাও করবে না। শেষ হোক, শান্তি হোক। এই অধ্যায়ের উপর এইখানেই দাঁড়ি টেনে দিতে চায় দেবল।

রয়ও একটু আঁচ করতে পারলেন। তাই অন্য কোথায় চলে যেতে চেষ্টা করলেন। বললেন,—আমিও প্রার্থনা করছি যে আপনাদের জয় যেন চরম জয়ে পরিণত হয়। দেশ যেন আপনাদের 'জয় হিন্দ্' ধ্বনিকে চিরকাল জাগিয়ে রাখতে পারে।

—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ কর্নেল রয়। আপনিও ত স্বার্থত্যাগ কম করলেন না। অবশ্য শুধু আমার জন্যে নয়, সারা আজাদ হিন্দ্, সমস্তটা দেশের স্বাধীনতার জন্য।

স্বার্থত্যাগের কথায় রয়ের মনে পড়ল মিতার কথা। মিলিটারী পদমর্যাদা সে ছেড়েছে। কিন্তু সুদসুদ্ধ তা উশুল হয়ে আসবেই শিগ্গীরই। কলকাতা হাইকোর্ট তার প্রমাণ।

কিন্তু সে উপরি পেল সব কিছু। পেল মিতাকে। দেবলেরই ত আসল

স্বার্থত্যাগ। সে যে কত সহজে, কত কষ্ট সয়েও হার স্বীকার করে সরে দাঁড়াচ্ছে, সে কথা মিতাই তাকে সব খুলে জানিয়েছে।

কাজেই দেবলের সুখশান্তির কথাও ভেবে দেখা দরকার। সেকথা বলাই তার এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য। যার কল্যাণে সে মিতাকে আবিষ্কার করেছে তারও শান্তি হোক।

একটু ইতস্ততঃ করে রয় ফিসফিস করে বললেন,—আরো একজন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করবেন, শুধু এইটুকু অনুরোধ করব।

মিতার কাছে যা শুনেছেন তার পরে রয় এর চেয়ে আর বেশী কী বলতে পারেন? তিনি শুধু দু'হাত দিয়ে দেবলের হাত দুটি খুব আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরলেন।

এর উত্তরে দেবল মিতাকে আঘাত করেছিল। কিন্তু রয়কে কি তা করা যায়? তাঁকে কি এটুকুও বলা যায় যে দেবল আর উত্তমাকে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথার দরকার নেই? মিথ্যা অভিনয় ছাড়া আর যে উত্তরই সে দেবে তা রয়কে কষ্ট দেবে। নির্ঘাত কষ্ট দেবে। তার জীবনদাতাকে সে কষ্ট দিতে পারে? এমনকি মিতার প্রিয়কে? কিন্তু তার প্রতিধ্বনি যে মিতার মনেও এসে সাড়া জাগাবে।

দেবল শুধু নীরবে মুঠে-করে-ধরা হাত দুটি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লোহার গরাদের দরজার কাছে রয়কে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

রয় বুঝলেন সবই। কিন্তু কিছুই যেন হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে শুভ কামনা করে বেরিয়ে গেলেন!

উত্তমাকে কী বলবে তা দেবল ভেবেই পেল না। তাকে মাতাহারি বানাবার স্বপ্নে সে একসময় বিভোর ছিল। কিন্তু এক মত এক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে করতে যে একপ্রাণও হয়ে যেতে পারে সে সন্ধান দেবলকে ত কেউ দেয়নি। মনে পড়লো রাসের উৎসবের রেকর্ড-করা সবগুলি কথা।

একটি কুমারীর নব নীরব-প্রীতি।

কোর্ট-মার্শালের পর দেবল অনেকদিন রাসের নীচের আগেকার সব টুকরো টুকরো কথা আর ঘটনা খুঁটিয়ে দেখেছিল। দেবল আগেই লক্ষ্য

করেছিল যে বেশ কিছুদিন থেকে উত্তমার কথাগুলি একটু কাব্যঘেঁষা একটু গোপন মনের কথার মত হয়ে এসেছিল। কিন্তু উত্তমাই ত তার কারণ দেখিয়েছিল। অত ঘোর দুশ্চিন্তার মধ্যে সারাদিন আবহাওয়া আলোচনা করে চলে না। শত্রুপক্ষের গুপ্তচরেরা যদি সন্দেহ করে আড়ি পাতে তা হলেও প্রেমালাপ বা ওইগোছের কিছু শুনলে তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে না।

দুটো চকমকি পাথব ঘষাঘষি করতে করতে আগুন জ্বলে উঠে। কিন্তু দেবল ত কোনদিন হৃদয়ের কথা নিয়ে কথা শুরু করেনি। সাড়াও দেয়নি তাতে। সবই একতরফা বলা যেতে পারে।

কিন্তু একটা পাথর যদি অনড় থাকে আর আরেকটি পাথর এসে তাতে অনবরত ঘষে যায় তবু ত আগুন জ্বলবে। তা হলে কি দেবলের কোন দায়িত্ব নেই এতে? কোন দায়িত্বই নেই?

দেশের কাজে, শুধু দেশের কেন, যে কোন কাজে পুরুষ আর নারী হাত-ধরাধরি করে চললেই অলক্ষিতে-জেগে-ওঠা প্রেম সম্বন্ধে তাদের কারো কোন দায়িত্ব আসতে পারে না। সহকর্মিণী যদি একই ধর্মের পূজারী বলে সহকর্মিণী হয়ে ওঠে তা হলেই কি দুজনকে ভালবাসার বাঁধনে ধরা পড়তে হবে? তা হলে ত এই যুগেও আর একসঙ্গে কোন কাজ করা চলবে না।

দেবল অনেক যুক্তি, অনেক তর্ক দিয়ে নিজের সাফাই গেয়েছে নিজের মনে। কোন দায়িত্বই ছিল না তার। ছিল না কোন দায় বা দাবি। তবু··· তবু ··।

হ্যাঁ! শুধু একটি দায় তার আছে। নিজেরই কাছে তার সে দায়। মিতাকে যে-মন সে দিয়েছে তা মিতা না নিতে পারে; কিন্তু দিয়েই ত সে-মনের উপর নিজের সব অধিকার শেষ হয়ে গেছে। সংসারে আর কারো জন্য তার প্রেমের যে এতটুকু বাকী নেই।

তবু সে নিজেই যাচাই করে দেখছে।

উত্তমার জন্য তার একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই এসে গেছে। সেই-ই ত তাকে এপথে এনেছিল। তারই জন্য কোর্ট-মার্শালে উত্তমার এত লাঞ্ছনা,

এত জানাজানি। তাকেই বাঁচাতে গিয়ে উত্তমার ব্যক্তিত্ব—হ্যাঁ—প্রেমও—এমন করে বিকশিত হল। সে ক্ষতির উশুল ত করতে হবে অন্ততঃ।

কিন্তু তার নিজেরই যদি কাণাকড়িও সম্বল না থাকে? সংসারের আইনে দেউলিয়া হলে যেতে হয় জেলে। মনের আইনে কত দেউলিয়াও ত খাটে জীবন-ভরা মানসিক জেল। উত্তমা তাকে ভালবাসে বলেই কি আর তাকে সেই জেলে সারা জীবন ধরে সঙ্গিনী হতে দেওয়া যায়?

জেলে দাঁড়িয়ে আছে উত্তমা। তার সামনে। একেবারে মুখোমুখি। একটু কিছু কথাও ত কইতে হবে।

দেবল শুধু বলল,—তোমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে, উত্তমা। নিজের দিকে যত্ন নিয়ো। এখন ত আর আমার জন্য কোন ভাবনা থাকবে না। তোমার বাবার কথা ভেবো, উত্তমা। আমার জন্য কোন ভাবনা নেই।

দেবল চুপ করে রইল। উত্তমাও।

চারিদিক নীরব হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এত জয়হিন্দ ধ্বনির পর একটা নীরবতা হঠাৎ নজরে পড়ল। চমকিয়ে উঠল দেবল। শুধু তার হাতঘড়িটা এখনো টিক টিক করে শব্দ করে যাচ্ছে।

উত্তমাই কথা বলল,—সিনিয়র কম্যাণ্ডার মিতা দেবী এসেছিলেন। এডভোকেট রায় সাহেবও। ওরাই আমায় তোমাকে দেখতে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

উত্তমার সাহস নেই আর কিছু বলবার। কিছু প্রত্যাশা করবার। যে কথা সে বলতে চায়, শুনতে চায়, তার শুরু হওয়া উচিত ছিল দেবলের কাছ থেকে। কিন্তু হায়! শুরু ত দূরের কথা, তার ইশারাও কোনদিন তার কাছ থেকে আসবে না। মিলিটারী ফরিয়াদী পক্ষ তার সাক্ষ্য ঠিকমত জানবার জন্য তাকে কোর্ট-মার্শালে মিতার জবানবন্দী, রায়ের জেরা এবং আরো অনেক নথিপত্র দেখিয়েছিল। তা দেখে সে সবই বুঝেছে। সবই।

যা অন্য লোকের, বিচারকদের বা উকীলদের চোখে পড়ত না, তা সবই নারীর চোখে ধরা পড়েছে। হায়!

—কিন্তু ভালবাসি বলেই কি আর ভিখারী হতে পারি?

দেবল শুধু উত্তর দিল,—তুমি ভাল থেকো। তোমাকে আমার সঙ্গে

নেতাজীর কাজে টেনে এনে যত মুশকিলে ফেলেছিলাম, যত বিপদে টেনে এনেছিলাম তা তুমি সৌভাগ্য বলেই মাথায় তুলে নিয়েছিলে। তোমার আদর্শ মূর্তিকে আমি সারা জীবন শ্রদ্ধা করবো। তোমার বাবাকে আমার নমস্কার জানিয়ো।

বাবার কথা ওঠাতে উত্তমাও বেঁচে গেল। বলল,—বাবাও এখানে, দিল্লীতে আছেন। তুমি মুক্তি পেলে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসো।

আবার, আবার কি শুরু হবে দেউলিয়ার হিয়া নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব? না, দেবল নিজের জন্য ইতস্ততঃ করবে না।

কিন্তু উত্তমা? উত্তমার জন্যেই যে উত্তমার কাছ থেকে দূরে থাকা দরকার। যাকে কিছু দিতেই পারবো না তার চোখের সামনে বারবার হাজির হওয়ার কোন সম্ভাবনারও ইঙ্গিত রাখা ঠিক হবে না।

তবু দেবল বলল,—তোমার মত মেয়ের বাবা সারা দেশের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসব।

একটু থেমে দেবল আবার বলল,—তোমাদের দেশ নিশ্চয়ই এতদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সেখানে সবাই তোমাকে কত সম্মান জানাবে, পূজা করবে—তা ভাবতেও আমার ভাল লাগছে। সরকার পক্ষ তোমায় সাক্ষী হিসাবে হাজির করা সত্ত্বেও যে দুঃসাহসী বীরত্বের পরিচয় তুমি দিয়েছ তা তোমার দেশের লোকেরা নিশ্চয়ই পরিষ্কার জানতে পেরেছে এতদিনে।

উত্তমা মাথা নীচু করে রইল। খুব মৃদুস্বরে শুধাল,—তা হলে আবার কবে দেখা হবে?

সে কথার উত্তর দেওয়া হল না। একজন টমি এসে জানিয়ে গেল যে, মহিলা ভিজিটারকে এখনি চলে যেতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। কেল্লার সৈন্যেরা এখুনি শিঙা ফুঁকে "রিট্রিট" বাজাবে। অর্থাৎ সব পাহারাদার সৈন্যরা বাজনা শুনে কেল্লায় ফিরে আসবে আর কেল্লার ফটকগুলি বন্ধ হয়ে যাবে তার সংকেত।

বিলিতী ব্যাগপাইপের বাজনা। কিন্তু মনে হচ্ছে বেহাগের মত তার বিদায়ের সুর। ভুবন ভরে এখনি সন্ধ্যা নামবে। নির্জন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা।

এমনি রিক্ত সন্ধ্যা কি নেমে আসছে দেবলের উপর? নিমেষের জন্য

ভেবে নিল দেবল। শুধু নিমেষ মাত্র। তার পরই সে নিজেকে শক্ত করে সহজ করে নিল।

সে বীর, সে যোদ্ধা। সে হারতে পারে, কিন্তু হার মানে না। জীবনের সঙ্গে, ভাগ্যের সঙ্গে, লড়তে পারার মত শক্তিই তার সবচেয়ে বড় লাভ। সবচেয়ে বড় সঞ্চয়।

না, তার সন্ধ্যা ত রিক্ত নয়. তা ভরা রক্তরাগে। স্বাধীনতার যুদ্ধে সে নিজের দেহের রক্ত ঢেলেছে। অঞ্জলি দিয়েছে নিজের রক্তিম হৃদয়। সেই রক্তরাগই তার আকাশকে ভরে রাখবে -যখন থাকবে না আর কিছু।

উত্তমা আস্তে আস্তে লোহার গরাদের দিকে এগিয়ে গেল। একবার কী মনে করে পিছু ফিরে তাকাল। দেখল যে দেবলও তার দিকে তাকিয়ে আছে। সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখকে রাঙিয়ে তুলেছে সন্ধ্যার আলো।

“রিট্রিট” বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের ইউনিয়ন-জ্যাক রোজকার মতই লালকেল্লার মাথা থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে নেওয়া হল। কেল্লার লাল পাথরের দেওয়ালগুলিকে করুণ করে তুলেছে আসন্ন সন্ধ্যার রক্তরাগ।